গল্পসংকলন

বুদ্ধদেব বসু প্রণীত

ও

কবিতাভবন প্রকাশিত

কবিতা

রূপান্তর

দময়ন্তী

কঙ্কাবতী

নতুন পাতা

বিদেশিনী

২২শে শ্রাবণ

এক পয়সায় একটি

প্রবন্ধ ও ভ্রমণ

কালের পুতুল

উত্তরতিরিশ

সব-পেয়েছির দেশে

সমুদ্রতীর

নাটক

মায়া-মালঞ্চ

গল্প-উপন্যাস

গল্পসংকলন

একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা

গল্প সংকলন

বুদ্ধদেব বসু

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা

সূচীপত্র

জ্বর

বৃহস্পতিবার। সকাল সাড়ে-সাতটা। চা-পানান্তে অধ্যাপক রমাকান্ত বসুর মনে পড়িল যে আজ দেড়টার আগে তাহার কোনো ক্লাশ নাই। এই দীর্ঘ অবকাশ নিরীহ ভদ্রলোকের মতো বাড়ি বসিয়া কাটাইয়া দিবে, এমন নিরামিষ প্রকৃতির ছেলে রমাকান্ত কোনোকালেই ছিলো না। বকশিবাজারে তাহার কয়েকটি অবিবাহিত অধ্যাপক-বন্ধু একটি বাসা ভাড়া করিয়া থাকে;—সেখানকার অতি উপাদেয়,—স্ত্রীসঙ্গবর্জিত - কাজেই সর্বসংস্কারমুক্ত --আড্ডার জন্য রমাকান্তর মন গোপনে লোলুপ হইয়া উঠিল। নিতান্ত অন্যমনস্কতার ভাণ করিয়া শিষ দিতে-দিতে ব্র্যাকেটের কাছে গিয়া কল্যকার পরিত্যক্ত পাঞ্জাবিটার উপর হাত রাখিতেই তাহার সুন্দরী স্ত্রী সুধা সুধাকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'বেরুচ্ছো বুঝি? এই না বলছিলে যে শরীর ভালো নেই, সর্দি লেগেছে—তবু না-বেরুলে চলছে না? বাদলার দিন—কখন হুড়মুড় ক'রে বৃষ্টি এসে পড়বে, ঠিক নেই। আজকাল ভিজেছো কি জ্বর হয়েছে—আর জ্বর হয়েছে কি ইনফ্লুয়েঞ্জা।'

কথা একটিও মিথ্যা নহে। গতরাত্রে রমাকান্তর ভালো ঘুম হয় নাই—নাকে, বুকে ও মাথায় কেমন-একটা অস্বস্তিকর উদ্বেগ স্বপ্নের মধ্যেও যেন চাপিয়া ছিলো;—সকালে শয্যাত্যাগ করার পর হইতেই মাথাটা তাহার ভার-ভার লাগিতেছে, চোখ দু'টাও যেন স্বাভাবিক অবস্থায় নাই, থাকিয়া-থাকিয়া থামকা জলে ভরিয়া উঠিতেছে, গলার স্বরও কিঞ্চিৎ ভারাক্রান্ত। কিন্তু রমাকান্তর স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি অনুসারে এই উপসর্গগুলি এমন গুরুতর নয়, যাহার জন্য বহির্গমন ব্যাপারটা অপ্রশস্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে। তবু স্ত্রীর প্রখর দৃষ্টির সম্মুখে সে আচার-চুরি-করিয়া-খাইতে-গিয়া-ধরা-পড়া ছোটো ছেলের মতো সংকুচিত হইয়া উঠিল। মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'না শরীর তেমন-কিছু খারাপ তো হয়নি; তা ছাড়া, বাইরে একটু কাজ আছে, তাই—'

'হ্যাঁ, কাজ যা আছে, তা জানি।' সুধা হাসিয়া ফেলিল।

সুধার এখনও সন্তানবতী হওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই, তাই মেজাজটি তাহার ভালো আছে। বিবাহের পূর্বে পুরা দুই বৎসর রমাকান্ত তাহার সহিত—যাহাকে বলে, প্রেম করিয়াছে, এবং সেই প্রেম একেবারে একপক্ষীয় ছিল, এ-কথা বলিলে সুধার প্রতি অবিচার করা হয়। সেই তরঙ্গ-মুখর দিনগুলির উচ্ছ্বাস তাহাদের বিবাহিত জীবনেও একটি গাঢ় মাধুর্য বিস্তার করিয়া দিয়াছে; তাই সুধা হাসিমুখে বলিল, 'মিথ্যে কথা

বলার কায়দা জানো না, তবু কেন বলতে যাও ? আচ্ছা বেশ, বকশিবাজারের আড্ডায়, কিন্তু ছাতাটা নিয়ে যেয়ো, আর এগারোটা এসো, নইলে চাকর-বাকর খিটিমিটি করে ;— বুঝলে ?'

পাঞ্জাবির বোতাম লাগাইতে গিয়া রমাকান্ত আবিষ্কার করিল, বোতাম নাই ; গলারটা আছে — না-থাকিলেও চলিত। সে সুধাকে 'ওগো, শিগগির একটা সেফটিপিন দিয়ে যাও তো, বোতাম ছুটো নিয়েছে। কী মুশকিল !'

'ছিঁড়ে আবার নেবে কে ? নিজেই কোথায় ফেলেছো, ঠিক নেই। বোতাম সাড়ে-আটচল্লিশ টাকা দামের জিনিশ কিনা — তা নেবার জন্য ব নেই !…ও-জামাটা খুলে রাখো না, বাক্স থেকে আর একটা বের ক'রে দি

বিলম্বের আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া রমাকান্ত বলিল, 'না, না, কিছু দরকার আপাতত খুব চ'লে যাবে। লক্ষ্মী তো, দাও একটা সেফটিপিন।'

'দিচ্ছি গো দিচ্ছি, একটুও যে তর সইছে না।'

বাঁ হাতের চুড়ির সঙ্গে সংলগ্ন প্রায় আধডজন সেফটিপিন হইতে সুধা রমাকান্তর পাঞ্জাবি আঁটিয়া দিল। সেই সময় হঠাৎ রমাকান্তর গলা পড়িতেই সে চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, 'এ কী ? জ্বর হয়নি তো ? গরম

চক্ষের পলকে রমাকান্তর মুখ গৃহে অবস্থানরূপ অমঙ্গলাশঙ্কায় ম্লান অতি কষ্টে মুখে কাষ্ঠহাসি টানিয়া বলিল, 'পাগল হয়েছো ? সর্দি হয়েছে গা-টা একটু গরম।'

'বটে ?' সুধা আবার স্বামীর কপালে হাত রাখিল, তারপর নিজের ক দু'জনের উত্তাপ তুলনা করিতে লাগিল। তিন-চার বার এইরূপ ব মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'না, না, ও কিছু নয়। এমনি গা-টা একটু গরম হয়েছে ছাতাটা নিয়ে বেরোও - আর ঐ যা বললাম, এগারোটার মধ্যে ফিরে অ ও কী ? অমনিই চললে ?'

বহুদিনকার প্রথানুসারে রমাকান্ত দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া স্ত্রীর মুখে চুম্বন সারিয়া বাহির হইয়া গেল। স্বামীর ওষ্ঠ-স্পর্শ সুধার মুখে বিশ্রীরকম হয়তো আজ স্বামীকে বাহির হইতে দেওয়া তাহার উচিত হয় নাই। নানা কাজের মধ্যে থাকিয়াও খুঁতখুঁত করিতে লাগিল।

আকাশের এক কোণে বহুক্ষণ হইতেই মেঘ সাজিয়া ছিল, রমাকান্ত পার হইয়া ডাক-বাংলার কাছে আসিতে-না-আসিতেই যেন তাহাকে জ

জন্যই বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। ভাগ্যিশ সুধার কথামতো সে ছাতাটা আনিয়াছিল, নতুবা একেবারে নাজেহাল হইতে হইত। ছাতা মেলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। বহু পথচারী ডাক-বাংলার বারান্দায় গিয়া আশ্রয় লইল, কিন্তু যেন বৃষ্টির উপর অভিমান করিয়া সে চলিতেই লাগিল। আসুক না বৃষ্টি ;—দেখি, কত জোরে আসিতে পারে! তাহার ছাতা আছে, বৃষ্টিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সে অগ্রসর হইবে। ছাতায় মাথাটা বাঁচিল বটে, কিন্তু জলের ঝাপটায় তাহার হাঁটুর নিচ হইতে পা পর্যন্ত ভিজিয়া গেল। গেলই বা ;—ওখানে গিয়া কাপড়টা ছাড়িয়া ফেলিলেই চলিবে।

বৃষ্টিটাই বা কেমন! খানিকক্ষণ হুড়মাড় দুমদাম করিয়া বলা কহা নাই, অকস্মাৎ একেবারে নীরব, নির্জীব হইয়া গেল ;—দেখিতে-দেখিতে ভিজা রাস্তার উপর উজ্জ্বল রৌদ্রালোক ঝকঝক করিতে লাগিল ; আড্ডায় গিয়া পৌঁছিতে-পৌঁছিতে রমাকান্তর মুখে বিজয়ের সবল হাসি ফুটিয়া উঠিল ;—বৃষ্টিকে উদ্দেশ করিয়া যেন তিক্তস্বরে কহিতে চায়—এইবার কেমন ?

বন্ধুদের চায়ের মজলিশই তখন পর্যন্ত ভাঙে নাই। মাঝের হলটিতে একটি গোল টেবিলের চারিদিকে বসিয়া পাঁচটি যুবক অবিবাহিতজনোচিত হল্লা করিতেছিল ; ভিজা ছাতি হাতে রমাকান্তকে ঢুকিতে দেখিয়া তাহাদের ফুর্তি আরো যেন বাড়িয়া গেল। ছাতিটিকে ঘরের এককোণে দেয়ালের সঙ্গে ঠেশ দিয়া রাখিয়া হাতে হাত ঘষিতে-ঘষিতে সে তাহাদের মধ্যে একটি চেয়ার নিয়া বসিল।

'কী বিশ্রী বৃষ্টি বাবা!' রমাকান্ত কথা কহিতে গিয়া দেখিল, তাহার কণ্ঠনালী দিয়া স্বর বাহির করিতে বিলক্ষণ প্রয়াস পাইতে হইতেছে। তবু সে যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে কহিল, 'কই হে, এক-আধ পেয়ালা আছে নাকি ?'

'নেই আবার!' ইকনমিক্স-এর সতীশ রায় হেঁড়ে গলায় চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ওরে রামগতি, অগতির গতি, কোথায় গেলি ?—'

রমাকান্তর কানে এই চীৎকার অসহ্য কর্কশ ঠেকিল। মনে হইল, তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুকোমল পর্দা যেন এ-আঘাতে ফাটিয়া যাইবে।

তাহার পাশে বসিয়া ইংরেজির অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার বিজন হালদার 'স্টেটসম্যান' পড়িতেছিল ; সে বলিতে লাগিল, 'দেখছ রমাকান্ত, বর্নার্ড শ-র latest photograph! বুড়ো স্পেনে গিয়ে ট্যাঙ্গো-নাচ শিখছে।'

রমাকান্ত ছবিখানি সকৌতুকে নিরীক্ষণ করিল। মুখে বলিলও, 'আশ্চর্য! এখন পর্যন্ত বুড়োর কী প্রচুর প্রাণ!' কিন্তু কথাটা বলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার মন বলিতেছিল, 'আমার তাতে কী ?'

রামগতি যখন তাহার সুমুখে এক পেয়ালা চা রাখিয়া গেল, ততক্ষণে সে নিজের কাছে এইটুকু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে শরীর তাহার খারাপ হইয়াছে। ভাবিল, এই গরম চা-টা খাইয়া ফেলিলেই একটু চাঙ্গা বোধ করিবে। সাগ্রহে সে পেয়ালায় চুমুক দিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রসনায় কোনো স্বাদ পাইল না। তাহার জিহ্বার উপর যেন কিসের একটা অপরিষ্কার পর্দা পড়িয়াছে, সেখানে কোনো স্বাদের অনুভূতি আর নাই। তবু সে জোর করিয়া চা খাইতে লাগিল।

হেমন্ত আর দ্বিজেন দুই জনেই ফিলজফি ডিপার্টমেন্টের, এবং এই দুইজনের জীবনের এক অর্ধেক অধ্যাপনা ও বাকি অর্ধেক cross-word puzzle। এই দুইটি প্রাণী এতক্ষণ টেবিলের উপর একখানা সাপ্তাহিক 'Times of India' মেলিয়া ধরিয়া মাথা দুইটা অত্যন্ত কাছাকাছি নিয়া কাগজ-পেন্সিল সহযোগে গলদ্ঘর্ম হইতেছিল; দ্বিজেন হঠাৎ মাথা তুলিয়া রমাকান্তকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওহে, পাঁচ অক্ষরে "the name of a town in Northern India" বলো তো?'

প্রশ্নটা সমঝাইতেই রমাকান্তর প্রায় এক মিনিট কাটিয়া গেল; তারপর হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, 'কেন, Delhi?'

হেমন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল, 'সাবাশ! আমরা কী বোকা, এতক্ষণ এইটের জন্য মাথা খুঁড়ছিলাম। রোসো, দেখি—D-e-l-h-i—উহুঁ—মিললো না।' পেন্সিলটা সে হতাশভাবে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। 'আরেকটা বলো দেখি।'

রমাকান্ত শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, 'প্রশ্নটা না কী?'

হেমন্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, 'এরি মধ্যে ভুলে গেলে? "The name of a town in Northern India"।'

রমাকান্ত সরলচিত্তে কহিল, 'Allahabad।'

'দুর ছাই! পাঁচ অক্ষর। পাঁচ অক্ষরে হওয়া চাই।'

'ও।' রমাকান্ত ভাবিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মস্তিষ্কের সকল কলকব্জা যেন বিকল হইয়া গেছে; কোনো-একটা বিষয় সে আর শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে না; সবই যেন পিছলাইয়া ফশকাইয়া যায়। রমাকান্ত উত্তর-ভারতের বিভিন্ন শহরের নাম মনে আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু থাকিয়া-থাকিয়া একটি কথাই তাহার মাথায় ঘোরাফেরা করিতে লাগিল, 'The name of a town in Northern India'। এই কয়টি কথা যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে; এই কয়টি কথার অর্থ সে যেন শত চেষ্টা করিয়াও উদ্ধার করিতে পারিতেছে না। হঠাৎ একসময়

সে দেখিল, সে প্রত্যেকটি শব্দ বারংবার আলাদা করিয়া উচ্চারণ করিতেছে, 'The, name, of, a, town…'

সচকিত ও নিজের কাছেই লজ্জিত হইয়া সে একটা-কিছু আলাপ করিবার চেষ্টা করিল। পার্শ্বোপবিষ্ট বিজনকে একটা ঠেলা মারিয়া কহিল, 'গলসোআর্দির নতুন বইটা পড়েছো?'

'"Swan Song?" পড়েছি বইকি। কী বই-ই লিখেছে। গলসোআদির আর্টের বিশেষত্বই এইখানে যে…'

এতৎপর সে গলসোআর্দির লিখনভঙ্গি সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিল। রমাকান্ত মন দিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মাঝে-মাঝে গলসোআর্দি নামটা ছাড়া তাহার কানে বা মাথায় কিছুই ঢুকিল না। অবাক হইয়া সে নিজ মনে ভাবিতে লাগিল, 'গলসোআর্দি কে যে তাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছি?' বিজনের উচ্চ ও আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠস্বর তাহার মনে হইল যেন অনেক দূরে কে অবিশ্রান্ত পেরেক ঠুকিতেছে।

ম্যাথমেটিক্স-এর হরিপদ সরকার এতক্ষণ টেবিলের অপর প্রান্তে বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিল; এইবার উঠিয়া আসিয়া রমাকান্তর সুমুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কী, রমাকান্ত? চা প'ড়ে রইলো যে।'

ক্ষণতরে রমাকান্ত সচেতন হইয়া উঠিয়া বলিল, 'ভালো লাগছে না।'

বলিয়া সে হাসিবার একটা পরিহাস করিয়া হরিপদর মুখের দিকে তাকাইল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হরিপদর মুখ দেখিতে পাইল না। তাহার দৃষ্টি অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দুর্বল হইয়া গেছে:- হরিপদর সুপরিচিত সুন্দর মুখখানা যেন একখণ্ড গোলাকৃতি শাদা মেঘের মতো তাহাকে ভ্যাংচাইতেছে। তাহার চোখ দুইটি ক্লান্ত পাখির ডানার মতো নিজে-নিজেই বুজিয়া আসিল। তাহার সারা গা-ময় ব্যথা, হাড়গোড়-সুদ্ধ কে যেন চিবাইয়া খাইতেছে, মাথার উপর যেন গন্ধমাদনের বোঝা চাপানো, ঘাড়ের উপর মাথাটাকে সে খাড়া করিয়া রাখিতে পারিতেছে না; মুখে-চোখে যেন ভাদ্রের রৌদ্র জ্বলিয়াছে—এমনি জ্বালা।

যেন একশো বছর আগেকার কথা, তেমনি অস্পষ্টভাবে তাহার মনে পড়িল, সুধা তাহাকে আজ বাড়ির বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল।

নিজেকে শেষবারের মতো সজাগ করিয়া লইয়া সে বলিল, 'একটা গাড়ি আনিয়ে দাও তো হরিপদ, আমার বোধ হয় জ্বর হয়েছে।'

হরিপদ ফট করিয়া তাহার কপালে হাত রাখিয়া বলিল, 'তাই তো!'

সতীশ বলিয়া উঠিল, 'সত্যি? জ্বর হয়েছে? যাও, এক্ষুনি বাড়ি চ'লে যাও। কেন মিছিমিছি বৃষ্টিতে ভিজলে?' তারপর আবার হেঁড়ে গলায় চীৎকার করিতে লাগিল, 'রামগতি, ওরে রামগতি!'

দ্বিজেন একবারমাত্র মাথা তুলিয়া কহিল, 'নিজের শরীরের অবস্থাও বুঝতে পারো না?' বলিয়াই মৃদুস্বরে গুঞ্জন করিতে লাগিল, 'A term used in golf…'

বিজন ততক্ষণে গলসোঅর্দিকে অবলম্বন করিয়া সিনক্লেয়ার লুইস-এ গিয়া পৌঁচিয়াছিল; এইমাত্র উপলব্ধি করিল যে এতক্ষণ সে আপন মনেই বকিয়া যাইতেছে। তবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না-হইয়া বলিল, 'জ্বর হয়েছে? যাক, দু' একটা দিন rest পাবে। আজ আবার তোমার off-day ছিলো না তো?—যাই, আমার আবার আজ সাড়ে-দশটা থেকেই চ্যাঁচানোর পালা!'

অত্যন্ত উদাসীনভাবে সে 'স্টেটসম্যান' খানা হাতে লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

হেমন্ত কহিল, 'ত্মাখো হরিপদ, "a great German scientist of the nineteenth century" বলো দিকি। ন' অক্ষর।'

রমাকান্ত ভাবিতে লাগিল, সমস্ত লোকই কী ভয়ানক স্বার্থপর। এদিকে সে জ্বরে ধুঁকিতেছে, অথচ ইহাদের কাহারো কোনো উদ্বেগ নাই; সবাই নিশ্চিন্তচিত্তে ক্লাশের পড়াশুনা আর cross-word puzzle লইয়া ব্যস্ত আছে। বন্ধুত্ব কথাটারই উপর তাহার অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল।

* * *

গাড়িতে সে সারাক্ষণ একটা বিশ্রী শীত-শীত ভাব ও গাঢ় তন্দ্রার আলস্য অনুভব করিতে লাগিল;—তাহার সমস্ত শরীর যেন ভাঙিয়া আসিতেছে; শরীরটাকে ফুট বলের মতো গোল করিয়া পাকাইয়া একটা থলির মধ্যে পুরিয়া হাতুড়ি দিয়া ছেঁচিতে পারিলে সে খুশি হইত। গদির উপর পা দুইটা তুলিয়া দিয়া মাথাটা হাঁটুর ফাঁকের মধ্যে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া এবং দুই হাত দিয়া পা দুটাকে বেড়িয়া ধরিয়া সে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনিতে লাগিল—টক টক টক! কিছুক্ষণ পরে তাহার মনে হইল সে যেন দুইশত সহস্র বৎসর যাবৎ অবিশ্রান্ত এই শব্দই শুনিয়া আসিতেছে—আর ভালো লাগিতেছে না। বিরক্ত হইয়া সে মাথা তুলিয়া জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইল,—বাড়ির রাস্তার মোড়ের কাছাকাছি আসিয়াছে। গাড়োয়ানকে সে হাঁকিয়া বলিল, 'বাঁয়ে যাও',—তারপরেই আবার মাথা নত করিল।

গাড়োয়ানকে বাড়ির সামনে থামিতে বলিতে হইবে, এবং নামিয়া বাড়ির ভিতর

ঢুকিতে হইবে. এটুকু সজ্ঞানতা তাহার তখনও ছিল। ভাড়া চুকাইবার জন্য গাড়োয়ানকে সে একটি টাকা দিল ;—এবং ফেরৎ পয়সা দেখিয়া গুনিয়া লইল।

সুধার কাছে আজ তাহাকে লজ্জা পাইতে হইবে, এই চেতনা তাহার দুর্বল মস্তিষ্কে সূচের তীক্ষ্ণপ্রান্তের মতো লাগিয়া রহিল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া সে একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। চেয়ারটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, তাহার সমস্ত শরীর সংকুচিত হইয়া উঠিল। দৈবাৎ আয়নায় একবার নিজের ছায়া দেখিল—চোখ দুইটা ভীষণ লাল হইয়াছে ;—টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া সে চোখ বুজিল ; আবার মনে হইল, ঘোড়ার খুরের টকটক শব্দ শুনিতেছে।

শাড়ির আঁচলে ও ডান হাতের তিনটা আঙুলে হলুদের দাগ লইয়া সুধা সেই সময়ে ঘরে ঢুকিল ; আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া স্নানের পূর্বেকার প্রসাধন সারিয়া লইতে-লইতে বলিল, 'একেবারে গুড বয় হয়েছো দেখছি—দশটার মধ্যেই হাজির। যাও এবার, স্নান করো গে না, আমি আগে যাবো ? আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি আগে, তোমার তো আবার শেভ করা আছে, না কী ?'

সুধা অযথা বিলম্ব না করিয়া ঘরের বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় রমাকান্ত হাঁড়ির ভিতর হইতে কথা বলার মতো করিয়া বলিল, 'আমার বোধ হয় জ্বরই হ'লো সুধা ; বিছানাটা পেতে দাও।' মুহূর্তের জন্য সে যে একেবারে বিবর্ণ. পাংশু হইয়া গেল, রমাকান্ত তাহা দেখিতে পাইল না। সে যখন দেখিল, স্ত্রীর স্বাভাবিক হাসিমুখই দেখিল। সুধা তাহার কপালে. গলায়, বুকে বার-বার হাত রাখিয়া শুধু বলিল, 'হ্যাঁ, একটু তো হয়েছেই।' এ-কথা কিন্তু সে একটিবারও বলিল না, 'কেমন, আমি তো আগেই বলেছিলাম।'

শুভ্র, পরিপাটি বিছানায় কম্বলমুড়ি দিয়া শুইয়া রমাকান্ত ভাবিতে লাগিল, 'সুধা—সুধাও একটু ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন হ'লো না। আজো ও নাইতে গেছে।'

ক্ষুদ্র শিশুর মতো মূক অভিমানে সে নিজেকে আহত করিতে লাগিল। চোখ বুজিয়া সে নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। মনে হইল, বিজন হালদার তাহার শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া গলসোআর্দি সম্বন্ধে চীৎকার করিয়া বক্তৃতা দিতেছে, অথচ তাহার সামনের দুইটা দাঁত নাই ও নাকের ডগা অসম্ভব লাল। রমাকান্ত কতভাবে তাহাকে বারণ করিতে চাহিল: কিন্তু বিজন হালদার বলিয়াই যাইতে লাগিল ; ক্রমে তাহার সমস্ত মুখখানা তাহার নাকের ডগার মতো লাল হইয়া উঠিল ; রমাকান্তর মনে হইল, এক্ষুনি সে মুখ রক্তের চাপে ফাটিয়া যাইবে। ভীত হইয়া সে চক্ষু মেলিল ; দেখিল, তাহার শিয়রের কাছে সদ্যস্নাতা সুধার স্নিগ্ধ মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে ;—

আহারান্তে একটি পান চিবাইতে-চিবাইতে সে আসিয়াছে, - ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল, চুলগুলি এখনো ভিজা, শাদা কপালে আলপিনের মাথার মতো ছোট্ট একটি সিঁদুরের ফোঁটা, একটি চওড়া-পাড় ফর্শা কাপড় পর্যন্ত পরিয়াছে, মুখে পাউডর মাখিতে ভোলে নাই; তাহার মুখ, গলা, নগ্ন বাহু দুটি মর্মরের মতোই মসৃণ ও শীতল। রমাকান্ত দীপ্তিহীন, রক্তিম চক্ষু মেলিয়া দারুণ ঈর্ষার সহিত এই সুস্থ পরিতৃপ্তির প্রতিমূর্তির দিকে তাকাইয়া রহিল। সুধার নগ্ন বাহু দুটির স্নিগ্ধ শীতলতা তাহার সর্বাঙ্গে যেন চাবুক মারিল। ভাতের আস্বাদ সে ভুলিয়া গিয়াছে; ঠাণ্ডা জলের কথা মনে করিতেই তাহার জ্বর যেন দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল; ইহজীবনে সে আর সুসজ্জিত, পরিচ্ছন্ন হইতে পারিবে না, ইহজীবনে সে আর পান খাইবে না। অথচ সুধা প্রতিদিনকার মতোই স্নানের আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, সযত্নে সাজিয়াছে, পরিতোষসহকারে আহার করিয়াছে, পান খাইয়া ঠোঁট রাঙা করিয়াছে—সেই সুধা, যাহাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে, এবং যে তাহাকে ভালোবাসে বলিয়া এতকাল সে বিশ্বাস করিত।

অসহ্য যন্ত্রণার সহিত সে উপলব্ধি করিল যে সুধা তাহাকে ভালোবাসে না; কোনো কালে হয়তো বাসিত, কিন্তু এখন···

বিরক্তিভরে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ বুজিল। শুনিল, সুধা তাহার কানের কাছে বলিতেছে, 'কী গো, খুবই খারাপ লাগছে? একটু-কিছু খাবে? সাবু জ্বাল দিয়ে আনবো? হাওয়া করবো মাথায়?'

রমাকান্তর মনে হইল, সুধা নিজে নানা ব্যঞ্জনসহকারে অন্ন-সেবন করিয়া তাহাকে শুধু একটু সাবু আনিয়া দিতে চাহিতেছে। সারাটা মন তাহার নিমের মতো তিতা হইয়া গেল। সে দুর্বলভাবে মাথা নাড়িয়া অসম্মতিজ্ঞাপন করিল।

কিছুক্ষণ পরে সুধা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, 'দেখি, টেম্পরেচরটা একবার নিই।' রমাকান্ত মুখে কোনো আপত্তি প্রকাশ করিল না, কিন্তু মনে-মনে ভাবিল, 'কেন মিছিমিছি এ-সব লোক-দেখানো ভড়ং?'

থার্মোমিটর নিবার জন্য হাত তুলিতেই সেটা দেয়ালের সঙ্গে গিয়া লাগিল। আঃ, —দেয়ালটি ভারি ঠাণ্ডা কিন্তু। রমাকান্ত দেয়ালের খুব কাছে ঘেঁষিয়া দুর্বল হাতখানা দেয়ালের উপর নিয়া রাখিল; ক্ষণিকের তরে ভারি আরাম পাইল। কিন্তু একটু পরেই সেই স্থানটিও তাতিয়া উঠিল—সে তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া নিল। চার-পাঁচবার এইরূপ করার পর সে ক্লান্ত হইয়া হাত নামাইয়া নিল; এক বিপুল অবসাদ তাহাকে গ্রাস করিতেছে।

হঠাৎ তাহার কানের কাছে লক্ষ-লক্ষ মক্ষিকা যেন গুঞ্জন করিয়া উঠিল, 'The

name of a town in Northern India';—যেন হাজার-হাজার এরোপ্লেনের পাখা এই কথা উচ্চারণ করিতে-করিতে আকাশ ছাইয়া উড়িয়া যাইতেছে; মাটির নিচে হইতেও যেন সহস্র পতঙ্গকণ্ঠে নিঃসরিত হইতেছে, 'The name of a town in Northern India'। তারপর রামগতি তাহার সুমুখে এক পেয়ালা চা রাখিয়া গেল, সে তাহার মুখের কাছে তুলিতেই হরিপদ চীৎকার করিয়া উঠিল, 'খেয়ো না, খেয়ো না—ওটা বিষ!' কিন্তু বলিতে-না-বলিতেই সে এক চুমুক খাইয়া ফেলিয়াছিল; --দেখিতে-দেখিতে সে মরিয়া গেল। সতীশ একটু দূরে বসিয়া মুচকি হাসিতেছে। সতীশ কেন তাহাকে খুন করিতে গেল?

সে মরিয়া গিয়াছে; অনেক লোকের কাঁধে চড়িয়া সে শ্মশানে চলিয়াছে। সুধা বিধবা হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরনে চওড়া-পাড় কাপড়, কপালে সিন্দুর, ঠোঁট দুটি পানের রসে টুকটুক করিতেছে। সে একটু কাঁদিলও না, দরজা পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়া হাসিমুখে তাহাকে বিদায় দিল। দ্বিজেন সাইকেলে চড়িয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'A term used in golf—তিন অক্ষর।'

শ্মশান তো নয় দেওঘর। সবে সকাল হইয়াছে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ নীল আকাশের গায়ে সূর্যের প্রথম রক্ত-রশ্মি সহস্রখণ্ড হইয়া ভাঙিয়া গেল। কাঁকর-ভরা পথ অজস্র অশোকে লাল হইয়া গেছে;—ঘন অশোকগুচ্ছে দিগন্তরেখা গাঢ় রক্তবর্ণে উদ্ভাসিত। সে আর সুধা নন্দন-পাহাড়ের দিকে চলিয়াছে। বাসন্তী রঙের শাড়িখানা সুধার গৌরতনুকে সস্নেহে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে; যদিও পথে যতদূর দৃষ্টি যায় আগে-পাছে একটি প্রাণীও নাই, তবু তাহারা নিম্নস্বরে আলাপ করিতেছে।

তখন সে প্রথম সুধার প্রেমে পড়িয়াছে। সুধা তখন তাহাকে ভালোবাসিত, সত্যই ভালোবাসিত। সেই দেওঘরের একটি সকালবেলা কি এখন কোনোমতেই ফিরিয়া পাওয়া যায় না?

নন্দন-পাহাড়ের কাছে আসিয়া দেখিল পাহাড়ের চূড়ায় এক অতিকায় দানবতুল্য লোক কণ্ঠস্বরে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া বারংবার বলিতেছে, 'The name of a town in Northern India. The name of a…'

রমাকান্ত চাহিয়া দেখিল, সুধা আর তাহার পাশে নাই, কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়াছে।

ইহারই মাঝখানে একবার চোখ মেলিয়া রমাকান্ত দেখিল, তাহার শিয়রের পাশে একটি টেবিলে মোমবাতি জ্বলিতেছে; সেই টেবিলের উপর সোডার বোতল, কাচের

গেলাশ, ঔষধের দাগ আঁকা শিশি, গোটা কয়েক বেদানা, একটি চামচ সে দেখিতে পাইল। বিমূঢ়চিত্তে সে ভাবিল, এ-সব কেন? কাহার জন্য? সে কখনো বেদানার রস বা কোনো ঔষধ খাইয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িল না।

সুধা উৎসুকনেত্রে তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'গরম জলের ব্যাগটা আবার দেবো?'

'গরম জলের ব্যাগ?' বোকার মতো সে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া আবার চক্ষু বুজিল। আবার দেওঘর। অশোকগুচ্ছে লাল কাঁকর-ভরা পথ। সকালবেলা। অদূরে নন্দনপাহাড়। সে আর সুধা। সেই প্রথম প্রেম, প্রেমের প্রথম সুধা-আস্বাদন। সুধা তখন তাহাকে ভালোবাসিত। সেই সুধা এখন কত বিচ্ছিন্ন, কত পর! সে মরিয়া গিয়াছে, তবু সুধা চওড়া-পাড় শাড়ি পরে, পান খাইয়া ঠোঁট লাল করে।...ক্ষোভে দুঃখে তাহার কান্না পাইল।

* * * *

পরদিন। সকাল সাতটা। পর-পর ছয়-সাতটা বালিশ চাপাইয়া তাহাতে ঠেশ দিয়া একটা চাদর পা হইতে কোমর পর্যন্ত টানিয়া রমাকান্ত খাটের উপর বসিয়া আছে। ভোরের দিকেই তাহার জ্বর গা-ব্যথা, চোখ-জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ সমেত তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, শুধু রাখিয়া গিয়াছে দেহের ইন্দ্রিয়গুলির অপার দুর্বলতা ও কর্মবিমুখতা। ঘরের সবগুলি জানালা খোলা—অনেকখানি তাজা রৌদ্র আসিয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাহিরের মেঘমুক্ত উজ্জ্বল আকাশের দিকে চাহিয়া রমাকান্ত প্রচুর অনির্বচনীয় আরামে নিশ্বাস-প্রশ্বাস টানিতেছে। আজ সমস্ত-কিছুই তাহার অত্যন্ত ভালো লাগিছে;—ঘরটি কী সুন্দর গুছানো, বিছানা নিভাঁজ, শাদা ও কোমল;—এমনকি, অনতিদূরে ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজও তাহার কানে মধুর লাগিল।

সুধা এক পেয়ালা চা হাতে নিয়া ঘরে ঢুকিল; বলিল, 'চা-টা একটু পাৎলা করেছি, এখন এ-ই খাও, তারপর ডাক্তারবাবু এলে—'

রমাকান্তর হাতের কাছে একটি টিপাই টানিয়া পেয়ালাটি সেখানে রাখিল।

রমাকান্ত তাহার হাত ধরিয়া আস্তে টানিয়া বলিল, 'থাক চা;—তুমি আমার কাছে এসে একটু বোসো, সুধা!'

দুর্বল একখানি হাত দিয়া সুধার কটিবেষ্টন করিয়া বলিল, 'কাল সারারাত ভারি বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখছিলাম—যেন তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না।'

সুধা স্বামীর মুখের উপর পরিপূর্ণ একখানি দৃষ্টি রাখিয়া একটু হাসিল মাত্র।

'সেইটেই আমার সব কষ্টের চেয়ে বেশি হয়েছিলো। ইশ—কেন মানুষের জ্বর হয়?' তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কী, তোমার আঙুলে ব্যাণ্ডেজ কিসের?'

সুধা লজ্জিত হইয়া হাতখানা সরাইয়া নিয়া অপ্রতিভভাবে বলিল, 'ও কিছু নয়, কাল একটা সোডা খুলতে গিয়ে একটু লেগেছিল।'

যে-সুধাকে সে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে, সেই সুধার এই দুর্ঘটনার সংবাদে রমাকান্তকে একটুও চঞ্চল হইতে দেখা গেল না। সোডার বোতলে হাতকাটা যে কতখানি বিপজ্জনক, তাহাও সে উপলব্ধি করিতে পারিল না। বলিল বটে, 'তাই নাকি? খুব বড়ো ঘা হয়নি তো? ডাক্তারবাবু এলে দেখিয়ো।' কিন্তু পরক্ষণেই সে ব্যাপারটা ভুলিয়া গেল। তাহার শরীর পাখির মতো হলকা হইয়া গিয়াছে; ইচ্ছা করিলে সে বোধ হয় এখন আকাশে উড়িতে পারে। মেঝের উপর লুটাইয়া-পড়া রৌদ্র-রেখার প্রতি তাকাইয়া হাসিমুখে সে চায়ের পেয়ালাটি মুখে তুলিল।

১৯২৮ 'রেখাচিত্র'

মেজাজ

মাথার মধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া একটা গল্পের প্লট ঘোরাঘুরি করিতেছিল। সম্পাদকের কাছ থেকে তাগাদা পাইতেছি; তাই সেদিন সকালবেলা পেয়ালা চারেক চা খাইয়া যথেষ্ট শারীরিক ও স্নায়বিক বল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সবেমাত্র কাগজ-কলম লইয়া বসিয়াছি, এমন সময় তিনটি সুন্দর, সুবেশ ও অপরিচিত যুবক ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নমস্কার করিলেন।

অপরিচিত বলিলাম বটে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রীতিজ্ঞাপনের মহান উদ্দেশ্য লইয়াই যে তাঁহারা আসেন নাই, তাহা বুঝিতে আমার দেরি হইল না। বলিলাম, দেখুন, এই কালকেই আমি এক বন্যা-রিলিফ নাটকের টিকিট কিনতে বাধ্য হয়েছি, যদিও আমি নাটক দেখতে যাইনি—

যুবক তিনটি আমার অনুরোধের অপেক্ষা না-করিয়াই বসিয়া পড়িয়াছিলেন; একজন তাঁহার লম্বা চুলে আঙুল চালাইয়া বলিলেন, বিলক্ষণ! ল—স্টেজে ভদ্রলোক যেতে পারে? আমাদের পারফরমেন্স হবে ব—ইনস্টিটিউটে, ন—রোডে। আপনার জন্যই এ-ব্যবস্থা। এই নিন—এর একখানা রাখুন। বলিয়া এক মধুর হাসিতে আমাকে আপ্যায়িত করিয়া তিনি টেবিলের উপর একখানা দশ টাকা মূল্যের টিকিট রাখিলেন।

আমি সবিনয়ে মৃদু প্রতিবাদ করিয়া জানাইলাম যে বর্তমানে আমার সময়ের অভাব, সুতরাং অভিনয়-দর্শনের আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিতে হইবে।

এইবার দুই-নম্বর যুবক কথা কহিলেন না-হয় দয়া ক'রে একটু ঘুরেই আসবেন। আপনার বাড়ি থেকে দু'পা বই তো নয়! সেই স—রোডের চায়ের দোকানে তো যান—

প্রথম বক্তা জোগান দিলেন, এমনকি রাত বারোটার সময়েও আপনাকে সেখানে দেখা গিয়েছে—

সঙ্গে-সঙ্গে তিন জনে মিলিয়া এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যেন এতক্ষণে তাঁহারা একটি অব্যর্থ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন।

কিন্তু যে-ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। বরং সে সংক্ষিপ্ত ভদ্রতায় বলিল, টাকা নেই। দুঃখিত।

এই কথা বলিয়া আমি পরিত্যক্ত কলমটি তুলিয়া লইয়া কাগজের উপর মাথা নিচু করিলাম। ভাবিলাম, আমার এই কথার শৈত্যে তাঁহাদের সকল উৎসাহ জমিয়া বরফ

হইয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের ট্রপিকল দেশের লোকের উৎসাহের উষ্ণতা যে কী নিদারুণ তাহার পরিচয় পাইতে আমার তখনও দেরি ছিল।

প্রথম যুবক একগাল হাসিয়া বলিলেন, টাকা নেই? হুঃ আপনার তো মাসে সিগারেটই খরচ হয় এক-শো টাকা!

চমৎকৃত হইয়া মাথা তুলিতেই তিন নম্বর যুবক (তিনি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন) বলিলেন, যা-ই বলুন না কেন, আপনাকে একখানা টিকিট না-গছিয়ে আমরা যাচ্ছিনে। টাকা না-হয় এখন না-ই দিলেন। হেঁ হেঁ—আপনার মতো লোকের কাছ থেকে তো আর সামান্য দশটা টাকা মারা যাবে না। বলিয়া ঈষৎ হাস্য-স্ফুরিত মুখে তিনি সঙ্গীদের মুখের দিকে চাহিলেন। সঙ্গীরা তাঁহাকে সমর্থন করিয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

মনে করিলাম এই সৌভাগ্যবানদের পিতারা রেঙ্গুনের কণ্ট্রাক্টর বা মৈমনসিংহের জমিদার না-হইয়া যান না—নহিলে মাসে একশো টাকার ধুমপানের কল্পনাই বা ইঁহারা করিলেন কী রূপে? দশটা টাকার মূল্য ইঁহাদের কাছে হয়-তো এক ফুঁও নয়। রাজার মেয়ে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাদের কালো রুটি খাইতে বলিয়াছিলেন - আমাদের মতো মধ্যবিত্ত লোকদের অবস্থা ইঁহারা বুঝিবেন কী করিয়া? নিজের দারিদ্র্যে লজ্জিত হইয়া ম্লানমুখে বলিলাম, আমার পক্ষে বাস্তবিক টিকিট কেনা অসম্ভব। অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ক্ষমা করবেন।

ভদ্রলোকের পক্ষে এ-কথার উপরে আর কথা নাই; তাই নিশ্চিন্ত হইয়া আবার মাথা নিচু করিলাম; এবং যদিও এই সদালাপে মাথাটা অনেকটা গুলাইয়া গিয়াছিল—গল্পের প্রথম লাইন লিখিয়াও ফেলিলাম।

কিন্তু ঘরে অন্য লোক থাকিলে সরস্বতী আসিতে লজ্জা পান; তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিতে হইল, আপনারা এখানে ব'সে আছেন কেন? এ-পাড়ায় ঢের বড়োলোক আছেন, তাঁদের কাছে গেলে অনেক টিকিট বিক্রি হ'য়ে যেতে পারে। তাছাড়া - ঢোক গিলিয়া বলিলাম—দেখছেন না, আমি একটু কাজে ব্যস্ত আছি।

প্রথম যুবক (তাঁহাদের কাহারও নাম জানিবার সৌভাগ্য হয় নাই বলিয়া উপস্থিত প্রয়োজনে নম্বর দিয়া সারিতে বাধ্য হইলাম) দশ টাকার টিকিটের বইটি তুলিয়া পকেটে রাখিলেন; তারপর উঠিবার একটা ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, তাহ'লে এর একখানা রেখে যাচ্ছি। বলিয়া পাঁচ টাকার বই থেকে একখানা টিকিট ছিঁড়িবার উপক্রম করিলেন।

আমি ব্যাকুলভাবে বাধা দিয়া বলিলাম, করছেন কী? আমি তো ব'লেই দিয়েছি—

দুই নম্বর বলিলেন, আপনি টিকিট কেনেননি, এ-কথা আমরা লোককে বলবো কী ক'রে?

এতক্ষণ সহ্য করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু এই কথাটা শুনিয়া বাস্তবিক বিরক্ত হইলাম। মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, বলতে না-পারেন বলবেন না; কিন্তু আমার যাবার সময় হবে না।

এক নম্বর বলিলেন, তাতে কী? কত বড়োলোক তো দশ টাকার টিকিট কিনে নেন অথচ থিয়েটারে যান না।

ততক্ষণে আমার গল্প মাথায় উঠিয়া আসিয়াছিল। ফাউন্টেন পেনটি বন্ধ করিয়া রাখিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া চ্যারিটি-সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আরম্ভ করিতে যাইব এমন সময় আমার ন' বছরের ভাই-পো টুকু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকামণি, ক'টা বেজেছে?

ঘড়িতে চাহিয়া দেখিলাম, ন'টা বাজিবার দশ মিনিট বাকি। শিশুর পক্ষে দশ মিনিটের কোনো মূল্য নাই মনে করিয়া বলিলাম, ন'টা।

টুকু অন্তর্হিত হইলে দেখিলাম, আমার বড়ো সাধের বক্তৃতা মনের মধ্যে তাল পাকাইয়া গিয়াছে। অনেক চেষ্টায় মেজাজ সামলাইয়া বলিলাম, আমার সময় নেই, টিকিট আমি কিনবো না। যদি থাকতো তাহ'লেও কিনতাম না। বন্যার চাঁদা এর আগে নানাভাবে দিতে হয়েছে, আমার অবস্থার লোকের পক্ষে বেশিই হয়েছে। এর বেশি অসম্ভব। একটু থামিয়া বলিলাম, দেখছেন আমি কাজ করছি, আপনাদেরও এখানে কোনো আশা নেই; কেন মিছিমিছি আপনাদের ও আমার সময় নষ্ট করছেন?

কিন্তু পরোপকার-রূপ মহাব্রত অবলম্বন করিয়া যাঁহারা দিবারাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সময়ের মতো একটা তুচ্ছ জিনিশের প্রতি তাঁহারা বিন্দুমাত্র মূল্যও আরোপ করিবেন না, ইহা আর বিচিত্র কী? তাই এই কথার পরেও এক নম্বর উঠিবার কোনো গা দেখাইলেন না; বরং পকেট হইতে তিন টাকার বই বাহির করিয়া বলিলেন, আচ্ছা যান, এরই একখানা রাখুন। কথাটা এমন সুরে বলা হইল যেন আমার প্রতি নিতান্ত কৃপা করিয়া তাঁহারা তিন টাকায় নামিলেন।

আমি চেয়ারে শক্ত করিয়া হেলান দিয়া দুই হাতে হাতল আঁকড়াইয়া ধরিলাম। উপস্থিত তিনজনের মুখের দিকে হিংস্রভাবে (আমার বিশ্বাস) একবার করিয়া তাকাইলাম। তারপর গলা-খাঁকারি দিয়া বলিতে শুরু করিলাম, দেখুন, এই চ্যারিটি-শো জিনিশটারই আমি পক্ষপাতী নই। আমি যদি কোনো কাগজ বা সমিতির মারফৎ

চার আনাও পাঠাই তবু একটা তৃপ্তি আমার থাকে যে সে-চার আনাই ঠিক জায়গায় পৌঁছবে। কিন্তু আমি যদি দশ টাকা দিয়ে আপনাদের একটা টিকিট কিনি তো বন্যার ফণ্ডে যাবে দশ পয়সা, বাকি ন' টাকা সাড়ে-তেরো আনা খরচ হবে আপনাদের থিয়েটরে। বন্যাপীড়িতদের কথা ভেবে আপনারা যে একটু কম খাবেন-দাবেন তাও তো নয়। একটি পয়সার পান খেলে সে-খরচটাও তো চাঁদা-দেনেওলাদের কাছ থেকে আদায় ক'রে নেবেন। আপনাদের এই বিলাস জোগাবার জন্য—

—কাকামণি,-ক'টা বেজেছে ?

মনের উত্তেজনাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ভাষা সবেগ হইয়া উঠিতেছিল, হঠাৎ হোঁচট খাইলাম। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলাম - ন'টা—এই বিলাস যোগাবার জন্য—

—তখনো ন'টা, এখনে ন'টা ? তোমার ঘড়ি কি বন্ধ, কাকামণি ?

নাঃ, কথাটা কিছুতেই শেষ করিতে দিল না ! ইচ্ছা হইল, এক চড় মারিয়া এই উদ্ধত ও দুর্মুখ বালকের দাঁতগুলি দিল্লিতে পাঠাইয়া দিই। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংবরণ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম, না। তুমি এখান থেকে যাও।

টুকু হাসিতে-হাসিতে বাহির হইয়া গেল। জানিলও না, তাহার কত বড়ো একটা ফাঁড়া নেহাৎ কপালগুণে কাটিয়া গেল।

পরোপকার-ব্রতধারী থিয়েটরওলারা এতক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। যাইবার সময় মুখের ভাব কিছু বিরস করিয়া বলিয়া গেলেন, আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম—কিছু মনে করবেন না।

মনে মনে বলিলাম, আমার মাথায় এক বাড়ি দিয়ে বললেই পারতেন, আপনার মাথাটা ফাটিয়ে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না।

যা-ই হোক, রিলিফ বটে ! ইচ্ছা হইল, নতজানু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

হতভাগ্য গল্পটার ভ্রূণহত্যা হইল। সেই প্রথম— ও শেষ—লাইন লেখা কাগজটার দিকে তাকাইয়া আমার কান্না পাইল। প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাবল্যের সহিত কাগজটা শত খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া জানালা দিয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া মারিলাম, কিন্তু জানালার শিকে বাধা পাইয়া সমস্ত টুকরাগুলি ফিরিয়া আসিয়া ঘরের মেঝেময় ছড়াইয়া পড়িল। ইশ্—শ্, ঘরটা কী বিশ্রী, নোংরা হইয়া গেল। আমি যে কত বড়ো বোকা, তাহা আবিষ্কার করিয়া মর্মাহত হইলাম। টেবিলের নিচে কাগজের ঝুড়িটা কি চোখে পড়ে নাই ? বেশ প্রসন্ন মন লইয়াই তো ঘুম থেকে উঠিয়াছিলাম—ওই থিয়েটরি লোকগুলি আসিয়াই আমার সর্বনাশ করিয়া দিয়া গেল।

থাক মেঝেটা নোংরা হইয়া -- কাহারও এমন কোনো দায় পড়ে নাই, সেগুলি কুড়াইয়া ফেলিয়া দিবে। কোনো কাজে মন দেওয়া অসম্ভব—কিছু চিনা-বাসন পাইলে আছড়াইয়া ভাঙিতে পারি বটে। পাছে সত্য-সত্যই ঘরের কোনো জিনিশ ভাঙিয়া ফেলি, সেই ভয়ে ধুপ করিয়া খাটের উপর চিৎ হইয়া পড়িলাম।

কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ার পর সেইদিন প্রথম রোদ উঠিয়াছে। আকাশ নীল, চমৎকার বাতাস বহিতেছে,—একটা গল্প লিখিবার মতো সকাল গেল বটে! বিকাল থেকেই হয়তো আবার বৃষ্টি শুরু হইবে, এবং তিন-চার দিন পর্যন্ত আমার হাতে কলম উঠিবে না। বেচারা গল্প!

কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসের প্রভাবে আমার মনের টেম্পরেচর নামিয়া আসিতেছিল, তাহা নিজেই বুঝিতেছিলাম। এমন সময় শিয়রের কাছে একটি অতি মৃদু কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—কাকামণি।

সঙ্গে-সঙ্গে মার্করি কয়েক ডিগ্রি চড়িয়া গেল। সময়ের একটা আন্দাজ করিয়া বলিলাম, সওয়া-ন'টা।

—তা'হলে ইস্কুলের এখনো দেরি আছে। কাকামণি!

কথা কহিবার শক্তি বা অভিরুচি কোনোটাই ছিল না। চোখ বুঝিয়া স্তিমিতভাবে উত্তর দিলাম—উঁ।

-- কাকামণি!

—কী বার-বার কাকামণি-কাকামণি করছিস? হয়েছে কী বল না।

টুকু ভয়ে-ভয়ে একটু কাছে আগাইয়া হাতের বইখানা দেখাইয়া বলিল, আজকের ইংরেজি পড়াটা একটু ব'লে দাও না।

—এ-জন্যে আমার কাছে এসেছিস কেন? বাড়িতে আর লোক নেই? সুবলের কাছে যেতে পারিসনে—আমি এখন তোর মাষ্টারি করবো ব'সে - না?

টুকু কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিল, ঠাকুমা ব'লে দিলেন তোমার কাছে আসতে।

—ঠাকুমা ব'লে দিলেন—না? তোর ঠাকুমাকে বলগে, তিনি ফের এমন কথা বললে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা!

টুকু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনেকটা উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া বলিল, শুধু একটি কথা ব'লে দাও কাকামণি - ডেড অব নাইট মানে কী?

—মানে, আমি পাগল হ'য়ে যাবো। তুই গেলি এখান থেকে? পিট্টি খাবার শখ হয়েছে—না?

আমি হাত তুলিবার ভঙ্গি করিতেই টুকু ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—তারপর একছুটে চম্পট দিল।

এতক্ষণে মনে পড়িল, পৃথিবীতে সিগারেট নামক একটা বস্তুর অস্তিত্ব আছে। তৎক্ষণাৎ মন খুশি -অর্থাৎ ও-অবস্থায় যতখানি খুশি হওয়া সম্ভব হইয়া উঠিল। শুইয়া-শুইয়া সিগারেট ধরাইতে গিয়া দেশলাইয়ের কাঠিটা ফশকাইয়া বুকের উপর পড়িল। উহুহু! ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কাঠিটা ফেলিয়া দিয়া পোড়া জায়গাটায় আঙুল বুলাইতেছি, এমন সময় বৌদি ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এখন বেরুবে, ঠাকুরপো?

—না।

—আমার এক বাক্স সাবানের ভয়ানক দরকার যে।

—তোমাকে সাবান কিনে এনে দেয়া ছাড়াও পৃথিবীতে আমার অনেক কাজ-কর্ম আছে।

—কাজের মধ্যে তো দেখি চিৎ হ'য়ে প'ড়ে থাকা, আর কর্মের মধ্যে চুরুট ফোঁকা।

—সে যা-ই হোক, আমি এখন কিছুতেই বেরুতে পারবো না।

—তা আমি আগেই জানতাম। রোদে পুড়ে বেলা বারোটা অবধি আড্ডা মেরে-বেড়াতে পারো—আর, কোনো কাজের কথা বললেই তোমাদের পা অচল হ'য়ে যায়।

—বৌদি, তুমি দয়া ক'রে আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি! বাবাঃ! এতই ঘেন্না! হবেই তো—এখন পালক গজিয়েছে কিনা! তবু যদি একবার হাতের চুড়ি বাঁধা রেখে পরীক্ষার ফী না জোগাতাম! হা ভগবান!

বৌদির অন্তর্ধানের পর দুই মিনিটও কাটে নাই, এমন সময় অন্ধকারমুখে মা-র প্রবেশ। গাঢ়স্বরে কহিলেন, তুই টুকুকে পড়া ব'লে দিসনি কেন রে?

—আমার মাথা ধরেছে, পেট কামড়াচ্ছে, অসুখ করেছে—শরীর ভালো নেই। না—শরীর ভালোই আছে, কিন্তু আমার ঢের কাজ। তুমি এখান থেকে যাও, মা।

—হুঁ, যাবোই তো, একদিন জন্মের মতোই যাবো—তখন খুব সুখে থাকিস। আমাকে দেখলেই যে কুকুরের মত দূর-দূর করিস—আমি আপদ বিদেয় হ'লেই তোরা বাঁচবি তো! একটু সবুর ক'রে থাক, তার বেশি দেরিও নেই। তোর স্বভাবটা দিন-দিনই রুক্ষ হ'য়ে যাচ্ছে—শরীরে এক ফোঁটা মায়াও নেই। ঐটুকু ছেলে—পড়া ব'লে না দিস তো না দিস—তুই ওকে মারলি কী ব'লে?

—কই, মারিনি তো।

—নাঃ—ও রসগোল্লা খেতে পেয়ে কেঁদেছে !

—সত্যি আমার ঢের কাজ—তুমি এখন একটু যা'ও, মা !

—যাচ্ছি রে যাচ্ছি, একেবারে যমের বাড়িই যাবো।

—শুধু তুমিই যাবে না মা, আমাদের সব্বাইকেই যেতে হবে।

মা আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে অশ্রুবিকৃত স্বরে বলিতে লাগিলেন, হ্যাঁ—এই তো সব নতুন-নতুন বিদ্যে হচ্ছে তোদের আমার যন্ত্রণায় তোদের পাগল হ'য়ে যেতে হবে—গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে ! আচ্ছা, আমার সামনে এই কথাগুলো বলতে মুখেও বাধলো না তোর ? আমি তোদের সৎ-মা কিনা—আমি তো আর তোদের পেটে ধরিনি তাই দিন-রাত তোদের যন্ত্রণা দিয়ে মারছি ! আজ যদি তোর বাবা বেঁচে থাকতেন রে, তাহ'লে কি আর তোরা এমন ক'রে আমার মনে কষ্ট দিতে পারতিস। মেয়েমানুষের সোয়ামি গেলে সবই যায় -ছেলেদের অপমান কুড়িয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। পুত্রের আবার বড়াই করে লোকে ! সেই একজনই যদি না থাকলেন, তবে ছার পুত্র, ছার পুত্র—

উচ্চৈঃস্বরে এই প্রকার বিলাপ করিতে-করিতে মা অন্তর্হিত হইলেন। ইচ্ছা হইল, মায়ের সঙ্গে গলা মিলাইয়া আমিও ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করি।

হাত-পা ছড়াইয়া মনে-মনে ভগবানকে স্মরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। যে-নীল আকাশ ও ঠাণ্ডা হাওয়া কিছুক্ষণ আগে ভালো লাগিয়াছিল, এইমাত্র তাহা বিষ হইয়া উঠিয়াছে, পৃথিবীতে কোনো জিনিশেই আর স্বাদ নাই, সুতরাং ঈশ্বরের শরণ লওয়া ছাড়া আর উপায় কী ?

কিন্তু এই মহৎ কার্যেও বাধা পড়িল। বৌদি ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া উত্তেজিত স্বরে ডাকিলেন, ঠাকুরপো।

ঘুমের ভাণ টি`কিল না ; ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম কী, বৌদি ? বাড়িতে আগুন লেগেছে নাকি ?

—কী যে ফাজলেমি করো সব সময়। এই নাও। বলিয়া একখানা টেলিগ্রাম আমার কোলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিলেন।

টেলিগ্রামখানা পড়িয়া বলিলাম, কী করতে হবে এখন ?

—কী আবার ? যাও, সুরেনবাবুকে এক্ষুনি একটা তার ক'রে দিয়ে এসো যে শেফালি কাল চ'লে গেছে, তাঁর ছুটি নিয়ে আসবার দরকার নেই।

—এত তাড়া কিসের ! বিকেলে ক'রে দিয়ে আসবো'খন। এখন আমার শরীর ভালো নেই।

—এত বয়েস হ'লো -এখনো তোমার কাণ্ডজ্ঞান হ'লো না ঠাকুরপো? বেচারা সুরেনবাবু না জানি কতই অস্থির হয়ে আছেন।

—অস্থির না হাতি! ভারি তো একটু জ্বর হয়েছিলো -

— সত্যি ঠাকুরপো—তোমরা আজকালকার ছেলেরা একেবারে হার্টলেস। উপযুক্ত ভাই বটে বোনের!

অর্থাৎ -আমার দিদি শেফালির এখানে অবস্থানকালে জ্বর হয়, এবং জামসেদ-পুরস্থিত ভগ্নীপতি সুরেন সে-সংবাদ অবগত হইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে টেলিগ্রাম করিয়াছেন, শী কেমন আছে, এবং তাঁহার আসার প্রয়োজন আছে কিনা। এদিকে শী-টি সংগতি পাইয়া অসুস্থ শরীরেই গতকল্য জামসেদপুর রওনা হইয়া গিয়াছেন - কলিকাতায় একদিন জিরাইয়া কাল সেখানে পৌঁছিবে। এমত-অবস্থায় সুরেনবাবুকে বিকালে তার-করার প্রস্তাব করিয়া আমি যে-হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছি, বৌদির কোমল প্রাণে তাহা মর্মান্তিক কষ্ট দিয়াছে! পৃথিবীতে যে-মনুষ্যযুগলেরা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে বিচরণ করে, তাহাদের সামান্যতম সুখ-সুবিধার জন্য অন্যান্য নর-নারীদের হাসিমুখে বহু ত্যাগ-স্বীকার করিতে হয়, ইহা আবাল্য জানিয়া আসিয়াছি; সুতরাং বিস্মিত হইবার কিছু ছিলো না।

আর প্রতিবাদ করিলাম না। জলে যখন ডুবিয়াছি, একেবারে গলা অবধি ডুবিব, এই ভয়াবহ শপথ করিয়া দারুণ রৌদ্রে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাগ করিয়া একটা ছাতাও নিলাম না। ঘর্মাক্ত দেহে পোস্টাপিশে পৌঁছিয়া একখানা টেলিগ্রাফ-ফর্ম লইয়া ফাউন্টেন পেন বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিতেই আমার শরীরের সমস্ত রক্ত জল হইয়া গেল। কী হইল ফাউন্টেন পেন? আমার স্পষ্ট মনে পড়িল, বাহির হইবার সময় কলমটি পকেটে লইয়াছিলাম। কী হইল? দেহের বাকি শক্তিটুকু একত্রিত করিয়া পকেটগুলি একবার খুঁজিলাম। নাই। নিশ্চয় চুরি গিয়াছে। পিকপকেট! কিন্তু এ-রাস্তায় তো বেশি লোক-চলাচল নাই। তাহা হইলে পড়িয়া গিয়াছে—হুঁ, পড়িয়াই গিয়াছে। একবার একটা ইটের উপর হোঁচট খাইয়াছিলাম—তখন, ঝাঁকুনি লাগিয়া। এবং পরের মুহূর্তেই -যে-চাপরাশিটা আমার পিছন-পিছন আসিতেছিল, সে সেটি তুলিয়া লইয়াছে। গেল -ভালো ওয়াটারম্যান —কতদিনে আবার কিনিতে পারিব, কে জানে। যদিই বা কিনতে পারি, তেমনটি আর হইবে না নিশ্চয়ই।

পোস্টাপিশের দেয়ালে মাথা ঠুকিবার প্রলোভন কী করিয়া যে সংবরণ করিলাম, জানি না। যন্ত্রচালিতের মতো আপিশের দোয়াত কলম দিয়া ফর্ম লিখিলাম, টিকিট

মারিলাম, ফেরৎ পয়সা ও রশিদ লইলাম। ফিরিবার সময় আগাগোড়া রাস্তার দিকে দৃষ্টি পাতিয়া রাখিলাম, যদি—হায়রে মানুষের দুরাশা! যে জায়গায় হোঁচট খাইয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়িল, সেখানে আসিয়া একটু এদিক-ওদিক ঘুরিলাম। একটা হিন্দুস্থানি ছোকরা বিড়ি টানিতে-টানিতে যাইতেছিল, সে একটু থামিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আমি পয়সা হারাইযাছি কিনা। আমি হাত নাড়িয়া তাহাকে যাইতে বলিয়া নিজের পথ ধরিলাম।

বৃথাই নিজেকে বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করিলাম যে কলমটি আমি সঙ্গে আনিই নাই। স্পষ্ট মনে পড়িল, আমি টেবিলের দেরাজ খুলিয়া কলমটি বাহির করিয়া নিচের পকেটে গুঁজিলাম—তারপর বৌদির হাত হইতে টাকা লইয়া বাহির হইলাম। টেলিগ্রাম করিতে যাইতেছি - কলম না-লইবার কোনো কারণ নাই।

যাক, আজিকার সকালবেলার একটা উপযুক্ত শেষ হইল বটে! বন্যাওলাদের কাহারও সঙ্গে এখন দেখা হইলে অনায়াসে খুন করিয়া ফেলিতে পারি।

চোরের মতো চুপি-চুপি ঘরে ঢুকিলাম। ছেলে মরিয়া যাওয়ার পরও মা তাহার নাকের কাছে মুখ নিয়া অনুভব করেন, নিশ্বাস পড়িতেছে কিনা। সেইরকম আমি ঘরে ঢুকিয়াই আস্তে টান দিয়া দেরাজ খুলিলাম।

ওয়াটারম্যানের নীল বাক্সটি দেখিয়া আমি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলাম। হায়রে, এ-বাক্সয় এতকাল যে বসবাস করিয়াছে, সে এই মুহূর্তে এক হীন চাপরাশির পকেট অলংকৃত করিতেছে। যেন শূন্য বাক্সটাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখাই আমার উদ্দেশ্য, নিজের কাছে এই ভাণ করিয়া বাক্সটা খুলিলাম। আমার ফাউন্টেন পেন অত্যন্ত শান্ত মুখে সেখানে বিশ্রাম করিতেছে।

* * * *

বৌদি আসিতেই বলিলাম, ইশ, এই রোদ্দুরে ঘুরে এসে মারা যাচ্ছি এখন।

—এসেছো টেলিগ্রাম ক'রে? বাস্তবিক, সুরেনবাবু কোনো খবর না-পাওয়া পর্যন্ত কী-যন্ত্রণায় যে সময় কাটাবেন, তা তুমি বুঝবে কী ক'রে? (বৌদি আমার অবিবাহিত অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করিয়া অনুকম্পার হাসি হাসিলেন) যাও এখন—চটপট স্নান ক'রে এসো গে -তোমার জন্যে ওয়েট করছি।

—দেখছো তো বৌদি, আকাশ কী ব্লু, আর বাতাসটা কী সুইট!

—পরে দেখা যাবে। আপাতত পেটে যে-ফায়ার জ্বলছে—

—বৌদি, তুমি কোন ক্লাশ অবধি পড়েছিলে?

পাশের ঘর হইতে মা বলিয়া উঠিলেন, যা না রে বাপু চান করতে। বৌটাকে

কতক্ষণ আর বসিয়ে রাখবি। চাকরবাকরগুলোও তো প্যানপ্যান ক'রে মাথার পোকা বার ক'রে ফেললো।

—যাচ্ছি, মা। বৌদি, টুকু ইস্কুলে গেছে?

—গেছে বইকি। কেন?

—এমনি। চমৎকার ছেলে তোমার টুকু। মা, আজ তোমাকে চশমার দোকানে নিয়ে যেতে পারি—যাবে?

—না রে, আজ সময় হবে না। আমাদের মহিলা-সমিতির মীটিং আছে।

স্নান করিতে-করিতে ভাবিলাম, after all, তিন টাকার একটা টিকিট রাখিয়া দিলেও পারিতাম। হাজার হোক, ভদ্রলোকের ছেলে আমার বাড়িতে আসিয়াছিলেন, বিমুখ করা কি উচিত হইয়াছে? নিজে না যাইতাম, বৌদি তো যাইতে পারিতেন—বৌদি আবার যে থিয়েটার খোর।

১৯২৮ 'রেখাচিত্র'

প্রথম ও শেষ

সোনারং পোঃ
(ঢাকা)
১৬ই বৈশাখ, বিকেল

নীলা,

এইমাত্র বেড়াতে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এসে গেলো বৃষ্টি। আমার জানলার পাশের পুরোনো পেঁপে গাছটার চিকরি-কাটা চিকন পাতাগুলি হাওয়ায় দুলে দুলে উল্টে যেতে লাগলো। প্রথমে হিরের কুচির মতো বড়ো স্বচ্ছ বৃষ্টির ফোঁটা—যেন কতদূর থেকে ছুটে আসতে-আসতে পেঁপে-গাছটার উপর মুখ থুবড়ে পড়লো ; পরে এলো জাক-জমক হাঁকডাকে পৃথিবীকে অস্থির ক'রে বৃষ্টির মিছিল, সবুজ পাতাগুলো জলের ঝাপটে কালো হ'য়ে এলো, বিকেলের প্রচুর আলো কোথায় গেলো মিলিয়ে,—আকাশ থেকে নদী পর্যন্ত মেঘের ধূসর ছায়া শীত-সন্ধ্যার কুয়াশার মতো ভারি ও ম্লান হ'য়ে নেমে এসেছে।

সুতরাং আমাদের বেড়াতে যাওয়া হ'লো না, সেই বেশেই আমার ঘরে ফিরে এসেছি। জানলার শার্সির কাচে বার-বার বৃষ্টির ঝাপট এসে আছড়ে পড়ছে, তার পিছনে আমাদের বিস্তৃত আম-বাগানের শ্যামল ঘনতা রঙ্গমঞ্চের কালো যবনিকার মতো চোখে লাগছে। ঘরের ভিতরে আলো কম ; জানলার কাছে একখানা চেয়ার নিয়ে এসে বসলাম। খানিকক্ষণ বই নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম, মন বসলো না। তারপর হঠাৎ মনে হ'লো আমার প্রিয়তমা নীলার কাছে যে-চিঠিটা রাত্তিরে লিখবো ভেবেছিলাম, সেটা এখনই লিখে ফেলি না কেন ?

সেই চিন্তার ফল যে কী হ'লো, তা তো তুই প্রত্যক্ষই করছিস। যদি এই বৃষ্টিটা না আসতো, তবে এতক্ষণ পদ্মার ধার দিয়ে সরু পথ ধ'রে হেঁটে বেড়াতাম—খালি পায়ে। এখানকার লোকেরা জুতো-পরা মেয়ে দেখলে আঁৎকে উঠবে ব'লে নয়—নরম মাটির উপর নরম পায়ের (আমার পা যে নরম, তা তোর মুখেই শুনেছি) চাপ দিয়ে-দিয়ে চলতে ভারি আরাম লাগে—তাই। এই চিঠি লিখতে অন্তত আরো দু'টি ঘণ্টা দেরি হ'তো এবং ইতিমধ্যে তোর কথা একটিবারও মনে পড়তো না। এই নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে ভাব করতেই সমস্ত সময় কেটে যেতো।

তুই শুনে হাসবি, কিন্তু এখানে আসতে-না-আসতেই আমি পাড়াগাঁর প্রেমে প'ড়ে

গেছি। সত্যি। এ-প্রেম যাতে ব্যর্থ না হয়, সে-জন্য আমি উঠে-প'ড়ে লেগে গেছি। একটি মুহূর্ত আমি অপব্যয় হ'তে দেবো না, এখানকার মাটিতে প্রথম পা দিয়ে আমি এই করেছি পণ।

পূর্বরাগ হয় তারও আগে। গোয়ালন্দ থেকে আমাদের স্টীমার যখন ছাড়লো তখন সূর্য উঠেছে, অথচ ভালো ক'রে রোদ ফোটেনি। গাড়ি থেকে নামবার সময় অসম্পূর্ণ ঘুমের অতৃপ্তিতে আমার মেজাজ খারাপ হ'য়ে ছিলো. কিন্তু স্টীমার খানিকক্ষণ চলতেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার চোখের ঘুম ও দেহের ক্লান্তি ধুয়ে গেলো। ডেকের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমি ম্লান জলের ওপর লাল আলোর ঝিকিমিকি দেখতে লাগলাম। তখনকার মতো যদি আমি ইন্দ্রের মতো সহস্রাক্ষ হতাম, তবু বোধহয় আমার আশ মিটতো না।

এক সময় বাবা এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর স্বাভাবিক মাধুর্যের সঙ্গে বললেন, 'কী গো, আমাদের চা খাওয়া-টাওয়া হবে না?'

আমি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'আচ্ছা বাবা, এ-ই পদ্মা নদী—রবীন্দ্রনাথের পদ্মা?'

'না, রবীন্দ্রনাথের পদ্মা ঠিক এ নয়। সে গেছে পাবনা জেলার ভিতর দিয়ে; নদী সেখানে সংকীর্ণ, স্রোত প্রখর নয়। আমরা যে-পথে যাচ্ছি, তাঁর বোট কখনো সে-পথে যাওয়া-আসা করেনি। এ-পদ্মা অলসগমনা, ভীরু স্রোতস্বিনী নয়, এ গভীর, গম্ভীর ও উদার—করুণা-বিতরণেও যেমন মুক্তহস্ত, অকল্যাণ-সাধনেও তেমনি অকুণ্ঠ। তোরই মতো। নদীর মধ্যে এ অভিজাত।'

'বাবা, নিজেকে এমন ক'রে প্রশংসা করতে তোমার লজ্জা করে না? আমি যে তোমারই মেয়ে।'

বাবা হাসলেন। 'এ-কথা বলাতেই তার পরিচয় পেলাম।'

চা খেতে ব'সে হঠাৎ আমার মনে এক উৎকট প্রশ্নের আবির্ভাব হ'লো। জিগেস করলুম, 'বাবা, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে চা কিনতে পাওয়া যায় তো?'

রুটিতে মাখন লাগাতে-লাগাতে বাবা বলতে লাগলেন, 'এক ইংরেজ মহিলার একবার ভারতবর্ষে আসবার কথা হয়। তিনি এখানকার এক বন্ধুকে চিঠিতে জিগেস করেন, "ক্যালকাটার পথে-ঘাটে কি দিনের বেলাতেও বাঘ ঘুরে বেড়ায়?"'

মা আমার পক্ষ নিয়ে বললেন, 'ওর আর দোষ কী বলো? জন্মেও তো পাড়া-গাঁ চোখে দেখেনি!'

বাবা বললেন, 'যেন তুমিই দেখেছো। মা-মেয়ে দুজনেরই গ্রাম-সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা,

তা তো শরৎবাবুর উপন্যাস থেকে নেয়া। তা ভালোই হ'লো। তোমাকে বিয়ে করেছি পর তো আর দেশে যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি - এবার তোমাকে সুদ্ধ দেখিয়ে আনা যাবে। তুমি তো মুসৌরির নামে খেপেছিলে, কিন্তু মুসৌরিতে পরেও যাওয়া যাবে— আর আসছে বছর বোধহয়, যেখানে আমাদের বাড়ি ছিলো, সেখানে থাকবে নদী, আর তার উপর দিয়ে চলবে স্টীমার। বাড়িটা আমাদের বহুকালের—তিরিশ বছর ওটা দেওয়ান-গোমস্তার হাতে প'ড়ে আছে, শেষ সময়ে আমাদের দেখে খুশিই হবে।'

মা জিগেস করলেন, 'কেমন বাড়ি?'

'কেমন? দেখতে সাবেকি, কিন্তু কাজে আশ্চর্য রকম আধুনিক। ঘরগুলো অত্যন্ত প্রশস্ত এবং উঁচু, অনেক জানলা আছে, আর সেগুলো বেশ চওড়া। উপরে ওঠবার সিঁড়ি কাঠের। এমনকি, মেয়েদের ও পুরুষদের আলাদা স্নানের ঘর আছে। অর্থাৎ, বাড়িটাকে চৌরঙ্গিতে তুলে আনতে পারলে রীতিমতো বাসযোগ্যই হয়। কাজেই, শ্রীমতী লীনা, তোমার সমস্ত আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক ব'লে জেনো। হ্যাঁ—বলতে ভুলেছি, সিঁড়ির পিছনে ছোট্ট একটা কুঠুরি আছে চোরা কুঠুরি। বাইরে থেকে যেটা জাপানি পরদার মতো দেখায়, সেটাই হচ্ছে দরজা—কৌশল না-জানলে কিছুতেই খোলার উপায় নেই। শুনেছি, আমার প্রপিতামহের আমলে সেখানে মোহর রাখা হ'তো, বাড়িটা তাঁরই করা। তিনি কলকাতায় এসে এক পাদ্রির কাছে ইংরেজি শেখেন। ফলে ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে তাঁর একটা বড়োরকম চাকরি জুটে যায়—মাসে সত্তর টাকা বুঝি মাইনে। দশ বছরে তিনি যা উপার্জন করেন, তা দিয়ে শুধু ঐ বাড়ি নয়, একটা প্রকাণ্ড এস্টেট গ'ড়ে তোলেন। চৌধুরীরা তখন ছিলো এ-মুল্লুকের সেরা জমিদার, সেই সময় থেকেই তাঁদের পতন শুরু হয়। ঠাকুরদার আমলে আমাদের প্রতিপত্তি আরো বাড়ে, চৌধুরীদের নবাবি জাঁক-জমকের অবশিষ্ট থাকে শুধু প্রকাণ্ড চকমিলানো বাড়িখানা। তখন পর্যন্ত দু' বাড়িতে যথেষ্ট রেষারেষি ছিলো—থাকারই কথা।'

যেন একটা গল্প শুনছিলাম, এইভাবে আমি ব'লে উঠলাম, 'তারপর?'

'তারপর বাবার আমলে সবই গেলো বদলে। বাবা ছিলেন ঠাকুরদার ছোটো ছেলে, পৈতৃক সম্পত্তির উপর বিশেষ ভরসা না-রেখে তিনি চ'লে গেলেন বিলেত— পাশ করলেন সিভিল সার্ভিস। ফিরে এসে দেখলেন, তাঁর অগ্রজ সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ ক'রে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। পরে জানা গেলো, তিনি হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব জানবার জন্য জর্মানিতে অবস্থান করছেন। তিনি বাডেন-বাডেন-এ মারা যান।

'অথচ বাবা বিদেশেই থাকতেন ব'লে গ্রামের বিষয়-আশয়ের অবস্থা ক্রমশই কাহিল

হ'তে লাগলো। তারপর তো পদ্মাই সব নিতে শুরু করলে। ফলে চৌধুরীদের সঙ্গে মনোমালিন্যটাও মুছে গেলো। সীতাপতি চৌধুরীর সঙ্গে বাবার যথেষ্ট বন্ধুতা ছিলো। তাঁকে আমি ছেলেবেলায় বারকয়েক দেখেছি। তিনি সমস্ত জীবন দেশেই কাটান, কিন্তু অমন প্রতিভাদীপ্ত কপাল ও চোখ আমি কোনো মানুষের দেখিনি। মিকায়েলেঞ্জেলোর মুখের অবর্ণনীয় কারুণ্য ও তেজস্বিতা ছিলো তাঁর চোখে। তিনি বাজাতেন বীণ—পুঁচকে সেতার বা এস্রাজ নয়—ও-সব তখনকার দিনে ছিলো না। অসংখ্য তারের উপর তাঁর আঙুলগুলো যখন ঢেউয়ের মতো অনায়াসে ভেসে বেড়াতো তখন বাবার কোল ঘেঁষে ব'সে মুগ্ধ হ'য়ে আমি তাকিয়ে থাকতাম। মনে হ'তো উনি যদি একবার ঐ আঙুলগুলো দিয়ে আমাকে স্পর্শ করেন, তাহ'লে আমি আগুনের মতো দাউদাউ ক'রে জ্বলে উঠবো।'

'উনি এখন খুব বুড়ো হয়েছেন—না ?'

'তখনও যুবক ছিলেন না, কিন্তু বার্ধক্যের আগেই তাঁকে ধরলো মৃত্যু। আমি তাঁর স্ত্রীকে দেখিনি, তাঁর একমাত্র সন্তান মেয়েই তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই মেয়ের কী হয়েছে জানি না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বাবা বললেন, 'সে যেন আর-এক জন্মের কথা ; তবু সীতাপতি চৌধুরীর কপাল আর চোখ আর আঙুল আজও মনে পড়ে।'

জানিস নীলা, এই সীতাপতি চৌধুরীকে দেখতে পাবো না ভেবে মনে মনে আমার ভারি অভিমান হ'লো—বাবা যেন আমাকে ফাঁকি দিয়ে মস্ত একটা লাভ ক'রে ফেলেছেন, সে-লাভের যোগ্যতা আমারও কম ছিলো না। অপুত্রক সীতাপতি চৌধুরীর রক্তের বংশ তো শেষ হ'য়েই গেছে, কিন্তু বর্তমান পৃথিবী থেকে তাঁর মনের বংশও যে লোপ পেয়ে গেলো, এই আমার দুঃখ। বাবার কথা শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছিলো, বালজাকের পাতা থেকে কোনো চরিত্র নেমে এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন—সাত-শো বছর ধ'রে তাঁর পূর্বপুরুষরা রাজত্ব করেছেন, প্রজাদের সঙ্গে নিছক প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ বজায় রেখে চলেছেন, বিয়ে করেছেন ইওরোপের শ্রেষ্ঠ রাজকন্যাদের—রূপে তাঁরা নিরুপমা। তারপর এলো মানুষের সভ্যতার প্রথম শত্রু—ফরাশি বিদ্রোহ। উন্মত্ত, বর্বর জনসংঘ গিলোটিনের নিচে—শুধু ষোড়শ লুইকে নয়, মানুষের শত শতাব্দীর দুরূহ সাধনা-লব্ধ সৌন্দর্য-চর্চাকে জবাই করলে। ওরা মাটির রাজত্ব কেড়ে নিলো, কিন্তু সাত-শো বছর ধ'রে আলোকে সংগীতে সৌন্দর্যে আনন্দে বিলাসিতায় যে-মন বেড়ে উঠেছে, তার প্রসার খর্ব করবে কে ? তাই সে-নায়ক গ্রহণ করলেন নির্বাসন ; রাজধানী থেকে বহুদূরে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে এক ধ্বংসোন্মুখ প্রাসাদ, সেইখানে আবদ্ধ হ'য়ে উৎসবের একটি

রাত্রির মতো কাটিয়ে দিলেন দীর্ঘ জীবন—মদের আর গানের নেশায়। সীতাপতি চৌধুরীর মনও সেই জাতের—বহুমূল্য বিদেশী ফুলের মতো কাচের ঘেরা-টোপ-দেয়া বাগানের ভিতর সেই মনকে অতি যত্নে লালন করতে হয়, তার স্পর্শ-অসহিষ্ণু সুকোমলতা তাকে পরমদুর্লভ করেছে। আজকালকার দিনে আর এমন মেয়ে নেই, ভাই, যে সত্যি-সত্যি ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়, এমন পুরুষ নেই যে দুই পদক্ষেপে স্বর্গ-মর্ত্য অধিকার ক'রে তৃতীয় পা ফেলবার জায়গা পায় না। রাশিয়া থেকে শিলাবৃষ্টির হাওয়া দিচ্ছে;—মহার্ঘ ক্রিসেনথিমম-এর দরকার নেই আর; আমরা সব গাঁদা ফুল ব'নে গেছি;—ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্মের যত উৎপাতই হোক, অনাবশ্যক প্রাচুর্যে আমরা গজিয়ে উঠবোই।

এতক্ষণে একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেছে;—বেহারা কখন এসে যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, টের পাইনি। ঘরের পক্ষে আলো যথেষ্ট নয়; দরজার কোণে, মখমলের ভারি পরদার আনাচে-কানাচে, হালকা-নীল রঙে ছোপানো দেয়ালের গায়ে-গায়ে ভূতের মতো অস্পষ্ট, অদ্ভুত সব ছায়ামূর্তি এই ঝাপসা হলদে আলোয় লুকোচুরি খেলছে। ঘরের সীলিং অনেক উঁচুতে—এই দুর্বল আলো সেখানে যেতে-যেতে হাঁপিয়ে পড়ে, সেখানে তাকালে মেঘ-মলিন আকাশেরই এক টুকরো দেখছি ব'লে ভুল হয়। ঘরের মধ্যে একমাত্র উজ্জ্বল জিনিশ হচ্ছে মেঝের গালিচাখানা—সূর্যাস্তের মতো ঘোলা লাল। রংচঙে খেলো বিলিতি কার্পেট নয়; পারস্যের বিখ্যাত গালিচা - পাথরের মতো ভারি, অথচ মাখনের মতো নরম। দিল্লির নবাবের বেগমরা তাঁদের পদ্মকলির মতো পায়ের পাতা এই সব জিনিশের উপর ফেলতেন। না - তার চেয়েও উজ্জ্বল জিনিশ আছে এ-ঘরে; সে আমি। আমি যেখানে ব'সে আছি, তার উল্টো দিকের দেয়ালে এক জোড়া দীর্ঘ আয়না;—লেখবার ফাঁকে-ফাঁকে নিজেকে তাদের একটির মধ্যে দেখে নিচ্ছি। এই ঘরের নিষ্প্রভ ম্লানতার মধ্যে আমাকে রোদের মুখে জ্বলে-ওঠা তলোয়ারের মতো স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে;—খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, আয়না যেন ফেটে পড়বে। এই মৃদু আবছায়ায় আবৃত হ'য়ে ঝাড়-লণ্ঠনের নিচে ব'সে এ-কথাই ভাবা সহজ যে আমি রাজকন্যা।

বাড়িটার বিশেষত্বই এই! এতে ঢুকলেই মনে হবে, চির-গোধূলির রাজ্যে প্রবেশ করলাম। দিনের বেলাতেও ঘরগুলো ছায়া-ঢাকা, রঙের ও রেখার কোমলতায় শান্ত ও শীতল। সেখানে রোদের আসতে বারণ; রাশি-রাশি পরদাকে ফাঁকি দেবার জো নেই, সূর্যদেব কোনো ফাঁক দিয়ে যদি চুপি-চুপি দু' একটি ক্ষীণ রেখা পাঠিয়ে দিতে পারেন তো ঢের। ফলে, কোনো মন্দির বা গির্জার অভ্যন্তরের মতো এই ঘরগুলোরও

আবহাওয়ায় এমন একটি অপূর্ব শুচিতা, আর মেজাজে এমন গাম্ভীর্য আছে যে কিছুকাল এখানে বসবাস করলে যে-কোনো লোকের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি কবি-তুল্য মার্জিত সূক্ষ্মতা লাভ করতে পারে।

বিরাট বনস্পতির মতো অটুট অক্ষয় ও মহান এই বাড়ি; দূর থেকে প্রথম দেখেই এর গাঢ় ধূসর রং আর বলশালী দৃঢ়তার সুন্দর রুক্ষতা আমার ভালো লেগেছিলো। এর চারদিকে যদি খাল থাকতো, আর তার উপর টানা-সেতু, আর সেই সেতুর উপর যদি সারাদিন অশ্বখুরধ্বনি শুনতে পেতাম তবেই যেন স্বাভাবিক হ'তো। এই অভাবটুকু আমাকে নিজের কল্পনা দিয়ে পূরণ ক'রে নিতে হচ্ছে; এবং সেই সঙ্গে আরো-একটা অভাব, সেই মানুষের অভাব, যাকে দেখে আমার সমস্ত মন প্রাণ এক-সঙ্গে কথা ক'য়ে উঠবে: 'সে যে আমি, সেই আমি।'

রবীন্দ্রনাথ একেবারে আমাদের মাথা খেয়েছেন - না রে? ইতি—

তোর লীনা

সোনারং,
২২ বৈশাখ

ছী-ছি, তুই নীলা, তুই? তোর মনে যদি এ-পাপই ছিলো তো আমাকে আগে বলিসনি কেন? আমার কাছে লুকোবার মতো দুর্মতিও তোর হ'লো!

কেন যে তুই আমার কাছে ব্যাপারটা আগাগোড়া গোপন ক'রে গেছিস, তা-ও আমি জানি। আমি যদি এর একটু আভাসও পেতাম, তবে এই দুর্গতির পাঁক থেকে তোকে ছিনিয়ে তুলে আনতামই, কোনো লজ্জা বা ভয় আমাকে আড়ষ্ট করতো না। তোর চিঠি পাবার আগের মুহূর্তেও কেউ যদি আমাকে এসে বলতো, 'নীলা বিয়ে করছে', আমি তার মুখের উপর হো-হো ক'রে হেসে উঠতাম। এত দেরি ক'রে জানালি! তার উপর, এখন কলকাতার বাইরে আছি, আমার অনুপস্থিতি তুই এমন হীন প্রয়োজনে ব্যবহার করবি জানলে তাহ'লে সোনারঙের সকল সৌন্দর্য আমি না-হয় উপভোগ না ক'রেই মরতাম, কিন্তু তোকে তো অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে আমাকে তুই কেমন ক'রে ফাঁকি দিলি! তোর মধ্যে কখনো এমন-কিছু তো লক্ষ্য করিনি, যাতে তোর সম্বন্ধে কোনো গুরুতর সন্দেহের উদয় হ'তে পারে! কিন্তু এতে আশ্চর্যই বা কী আছে? তুই করছিস ব্যবসাদারি বিয়ে; বেনেরা যেমন সাত-পাঁচ আগু-পিছু ডান-বাঁ ভেবে-চিন্তে, সাড়ে-উনিশ জনের

পরামর্শ নিয়ে চা-বাগানের শেয়ার না-কিনে রেঙ্গুন থেকে সেগুনকাঠের চালান আনিয়ে তিনগুণ লাভের আশায় ব'সে থাকে, তুইও তেমনি দীর্ঘকাল চিন্তার পর কিনা বিয়ে করাই স্থির করলি! কারণ বিয়ে করা নিরাপদ – জোলা বলেন, যুবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে নানা দিক থেকেই নিরাপদ। জীবনের উচ্ছল গঙ্গায় যৌবনের প্রবল বাতাসের মুখে কল্পনার রঙিন পাল তুলে দিয়ে আমরা দু'জন একসঙ্গে নাও ভাসিয়েছিলাম, তুই যে এত শিগগিরই ক্লান্ত হ'য়ে বন্দরের আশ্রয় খুঁজবি, তা ভাবিনি। এত তাড়াহুড়োর কারণ কী? পাছে আইবুড়ো মরতে হয়, এই ভয়? না, জোলা-উল্লিখিত অন্য কোনো কারণে তোর সবুর সইলো না?

তোকে এই কথা লিখতে ঘৃণায় আমার নিজেরই গা কাঁটা দিয়ে উঠছে। তোর সম্বন্ধে আমাকে এ-কথা ভাবতে হচ্ছে! তার আগে সারা পৃথিবী কেন রসাতলে তলিয়ে গেলো না?

মুরারিবাবুর আমি অসম্মান করছি না। তিনি সুদর্শন ও অমায়িক ;—তাঁর স্ত্রীত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তোর দৈহিক কোনো বিলাসিতারই হানি হবে না। কিন্তু তোর মন? তুই কি আমাকে শপথ ক'রে বলতে পারবি যে সেই ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসামাত্র বিদ্যুৎ-বিদারণের মতো অসহ্য আনন্দে তোর মনের আকাশ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিলো? তা-ই যদি হবে, তবে তোর মুখের দিকে তাকাতে আমার চোখ কি ঝলসে যেতো না? তাহ'লে সেই মুহূর্তে পৃথিবী তোর কাছে নতুন ক'রে জন্ম নিতো ; —প্রথম সূর্যোদয়ের অপূর্ব জ্যোতির্লেখা হ'তো তোর গাত্রবাস। নিজের চেয়ে যে-প্রেম বড়ো, তাকেও কি গোপন করা সম্ভব? তন্দ্রার জড়িমায় আচ্ছন্ন হ'য়ে মন্থর গতিতে দিনের পর দিন কেটে যায় সুখ-দুঃখের নির্দিষ্ট গণ্ডি এঁকে-এঁকে, লাভ-ক্ষতির হিশেব ক'রে-ক'রে। তারপর একদিন হয় প্রেমের আকস্মিক আবির্ভাব ; টুকরো-টুকরো শান্তি দিয়ে মনের যে-নীড় গড়েছিলাম, চোখের পলকে তা ছিঁড়ে উড়ে উনপঞ্চাশ বায়ুতে মিলিয়ে যায়, সমগ্র সত্তা সমুদ্র-মন্থনের মতো দুঃসহ বেদনার আলোড়নে জেগে ওঠে, আত্মায় আগুন ধ'রে যায়, তার দীপ্তি সর্বাঙ্গে উচ্ছলিত হ'য়ে ঝ'রে পড়ে ;—দান্তের মতো সকলকেই ব'লে উঠতে হয় : 'সেই দেবতার দেখা পেলাম, যিনি আমার চেয়ে বলশালী ; যিনি এসে আমার উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করবেন।'

সেই দেবতার দেখা তুই পাসনি ; সেই তীব্র দীপ্তিতে জ্ব'লে উঠতে তোকে দেখিনি। আমাকে ক্ষমা করিস, নীলা, কিন্তু তোদের এ-বিয়েকে আমি আশীর্বাদ করতে পারলাম না।

আর যা-ই করিস, দয়া ক'রে প্রত্যুত্তরে সংসারধর্ম সম্বন্ধে আমাকে সারগর্ভ উপদেশ

দিতে বসিস না। সেগুলো আমি জানি। এবং এ-ও মানি যে পাত্রবিশেষে তার সার্থকতা আছে। কিন্তু জানিস তো, সকলের জন্য সব কর্তব্য নয়। কিন্তু আমরা যেন আমাদের সাধ্যানুযায়ী মহত্তম কর্তব্যকেই অবলম্বন করি, বিধাতা আমাদের কাছে এ-ই আশা করেন। ধর, রবীন্দ্রনাথ যদি অধ্যাপক হতেন, খুব উচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপকই হতেন হয়তো বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ব'লে তাঁর নাম থেকে যেতো, কিন্তু পৃথিবীর পক্ষে সেটা কি খুব শুভ ঘটনা হ'তো? সংসারধর্ম যেমন, অধ্যাপনাও তো তেমনি একটা গুরুতর কর্তব্য। কিন্তু বিধাতা যাঁকে বড়ো কবি হবার উপকরণ দিয়ে পাঠালেন, তিনি যত ভালো অধ্যাপকই হোন না, কর্তব্য তাঁর সম্পন্ন হ'লো না; যতদিন তাঁর কবিত্বশক্তির পরিপূর্ণতম ব্যবহার না করছেন, ততদিন তাঁর জীবন ব্যর্থই র'য়ে গেলো।

তুই কি স্বপ্নেও ভেবেছিস, নীলা, যে বিধাতা তোর এ-আচরণ ক্ষমা করবেন? আমার সামনে এই কাগজের টুকরোর ম.তা স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাচ্ছি যে নিজ হাতে তুই তোর জীবনের সবচেয়ে বড়ো সর্বনাশ করলি। 'মাটি কাটি' যে-কোহিনুর লাভ করা যায়, তা দিয়ে কাগজ-চাপার কাজ দিব্যি চলে; কিন্তু কাগজ-চাপার ব্রতে কোহিনুর যদি তার জীবন উৎসর্গ করে তো তুই কি তাকে প্রশংসা করবি? তোকে দিয়ে বিবাহিত জীবনের সকল দায়িত্ব উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হ'তে পারে—তা আমি অস্বীকার করছি না; কিন্তু সাধারণ স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্বের চেয়ে অনেক বড়ো ও সুন্দর কর্তব্যের উপযুক্ত তুই;—তুই মহামূল্য বিরলজ্যোতি হীরকখণ্ড; কাগজ চাপাদের দলে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হ'লেও নিজেকে তুই অপমান বই কিছু করলি না।

দ্যাখ, কাঁশার গেলাশে অমৃত পান করা চলে না. তার জন্য চাই লক্ষ্যদ্যুতি স্বচ্ছগাত্র স্ফটিক-ভাণ্ড। তেমনি বড়ো প্রেম অনুভব করবার যোগ্যতা সকলের থাকে না; সে-সৌভাগ্য যাদের হবে, বিধাতা তাদের প্রকৃতিকে দুর্লভ ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ক'রে দেন; নিথর বায়ুমণ্ডলে অগ্নিময় পক্ষ-সঞ্চালন ক'রে তিনি যেখানে অবতরণ করবেন, সেই হৃদয়ের তাঁকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করবার মতো সৌন্দর্য ও প্রসার চাই তো—তা কি সকলের থাকে, ভাই? যাদের তা নেই, তাদের জীবনে কোনো সংঘাতেরও স্থান নেই; তারা বিয়ে করুক, ঘর-সংসার দেখুক. মোটর-চাপা পড়ার জন্য জীবসৃষ্টি করুক, তাদের জন্য কেউ যেন কোনো দুর্ভাবনা না করে। কিন্তু তুই যে আলাদা জাতের লোক; সেই মহান অতিথি হয়তো একদিন তোর দুয়ারে আসতেন, 'যিনি তোর চেয়ে বলশালী'। কেন তুই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করলি না?

তুই তো জানিস, সে-অতিথির পদক্ষেপে আমার হৃদয়াঙ্গন এখনো মুখর হ'য়ে ওঠেনি।

কিন্তু যেদিন থেকে বুঝতে শিখেছি, সেইদিন থেকে তাঁর আগমনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা ভিন্ন অন্য-কোনো কর্তব্য আমি জানিনি। তিনি যখন আমাতে অবতীর্ণ হবেন, কোনো দিক দিয়েই যেন হতাশ না হন, সেইজন্য আমাকে দেহে ও মনে, বাক্যে, বুদ্ধিতে ও আচরণে অপরূপ সুন্দর হওয়া দরকার। আমার সেই তপস্যায় তোকে পেয়েছিলাম সঙ্গী। তুই আমাকে মুগ্ধ করেছিলি; তারপর যেদিন তুই আমার হাতের উপর পায়রার বুকের মতো নরম তোর হাতখানা এনে রাখলি, ভাবলাম, দেবতা প্রসন্ন হলেন—আমার সাধনায় সিদ্ধির প্রথম সোপান-রূপে লাভ করলাম তোকে।

দুটি বটগাছের চারা পাশাপাশি রোপণ করলে তারা বেড়ে ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায় যেমন অবিচ্ছেদ্য কোলাকুলি হ'তে থাকে তেমনি এই ছ' বছর ধ'রে তুই আর আমি পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় জড়িত হ'য়ে বড়ো হ য়ে উঠেছি। আকাশে বাষ্পকণা আর সূর্যালোক দুই-ই তো থাকে, কিন্তু দুয়ের যখন মিলন হয়, তখনই দেখা দেয় ইন্দ্রধনু। তুই আর আমি মিলে সেই মনোহরণ ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করেছিলাম;—তারই অন্তরালে ছিলো আমাদের মনের সীমাহীন রাজত্ব—এক মুঠো নীল কাপড়ের মতো কূলহীন, ক্ষয়হীন, মৃত্যুহীন আকাশ।

আমাদের এই বন্ধুতাই কি এবারের এ-জন্মের মতো যথেষ্ট ছিলো না, নীলা? আমরা দু'জন না-হয় চিরন্তন নেপথ্যে জীবন কাটিয়ে দিতাম—না-হয় চলতো শুধু আয়োজন, শুধু সজ্জা - রঙ্গমঞ্চে নায়িকাদের আবির্ভাব না হয় না-ই হ'তো। যাকে আমরা বাস্তব বলি, সেখানে যদি শাদা খাতায় ধুলো জ'মে ওঠে তো উঠুক; আমাদের মনের যিনি কবি, তিনি তো নদীর জলে ভাঙা চাঁদের টুকরোর মতো শত-শত গীতি-কবিতার জাল বুনে যাচ্ছিলেন। সেই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার কী প্রয়োজন ছিলো তোর? হৃদয়ের রক্তে যাঁকে অনুভব করেছিস, একদিন তাঁকে প্রত্যক্ষ করবিই, এইটুকু আশা করবার সাহস তোর হ'লো না? আশা পরিপূর্ণ না-হ'লেই যে তা ব্যর্থ হ'য়ে যায়, এমন তো নয়। কেরোসিন লণ্ঠনের অতি সত্য বাস্তবের চাইতে সূর্যোদয়ের অন্তহীন প্রতীক্ষাই কি বরেণ্য নয়? সূর্য যদি কখনো দেখা না-ও দেন, তবু সেই ব্যর্থতা নেপোলিয়নের জীবনের ব্যর্থতার মতোই মহান। এই ব্যর্থতার মূল্য তুই দিতে পারবি না, এ আমি আশা করিনি।

কলকাতায় আমি যত ছেলের সঙ্গে মিশেছি, তাদের অনেকের চোখের দৃষ্টিই আমার কাছে অনেক অমুক্ত কাহিনী উদ্‌ঘাটন করেছে। রূপে ও বিদ্যায়, বংশ-গৌরবে ও পদমর্যাদায় তারা নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু আমার সব সময় মনে হয়েছে, কোথায় যেন কী অভাব র'য়ে গেছে, আমাকে দেখাবার জন্যে এরা একটি বিশেষ ভঙ্গি অর্জন করেছে;

সেই ভঙ্গিটিই মনোরম, আসল লোকটি নয়। এরা যাকেই বিয়ে করুক, বিয়ের পর সেই ভঙ্গিটি যাবে খ'সে, এবং তখন হরিমতির স্বামী আর তাদের মধ্যে বিশেষ-কোনো পার্থক্য থাকবে না।

তোর মতো আমি কোনো ভুল করবো না। স্বর্গে যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে, পৃথিবীতে তাঁর দেখা পাওয়ামাত্র আমি চিনে নিতে পারবো। এক-এক সময় ইচ্ছা করে, মাদমোআজেল মোপ্যাঁর মতো ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়ি--তাঁর অন্বেষণে। কিন্তু মন করে বারণ। ফুলের বুকে গন্ধের মতো যাঁর অনুভূতি সমস্ত অন্তরাত্মা জুড়ে আছে, বাইরে তাঁকে খুঁজবো কোথায়? শুভলগ্ন যেদিন আসবে দুয়ারে করাঘাত পড়বেই—বিজয়ী রাজার মতো এসে তিনি আমাকে অধিকার করবেন। আর, যদি তিনি না-ই আসেন—না-ই বা এলেন। তবু তাঁর প্রতীক্ষায় মুহূর্ত-জপ ক'রে আমরণ আমি জেগে ব'সে রইবো তুই দেখিস।

তোর পূর্বজন্মের বন্ধু—
লীনা

—নং বাঁডন্ স্ট্রীট
কলকাতা
১৮ই জ্যৈষ্ঠ

চির-প্রিয়তমা লীনা,

উপরের ঠিকানা দেখেই বুঝবি যে ইতিমধ্যে গোত্রের সঙ্গে-সঙ্গে আমার গৃহও বদল হ'য়ে গেছে। সেই জন্যই তোকে চিঠি লিখতে এত দেরি হ'লো। তামাশা মন্দ হ'লো না, কিন্তু তোকে নিমন্ত্রণ করলেও তো তুই আসতিস না।

প্রথমেই তোকে জানানো দরকার যে বিয়ে ক'রে আমি মোটেও অসুখী হইনি। আমি জানি, সুখের নামে তুই নাসিকা কুঞ্চিত করবি। তোর মতে ও-জিনিশটা পশুদের উপভোগ্য। কিন্তু সত্যি কি তা-ই? কল্পনার আগুনের মেঘ তোকে ঘিরে আছে ব'লে শান্তদীপালোকিত গৃহকোণের স্নিগ্ধ মাধুর্য তোর চোখেই পড়লো না? সেখানে উন্মাদনা না থাক, শান্তি তো আছে; উচ্ছ্বলতা না থাক, অস্বাস্থ্যও নেই। প্রতিদিনকার সুখদুঃখের অজস্র রেখা-সম্পাত এই গৃহকে বিচিত্র করেছে: স্বর্গের অনিন্দ্য জ্যোতি সেখানে পড়ে না, কিন্তু এই পৃথিবীরই ফসলের খেত থেকে, গোধূলির আকাশ থেকে

সোনার আলো সেখানে ঝ'রে পড়ে ;—অতসীর হাসির মতো তা চির-পরিচিত হ'লেও চির-সুন্দর।

বিয়ে করার জন্য কারো কাছে কোনো অপরাধ করেছি ব'লে যদি আমার মনে হ'য়ে থাকে, সে তোরই কাছে। কিন্তু আমি তো যেমন ছিলাম, তেমনিই আছি, তেমনিই থাকবো। পরিবর্তন যা-কিছু হয়েছে বা হবে, তা এত বাহ্যিক ও এত সামান্য যে সেই উপলক্ষ্যেই যদি তোর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হ'তে হয়, তবে স্বামী এক দিন গোঁফ কামিয়ে বাড়ি এলে স্ত্রীর উচিত তাঁকে চিনতে না-পারা। তুই যেটাকে প্রকাণ্ডতম সর্বনাশ ব'লে ভাবছিস, তার চেয়েও বড়ো সর্বনাশ আমার হ'তে পারতো· বসন্ত হ'য়ে আমার মুখ কুৎসিত হ'য়ে যেতে পারতো। কিন্তু সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে কি আমি তোর কাছ থেকে একটুও দূরে স'রে যেতাম ? এই ঘটনাটাকেই বা অত বেশি প্রাধান্য দিচ্ছিস কেন ? তোর বন্ধু এখনো তোর –সর্বান্তঃকরণে তোর, চিরকাল তোর।

তুই যদি আমার অবস্থাটা একটু পরিষ্কার ক'রে ভেবে দেখতিস, তবে তোর চিঠির উগ্রতা নিশ্চয়ই অনেক ক'মে আসতো। এ-কথা তুই ভুলে গিয়েছিলি যে তোর মতো মা-বাবার আশ্রয় আমার নেই ; পরিজন বলতে আমার এক মামা, তা তিনিই বা কতকাল আমার ভার বইবেন ? বি এ. পাশ করার পর আমার পক্ষে দুটি পথ খোলা ছিলো ইস্কুলটিচারি আর বিয়ে। দুই-ই সমান। জলের কুমিরকে এড়িয়ে ডাঙার বাঘের মুখেই যদি আত্ম-সমর্পণ ক'রে থাকি তো এমন কী অপরাধ করেছি, বল ?

অবশ্যি বিয়েটা তেমন-কিছু ভয়ংকর ব্যাপারও নয়। সত্যি ভাই, হাওয়ায় উড়তে-উড়তে আমার ডানা বুজে এসেছিলো ; একদিন সুদূরস্পর্শী ভবিষ্যতের বন্ধ্যা অনিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে ক্লান্তিতে আমার দুই চোখ আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো, ব্যাকুলভাবে হাত বাড়াতে গিয়ে প্রথম যাঁর হাতে হাত ঠেকলো, তিনিই মুরারিবাবু। ভাবলাম, মুরারিবাবু হ'লেই বা দোষ কী ?

এখন ভেবে দেখছি, মোটের উপর ভালোই করেছি। মুরারিবাবুকে ভালোবাসতে না পারি, তাঁর প্রতি মধুর মমতা জন্মেছে, এবং এই মমতাই হয়তো কোনোকালে আমাকে প্রেমের অমরাবতীতে পৌঁছিয়ে দেবে। তিনি আমাকে ভালোবাসতে না-পেরে থাকেন, অপরিসীম স্নেহ করেন, এবং মা-কে হারিয়েছি পর থেকে এই স্নেহ জিনিশটির উপর আমার লোভ সবচেয়ে বেশি। তা-ই পেয়ে আমি তৃপ্ত। সে-প্রেম আমাদের মধ্যে নেই, যাতে প্রিয়-পায়ের শব্দটুকু শুনলে বুক ঢিপঢিপ ক'রে ওঠে, তার একটুখানি হাতের লেখা দেখলে শরীরের সমস্ত রক্ত উঠে আসে মুখে। এখানে প্রবল অবেগ-ঝঞ্ঝার দুরন্ত মাতামাতি নেই ; এখানকার কুঞ্জ-কুটিরে মৃদু মমতার কোমল-মলয়-সমীরের

নিত্য-সঞ্চালন। মুরারিবাবু লোক ভালো; শিষ্টতায়, মিষ্ট আচরণে, বিনয়-বচনে তিনি বাস্তবিক ভদ্রলোক-আখ্যার উপযুক্ত। তাঁর প্রকৃতি কুয়োর জলের মতো; কালভেদে উষ্ণতা ও শৈত্য দুই-ই তার গুণ। চাকর-বাকরদের আদেশ করবার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরে রক্ষতা আসে না, এবং নাটুকেপনা না-ক'রেও তিনি স্নেহশীল হ'তে জানেন। এই ধরনের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলা খুব সহজ, স্বীয় ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র হানি না-ক'রেও তাঁর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া যায়। এইভাবে জীবন তো ব'য়ে চলুক;—স্বপ্ন যদি কিছু থেকে থাকে, সে তো আমার আছেই।

শুনে খুশি হবি, এ বাড়িতে একটা পিআনো আছে। মুরারিবাবু শুধু যে বাজাতে জানেন তা নয়, ইওরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও প্রখর। তাছাড়া, লাইব্রেরি-ঘরে ঢের বই আছে, তার বেশির ভাগই কবিতা। আর সেই বইগুলির পৃষ্ঠা ময়লা।

আমার সম্বন্ধে যা-কিছু জানাবার মতো, তা তোকে জানালাম। তোর এই এক মাসের সব খবর জানতে উৎসুক,

নীলা

সোনারং,
২৩শে জ্যৈষ্ঠ

নীলরানি,

সর্বগুণসম্পন্না বন্ধু আমার—দোষের মধ্যে শুধু এই যে তোর চিঠিগুলো বড্ড ছোটো হয়। এ-হিশেবে তুই একেবারে বৌদ্ধ; হিন্দুধর্মের চমৎকার আড়ম্বর, বর্ণ ও ধ্বনির অপূর্ব প্রাচুর্য তোর মধ্যে নেই; কথার ভিতর দিয়ে নিজেকে তুই যতটা প্রকাশ করিস, নীরবতার মধ্যে নিজেকে আড়াল করিস তার চেয়ে বেশি। মনে করিসনে যে তোর বিবাহিত জীবনের আরো বৃত্তান্ত জানতে আমার কৌতূহল হচ্ছে, কারণ সে বিষয়ে এমন-কিছু তুই বলতে পারবি না নিশ্চয়ই, যা আমি জানি না ভাবতে পারি না। আর যদি বা কিছু থাকে, তা তোর মুখেই শোনা যাবে; চিঠির মস্ত একটা অসুবিধে এই যে পত্রলেখক প্রতিটি কথার সঙ্গে-সঙ্গে তদনুযায়ী মুখভঙ্গি খামে পুরে পাঠাতে পারে না; কণ্ঠস্বরেরই ওঠা-নামা কম্পন-বিকৃতি ইত্যাদি আছে, হাতের লেখার ও-সব বালাই নেই। মুখের চেহারা, গলার স্বর ও বক্তব্য বিষয়—এই তিনে মিলে হয় গল্প বলা;

চিঠিতে গল্পটি আসে সেজেগুজে, ভদ্রলোক হ'য়ে, কিন্তু হারাই বলা-কে। প্রেমের কবিতা পড়া ও প্রেমে পড়ায় যেমন পার্থক্য, চিঠি ও মুখের কথাতেও তেমনি। তোর মুখামৃত পান করবার জন্য না-হয় একদিন তোর বীডন স্ট্রীট-এর বাড়িতেই যাওয়া যাবে—কী বলিস?

কারণ আমাদের শিগগিরই কলকাতায় ফিরে যাবার কথা হচ্ছে। পুজো অবধি এখানে থাকবার কথা ছিলো—বাবা বলেছিলেন, এই যখন শেষ, তখন দেখা-শোনা আলাপ-পরিচয় শুধু চোখ-কানের নয়, মনেরও হোক। কিন্তু ইতিমধ্যে খবর এলো যে এক মামলার তদ্বির করতে বাবাকে যেতে হবে বিলেত। মধ্য-প্রদেশের এক রাজার সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে; তাঁর ছেলে নেই; কাজেই সিংহাসনপ্রাপ্তি নিয়ে তাঁর অনুজ আর খুল্লতাতে ঘটেছে বিরোধ। ব্যাপার জটিল; পার্লামেণ্ট-এও এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এবং ইণ্ডিয়া অফিসের পরামর্শ নিতে অনুজের পক্ষ হ'য়ে বাবা জুলাইয়ের মাঝামাঝি পাড়ি দিচ্ছেন। তাই বড়ো জোর আর মাসখানেক আমরা এখানে আছি।

ঐ যাঃ—আসল খবর দিতেই ভুলে গেছি। বাবার সঙ্গে আমিও বিলেত যাচ্ছি। বাবা নিজে থেকেই বলেছেন। দিন তিন-চার আগে এক সকালবেলায় তিনি এসে আমার ঘরে উপস্থিত। বিশেষ-কোনো কাজের কথা না-থাকলে সকালবেলা তিনি বাড়ির কারু সঙ্গে দেখা করেন না; তাই জিগেস করলাম, 'কী খবর, বাবা?'

প্রত্যুত্তরে বাবা তাঁর আসন্ন বিলেত-যাত্রার কথা বললেন। এই সংবাদের সঙ্গে আমার কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবিষ্কার করতে না-পেরে আমি বলবার জন্য কথা খুঁজছি, এমন সময় তিনিই আবার বললেন, 'তুইও চল না আমার সঙ্গে।'

তখন এ-ই ভেবেই আমার আশ্চর্য লাগলো যে এ-কথা আমার মনে আগে কেন উদয় হয়নি। বললাম, 'বেশ তো।'

বাবা একটা নিচু কাউচ এর মাঝখানে বসলেন। আমি তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিগেস করলাম, 'আমি যাবো? কেন?'

'প্রধানত বেড়াতে। গৌণত আমার সঙ্গী হ'য়ে। যে-উপলক্ষ্যে যাচ্ছি, তাতে কাজ অল্প, অবসরই প্রচুর। তাছাড়া, যাওয়া-আসার দেড় মাস একেবারে ফাঁকা। এবং সে-বয়েস এখন আর আমার নেই, যাতে নতুন লোকের সঙ্গে চট ক'রে আলাপ ক'রে নেয়া যায়। সে-প্রবৃত্তিও নেই। কাজেই তোকে নিতে চাচ্ছি। মাস তিনেকের ব্যাপার;—এ-ক'টা দিন তোর মা কলকাতায় বা হায়দ্রাবাদে তাঁর ভাইয়ের কাছে থাকতে পারেন—যেমন তাঁর খুশি। আমার অভিপ্রায় এইটুকুই; তোর যদি আরো কিছু থাকে, আমাকে জানাতে পারিস।'

'আমার যাওয়াই যদি ঠিক হ'লো, তবে মাস তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসতে হবে, এমন-কোনো প্রয়োজন বা আকর্ষণ তো আমার দেশে নেই।'

বাবা হেসে বললেন, 'আচ্ছা বেশ, অক্সফোর্ডে তাহ'লে তোর ভর্তির ব্যবস্থা করি। সময়টাও ঠিক পড়েছে। না প্যারিস?'

'বাবা, তুমি আমার মনের কথা কী ক'রে হুবহু বুঝতে পারো, বলো তো? আমি যে অক্সফোর্ডের কথাই ভাবছিলাম।'

এমন সময় গোলাপি এলো আমার কোকোর পেয়ালা নিয়ে। জিগেস করলাম, 'এক পেয়ালা খাবে, বাবা?'

'আনতে বল।'

কোকো খেতে খেতে বাবার সঙ্গে অনেক বিষয়েই আলাপ হ'লো। বহুকাল কথা ব'লে ও শুনে অমন সুখ পাইনি। অমন প্রাণ-খোলা সরল, অথচ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার কথা বাবার মুখেও কম শুনেছি। তিনি আমাকে যা বললেন, তার সারসংকলন করলে মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায়:

'দেখতে তো পাচ্ছিস, মনুষ্যজাতি ক্রমেই অবনতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তার কারণ শুধু এই যে মানুষে-মানুষে প্রভেদ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। রাজা ও প্রজায় আসমান-জমিন ফারাক আর নেই, সমাজপতিদের দিন গেছে, সমাজ-চালনায় আজকাল সবারই সমান দাবি। গৃহেও তেমনি পিতা তার অবিসংবদিত কর্তৃত্ব হারিয়েছে। একজন বাদশাহকে ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্যের অধিকারী করবার জন্য জন-গণ আর পশুতুল্য জীবন যাপন করতে রাজি নয়;—সবাই মোটামুটি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে, বতমান যুগের এই লক্ষ্য। ফলে হয়েছে কী, উৎকৃষ্ট ব'লে কোনো জিনিশ আর থাকছে না— সবই মাঝারি। আশি টাকা তোলার আতর আজকালকার বাজারে বিকোয় না, কারণ তা কেনবার মতো সংগতি কারুরই নেই; ন' আনা দামের এসেন্সের খুব চল - যা রানি থেকে কেরানি পর্যন্ত সবাই কিনতে পারে।

'এই উৎকর্ষের অভাব দেখবি সবখানেই; পাঁচ টাকা দিয়ে বই কিনে দু' দিন ব'সে বিরাট উপন্যাস পড়বার সময় ও সামর্থ্য নেই কারো; আট আনা পয়সা খরচ ক'রে দু'ঘণ্টায় সেই বইখানা ফিল্মে দেখে আসবে। এমন দিন হয়তো আসবে, যখন কেউ আর বই লিখবে না; জনমণ্ডলীর শিক্ষা ও আমোদের ভার ন্যস্ত হবে ফিল্ম-ওলাদের উপর; তাঁরা অবিশ্রান্ত খেলো রসিকতা আর শস্তা ন্যাকামির পসরা বহন ক'রে জনগণের সঘন করতালি লাভ করবেন। কবিতা পৃথিবী থেকে উঠে যাবে, কারণ সবাই তা পড়ে না, গান আর ছবি একেবারে লুপ্ত হবে, কারণ ও-সব বোঝবার মতো

কান বা চোখ যাঁদের আছে, তাঁদের সংখ্যা হাজারে একও নয়। সেই বৈচিত্র্যহীন জগতে মানুষের স্থূলতম প্রবৃত্তিগুলি ছাড়া সব যাবে ম'রে; ফলে সব মানুষই একরকম হ'য়ে যাবে—অর্থাৎ, মানুষে আর কলে খুব বেশি তফাৎ থাকবে না।

'সুলভতার এই নব্য-তন্ত্রে আমাদের কোনো স্থান নেই—তোর আর আমার। আশা করি নিজের সম্বন্ধে তুই সম্পূর্ণ সচেতন। তোর রক্তের মধ্যে যে-শ্রেষ্ঠতার বীজ আছে, এবং এতদিনকার শিক্ষা ও অনুশীলন যার বিকাশের সহায়তা করেছে, আশা করি তুই তার অমর্যাদা করবি না। আত্ম-সমর্পণের একটা প্রবল মোহ আছে—সেটাও সুলভ—তোর পক্ষে তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারা উচিত। বিশেষত আমাদের দেশে এ-ভয় খুব বেশি। আমরা পরাধীন ও সেন্টিমেণ্টাল জাত; একটু-কিছু হ'লেই "জয় মা" ব'লে বন্যায় গা ঢেলে দিতে পারলেই আমরা খুশি। তুই আর আমি ও-সব ক্ষণিকের উত্তেজনার উপরে; জীবনে ও আচরণে, বুদ্ধিতে ও চিন্তায় আমরা মহার্ঘ সৌন্দর্যের উপাসক; বাংলা দেশ আমাদের মনের মাতৃভূমি নয়, এবং দৈবাৎ আমরা দু' শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ ক'রে ফেলেছি।'

বাবার কথা শেষ পর্যন্ত শুনে আমি বললাম, 'বৃথাই আমাকে এত কথা বললে, বাবা। বিয়ের চিন্তা এখনো আমার মন থেকে ঢের দূরে। এবং যদি কখনো সে-চিন্তার উদয় হয় তো যথাসময়ে তোমাকে তা জ্ঞাপন করতে ভুলবো না।'

'সে আমি জানতাম। কিন্তু তুই যখন বিলেতে পড়তে যাওয়া ঠিক করলি, তখন তোকে এ সব কথা না-ব'লেও পারলাম না।—বুঝলি তো?'

'বুঝেছি বইকি। কিন্তু আজকাল যে বাঙালি ছেলেরাও মেম বিয়ে ক'রে আসে না' বাবা।'

বাবা শুধু বললেন, 'বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার!'

কাজেই দেখতে পাচ্ছিস, জুলাইয়ের মাঝামাঝি আমরা দেশ ছাড়ছি, তাই মাস-খানেকের মধ্যেই কলকাতায় ফেরা দরকার। জাহাজে ওঠবার আগে তোর সঙ্গে অল্প কয়েক দিনের জন্যে দেখা হবে, এবং সেই ক'টি দিনের দিকে আমি উৎসুক হৃদয়ে তাকিয়ে আছি। তিন-চার বছরের মতো তোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে এবার ফিরে এসে তোর একেবারে গৃহলক্ষ্মীরূপ না দেখি, তাহ'লেই বাঁচি। এ-ক'টা বছর আমি আর যা-ই করি, হৃদয়বৃত্তি চর্চা করবার অবকাশ পাবো না—যদি অবশ্যি কোনো ইংরেজ ছোকরার প্রেমে না-প'ড়ে যাই।

ঠিক ঐ কাজটিই যেন আমি না করি, বাবা সেদিন স্পষ্ট ক'রে তো এ-কথাই ব'লে গেলেন। আমার মনের কথা যদি জিগেস করিস তো বলতে পারি, সে-ভয় আদৌ

নেই'। তিনি সর্বক্ষণ আমার কাছে-কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তবু তাঁকে দেখতে পাই না কেন? আমরা দু'জন অন্ধকার রাত্রিতে মশাল হাতে নিয়ে অসংখ্য নর-নারীর মধ্যে পরস্পরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি;—কতবার হয়-তো পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছি, অন্ধকারে চিনতে পারিনি। কিন্তু যে-মুহূর্তে মশালের আলোকে তাঁর মুখ তারার মতো জ্ব'লে উঠবে, অমনি সব সংশয় দূর হবে, সকল অন্বেষণের হবে পরিসমাপ্তি।

বাবা আমার ঘর থেকে চ'লে যাওয়ার পর সেদিন অনেকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে ছিলাম, হঠাৎ কী মনে হ'লো জানিস? মনে হ'লো আর দেরি নেই সে-শুভ মুহূর্ত সমাগতপ্রায়, আমার এই বিলেত যাত্রার প্রস্তাবনা যেন তারই দূত রূপে এসেছে। এই যে আমি তিন-চার বছরের মতো তাঁকে পাবার সম্ভাবনা অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছি এত বিলম্ব কি তিনি সইবেন? কলম্বসের সেই অকস্মাৎ-আবির্ভূত বিহঙ্গ-শ্রেণীর মতো আমার এই প্রবাস-যাত্রার সংকল্প যেন পরম-আকাঙ্ক্ষিত উপকূলের নিকট-বর্তিতা নির্দেশ করছে; নিজের তপোবলে তাঁকে আবিষ্কার করবার আনন্দ আমাকে দান করবেন ব'লেই সেই স্বয়ম্প্রকাশ আত্ম-গোপন ক'রে আছেন।

এখানকার এই নির্জনতায় নিজেকে বড়ো বেশি প্রাধান্য না-দিয়ে উপায় নেই। এখানে আমিই আমার একমাত্র সঙ্গী। নিজের মনের এই-সব চঞ্চলতা নিয়ে বিলাস করতে-করতে সন্দেহ হয় যে আমি এদের প্রতি যতটা মূল্য আরোপ করছি, সে-মূল্য অন্য লোকেও দিতে প্রস্তুত কিনা। কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে; আমার মনের এই অস্পষ্টতম গতি-বিধিগুলো তুই-ই একা বুঝতে পারতিস। নিজের উপর বিশ্বাস যখন টলমল ক'রে উঠছে, তখন তোর চোখের প্রশান্ত নির্মলতার দিকে তাকিয়ে হয়তো আশ্বাস পেতাম। আকাশ আর পদ্মা নদীকে নিয়ে দিন কাটাতে-কাটাতে মন আমার হাঁপিয়ে উঠেছে।

এ-কথা লিখতেই মনে পড়লো যে কাল বেশ মজার একটা ব্যাপার হ'য়ে গেছে। সকাল থেকেই হাওয়ার তাড়া খেয়ে আকাশে মেঘগুলো ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছিলো; দুপুরটি ছিলো ছায়া-ঢাকা, স্নিগ্ধ। বৃষ্টি নেই, অথচ বাতাস বেশ জোরে বইছে। ধূসর আকাশ আর সজল বায়ুতে মিলে মনের উপর যে-একটি কোমল আবেশের সঞ্চার করে, তা কাটিয়ে ওঠবার জন্য আমি টমাস ব্রাউনের 'রিলিগিয়ো মেডিচি' পড়তে বসলাম। কিন্তু প্রথম কয়েক লাইন পড়ার পর মন ও চোখ দুই-ই ক্লান্ত হ'য়ে এলো। দূর ছাই—বরং বাইরে থেকে খানিকক্ষণ ঘুরে আসি। আমাদের বড়ো দিঘিটার জল মেঘের ছায়ায় কালো হ'য়ে নিশ্চয়ই কূলে-কূলে টলমল ক'রে উঠছে!—বইখানা হাতে ক'রেই বেরিয়ে পড়লাম।

দিঘিটা আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তিনটে বড়ো-বড়ো আঙিনা পেরিয়ে সুবৃহৎ দুর্গা-মণ্ডপ—বহুকালের অব্যবহারে ম্লান। তারপর কয়েক ঘর মালি-বাড়ি—আমাদেরই রায়ৎ ওরা। সেই বাড়িগুলো পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা;—বিকেলে মালির ছেলেরা ওখানে হা-ডু-ডু খেলে। তারপর দিঘি—মস্ত দিঘি, ওপারে পানের বরজ একটা,—এপারে বাঁধানো ঘাট। সারা গ্রামের পানীয় জল এই দিঘি থেকে সরবরাহ হয়। ঐ ঘাটে দাঁড়িয়ে পদ্মার রুপোলি ঝিকিমিকি চোখে পড়ে। লোকে বলে, মাটির তলা দিয়ে পদ্মার সঙ্গে এই দিঘির গোপন যোগাযোগ আছে, তাই এর জল অত মিষ্টি।

সকাল-সন্ধ্যায় এই দিঘিতে লোক-চলাচলের অভাব হয় না; কিন্তু এই ভর-দুপুরবেলা চারদিক শূন্যতায় ঝাঁ-ঝাঁ করছে; এত নীরব যে চড়ুই পাখিদের ডানার ঝাপটানিও শুনতে পাওয়া যায়। বাঁধানো ঘাটের নিচের দিকটার একটা সিঁড়িতে ব'সে আমি হাতের বইখানা খুললাম।

হাওয়ার দাপটে দিঘির জল ছোটো-ছোটো ঢেউ তুলে আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছিলো; তাদের ছলছলানি শুনতে-শুনতে কি আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলাম, না আমার মন বইয়েরই মধ্যে ডুবে গিয়েছিলো, তা এখন বলতে পারবো না। কিন্তু হঠাৎ জলের মধ্যে ভয়ানক একটা তোলপাড়ের শব্দ শুনে আমি চমকে উঠলাম। তাকিয়ে যা দেখলাম তা এই:

আমি যেখানে ব'সে ছিলাম, তার একটু দূরে একটা হিজল গাছ সবুজ একটি ডাল বাড়িয়ে দিয়ে দিঘির জল স্পর্শ করতে উদ্যত হয়েছে;—মাঝে-মাঝে দু'একটা শুকনো পাতা টুপটাপ ক'রে খ'সে পড়ছে। সেই গাছের আড়ালে লুকিয়ে একটা লোক ব'সে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে—এতক্ষণে আমার চোখে পড়লো। এইমাত্র বোধ হয় বেশ বড়োরকমের একটা মাছ টোপ গিলেছে। এদিকে লোকটা প্রায় মাটিতে শুয়ে প'ড়ে মাছটাকে ডাঙায় তুলে আনবার চেষ্টা করছে: ওদিকে আবার মাছটাও এই মর্মান্তিক বন্ধন থেকে ছাড়া পাবার জন্য নিদারুণ ছটফটানি শুরু ক'রে দিয়েছে। তারই ফলে ঐ তোলপাড়।

আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, ততক্ষণে আমাদের মৎস্যশিকারীর হয়েছে জয়; মস্ত একটা রুই ডাঙায় প'ড়ে হাঁপাচ্ছে এবং লোকটা উবু হ'য়ে তার মুখ থেকে বঁড়শির টোপটা খসাচ্ছে। মুহূর্তে আমার অধিকার-বৃত্তি সজাগ হ'য়ে উঠলো; লোকটার কাছে এগিয়ে এসে আমি রুক্ষ স্বরে বললাম, 'এই, তুমি এ-দিঘি থেকে মাছ ধরছো যে বড়ো? জানো—'

কিন্তু সে-মুহূর্তে লোকটা আমার দিকে মুখ ফেরালো, এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমি চুপ ক'রে যেতে বাধ্য হলাম। আশ্চর্যরকম বড়ো ও পরিষ্কার দুই চোখ মেলে সে একবার তাকালো—সে-দৃষ্টিতে তিরস্কারের তীব্রতা ও করুণাভিক্ষার নম্রতা দুই-ই দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর চোখ নত ক'রে মৃদু মেঘ-গর্জনের মত গম্ভীর-কোমল স্বরে সে বললে, 'আমার মতো দুর্ভাগাকে অপমান করা আপনাকে সাজে না।' 'আপনাকে' কথাটির উপর জোর দিয়ে বললে।

আমি একটু অপ্রস্তুতই হলাম। লোকটা ততক্ষণে ছিপটা সম্পূর্ণ খসিয়ে নিয়ে আবার বললে, 'এ-দিঘি আপনাদের, এ-মাছের উপরেও আপনারই অধিকার। আপনার যদি দরকার থাকে তো বলুন, নইলে মাছটাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দি।'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'তার মানে?'

'মাছ আমি খাই না।'

জিগেস না-ক'রে পারলাম না, 'তবে—তবে ধরেন কেন?'

'এমনি। সময় কাটাতে।—আপনি তাহ'লে চান না মাছটা?' ব'লে তিনি সেটাকে পা দিয়ে আস্তে একটু ঠেলে দিলেন। অর্ধ-মৃত রুই গড়াতে-গড়াতে জলে গিয়ে পড়লো। মাছটা পাড়ের কাছে অগভীর জলে খানিকক্ষণ ছটফট ক'রে তলাকার সমস্ত কাদা উপরে পাঠিয়ে দিলো; তারপর যেই একবার গভীর জলের আশ্রয় পেলো, অমনি সব গেলো শান্ত হ'য়ে।

ভদ্রলোকের আচরণে ও কথাবার্তায় আমি ক্রমাগতই আশ্চর্য হচ্ছিলাম, কিন্তু সব চেয়ে বড়ো বিস্ময় পেলাম তখন, যখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পুরুষ জাতকে যদি সুন্দর ও কুৎসিত এই দুই দলে বিভক্ত করতে হয়, তবে তাঁকে কুৎসিত না-ব'লে উপায় নেই। কিন্তু তিনি খর্বাকৃতি হ'লেও ক্ষুদ্রদেহ নন। প্রশস্ত বলিষ্ঠ কাঁধের উপর সিংহের মতো প্রকাণ্ড, তেজ-ব্যঞ্জক মাথা; দীর্ঘ বাহুর কঠিন সরলতায় পৌরুষের রুক্ষতা, কিন্তু হাত দু'খানা নারীসুলভ, মুখের চেয়ে তাদের রং ফর্শা। পরিচ্ছন্ন নখগুলিতে রক্ত যেন ফেটে পড়ছে।

সিংহের মতো সেই মাথায় শিশুর মতো স্বচ্ছ ও করুণ চোখ। আমার দিকে একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে নতমস্তকে যেন আমার কথা বলার অপেক্ষা করতে লাগলেন। বললাম, 'এক মাসের উপরে আমি এখানে আছি, কিন্তু আপনাকে কখনো দেখেছি ব'লে তো মনে পড়ছে না।'

'আমার এ-অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জনা করবেন, কারণ আমি কাল মাত্র এখানে এসেছি।'

কথাটা আমার কানে ব্যঙ্গের মতো শোনালো। হেসে বললাম, 'আপনার স্পর্ধা আছে। আমার কথাটা অভিযোগ নয়।'

ভেবেছিলাম, আমার এ-কথা শুনে ভদ্রলোক চ'টে যাবেন, কিন্তু চটা দূরে থাক, তিনি তাঁর স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠস্বর আরো নামিয়ে বলতে লাগলেন, 'কাল এখানে এসেই শুনলাম, আপনারা এসেছেন। আপনারা সমাজের শীর্ষতুল্য; আমার উচিত ছিলো কালই এসে আমার অভিবাদন জানিয়ে যাওয়া, কিন্তু তিন দিন ট্রেনে স্টীমারে কাটিয়ে আমি পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম। আমার এই আপাত-অবহেলার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।' ব'লে ঈষন্নত মস্তক তিনি আরো অবনত করলেন।

মুখের এই অতিরিক্ত বিনয়ের অন্তরালে মনের যে-অসম্ভব অহংকার প্রচ্ছন্ন ছিলো, তা আমার আত্ম-সম্মানে ঘা দিলো। অসহিষ্ণুভাবে ব'লে উঠলাম, 'তার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিলো না।'

ব'লেই দ্রুত পদক্ষেপে সেখান থেকে চ'লে আসছিলাম, কিন্তু অল্প একটু যেতেই সেই ভদ্রলোক এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। না-থেমে বললাম, 'বলুন।'

চলতে-চলতে তিনি বললেন, 'অপরাধ গ্রহণ করবেন না, কিন্তু আপনার হাতের বইখানা যদি একদিনের জন্য আমাকে ধার দেন, তবে কাল আর আমাকে আপনাদের দিঘিতে অনধিকার চর্চা করতে আসতে হয় না।'

তাচ্ছিল্যভবে বললাম, 'কিন্তু ও তো গল্পের বই নয়।'

ভদ্রলোক উৎফুল্লস্বরে বললেন, 'না, তা হয় না। কিন্তু গল্পের মতো সুখপাঠ্য ও কবিতার মতো ছন্দোময়। আপনার হাতে যে-বইখানা দেখছি, তার চেয়ে তাঁর "Urn Burial" আরো চমৎকার।'

হঠাৎ থেমে গেলাম। তারপর ফিরে তাঁর মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াতেই তাঁর মুখের এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। এইমাত্র যা উৎসাহে ও বুদ্ধির তীব্রতায় উজ্জ্বল ছিলো, আমার দৃষ্টি তার উপর পড়তেই লজ্জায় ও আশঙ্কায় তা মলিন হ'য়ে এলো। বললাম, 'এই নিন।'

বইখানা নেবার জন্য তিনি যে-হাতখানা বাড়ালেন, তার আঙুলের ডগাগুলো একটু-একটু কাঁপছিলো। বইখানা তাঁর হাতে দিয়ে আমি আমার মধুরতম হাসি হেসে বললাম. 'আচ্ছা, নমস্কার।' ব'লে দু'হাত একত্র ক'রে কপালে ঠেকালাম।

প্রতিনমস্কার ক'রে তিনি বললেন, 'আমার সৌভাগ্য!' কিন্তু ও-দু'টি কথা তিনি যে-গাম্ভীর্যের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন তাতে আমার মনে হ'লো তিনি ধ্বনিবহুল সংস্কৃত ভাষায় বললেন, 'কৃতার্থোঽহং দেবি!'

বাড়ি ফিরে এসে মনে হ'লো যে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অনেক জরুরি কথাই জানা হয়নি। নাম জিগেস করাটা অবশ্যি আধুনিক আদব কায়দার অনুযায়ী নয়;—কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই এ-গ্রামের লোক, নইলে আমাদের সম্বন্ধে অমন সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলবেন কেন? আর অত জানবেনই বা কী ক'রে? ওদিকে আবার তিন দিন ট্রেনে-স্টীমারে কাটিয়ে এলেন; –অত দূরে কোন দেশ? বম্বাই? পণ্ডিচেরি? রেঙ্গুন? অত দূর দেশে কী করেন তিনি? শ্রীঅরবিন্দর শিষ্য বা সব্যসাচীর পকেটসংস্করণ নন তো? এদিকে টমাস ব্রাউনও পড়া আছে! আধুনিক যুগের কোনো সাহিত্য-সম্রাট হ'লে একটুও আশ্চর্য হতাম না, কিন্তু এই সেকেলে লেখকের অদ্ভুত ভাষা ও তার চেয়েও অদ্ভুত চিন্তার রসোপভোগ করতে পারে এমন লোকও আজকালকার দিনে আছে?

আসল কথা এই যে এই মৎস্য-শিকারীর সম্বন্ধে আমি বিষম কৌতূহল অনুভব করছি। তাঁর বাড়ি কোন দিকে, জিগেস করতে ভুল হ'য়ে গেছে; আশা করছি, শিগগিরই একদিন এসে তিনি বইখানা ফেরৎ দিয়ে যাবেন।

তুই তো মানব-চরিত্রের একজন মস্ত বড়ো সমজদার; – আমার চিঠি প'ড়ে এই ভদ্রলোকের একটা চরিত্র-চিত্রণ লিখে পাঠা দেখি? যদি সুযোগ হয়, আসলটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখবো। ইতি

তোর লীনা

সোনারং,
২২শে জ্যৈষ্ঠ

নীলা,

বইখানা দিতে তিনি নিজে আসেননি; আজ সকালে একজন ভৃত্যের হাতে সেখানা ফেরৎ পাঠিয়েছেন। অন্যমনস্কভাবে বইখানা একবার খুলতেই তার মধ্যে আবিষ্কার করলাম ডাকঘরের ছাপ-আঁকা খালি একটা খাম—উপরে নাম লেখা 'শ্রীবিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়'—এবং ঠিকানা কলম্বোর। খামখানা বোধ হয় পেজ-মার্ক হিশেবে ব্যবহার করা হয়েছিলো, তারপর আর স্থানান্তরিত করতে মনে ছিলো না।

কোনো অপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে তার নাম ধাম বিবরণ জানবার প্রথা আমাদের দেশে আছে। প্রথম দুটি দৈবাৎ জানতে পেরে তৃতীয়টি জানবার জন্য আমার কৌতূহল আরো বেড়েই গেলো। কলম্বোটা অবশ্যি দুর্বোধ্য নয় –অন্ন-অন্বেষণে আজকাল মানুষ কোথায় না যেতে পারে? কিন্তু তাঁর ঐ নাম—মধুসূদনের কোনো পংক্তির অংশ-বিশেষের মতো গুরুগম্ভীর তাঁর ঐ নাম আমাকে চঞ্চল ক'রে তুললো।

মনে হ'লো, ও-নাম যেন আমার অচেনা নয়; এককালে যেন ঐ নামের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিলো, এখন তা ভুলে' গেছি। অথচ, ও-নামের কাউকে কখনে চিনতাম কিনা, না কারো মুখে শুনেছি বা কোনো বইয়ে পড়েছি—হাজার চেষ্টা ক'রেও মনে করতে পারলাম না। জানিস তো আমাদের স্মরণশক্তি কী অদ্ভুতরকম খামখেয়ালি; সাধারণ অবস্থায় তার মধ্যে সামান্য একটু শ্লথতা খুঁজে পাবিনে; দশ বছর আগেকার কোনো ঘটনাও অনায়াসে বিবৃত ক'রে যাওয়া যায়; কিন্তু যদি কেউ হঠাৎ 'নির্নিমেষ' বানান-জিগেস ক'রে বসে, বা 'Sorrows of Satan'-এর লেখিকার নাম জানতে চায়—তাহ'লেই হয় মুশকিল। আর যেহেতু বিদ্যাপতি নামের ইতিহাস জানতে আমার মন উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে, সেইজন্যই সুযোগ বুঝে আমার স্মৃতিশক্তি ফাঁকি দিতে শুরু করলেন, এবং দুপুর পর্যন্ত আমি অসহ্য যন্ত্রণায় কাটালাম। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঐ নামের বৈষ্ণব কবির কথাও আমার একটিবার মনে পড়লো না। কিন্তু তার পরেই আমার প্রশ্নের উত্তর মিললো। আমার তখনকার বিস্ময়টা তুই সহজেই অনুমান করতে পারবি, দুপুরে খেতে ব'সে বাবা যখন বললেন:

'লীনা, পরশু বড়ো দিঘির ধারে যাঁর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিলো, তিনি সীতাপতি চৌধুরীর দৌহিত্র।'

এতক্ষণ যে-নামরহস্য আমাকে পীড়া দিচ্ছিলো, বাবার কথা শোনা মাত্র তা জলের মতো পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। মনের দরজায় কোথায় যেন একটা খিল প'ড়ে গিয়েছিলো, তা চট ক'রে খুলে গেলো—এবং সঙ্গে-সঙ্গে এখানে আসবার দিন স্টীমারে বাবার মুখে যে-সব কথা শুনেছিলাম, তারা হৈ-চৈ ক'রে ফিরে আসতে লাগলো। 'সীতাপতি' নামের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যই যে ঐ ভদ্রলোকের নাম আমার চেনা-চেনা ঠেকছিলো, তা এতক্ষণে বুঝলাম।

'কী ক'রে জানলে, বাবা? মানে, আমার সঙ্গে যে দেখা হয়েছিলো, সে-খবর?'

'তাঁরই মুখে শুনলাম। আজ সকালবেলা ডাকঘরে দেখা। আমি চিনতে পারিনি উনিই প্রথমে নমস্কার ক'রে বললেন, "ভালো আছেন।"

' "তা আছি। কিন্তু আপনাকে তো—"

'"আমাকে চিনতে পারছেন না? পারবার কথাও নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার দু'বার দেখা হয়েছে।"

'আপাদমস্তক তাঁকে নিরীক্ষণ করলাম। আশা করেছিলাম, মুখের কোনো রেখায় বা দেহের কোনো ভঙ্গিতে বহুদিনের বিস্মৃত কোনো ক্ষণিক পরিচয়ের আলো জ্ব'লে

উঠবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হ'তে হ'লো। ভদ্রলোক আমার অকৃতকার্যতা লক্ষ্য ক'রে বললেন :

' "আপনার লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই, কেননা, প্রথমবার দেখা হয় মাদুরা রেলোয়ে স্টেশনে—নিশাকালে। আপনি যে-গাড়ি থেকে নামছিলেন, আমি সেই গাড়িতে উঠছিলাম। দ্বিতীয়বার আপনাকে দেখি কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরিতে—রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হচ্ছিলো।"

'আমি হেসে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি বলতে লাগলেন, "আর পরশু দিন আপনার কন্যার সঙ্গে—হ্যাঁ, একরকম পরিচয়ই হয়েছে।"

'আমি কিছুই বুঝতে না-পেরে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তখন তিনি তাঁর মাছ ধরা থেকে বই ধার নেয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন।

'আদ্যোপান্ত শুনে আমি বললাম, "সত্যি? কিন্তু লীনার দোষ কী, বলুন? ও তো আপনাকে চেনে না! ঐ দেখুন—আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে আমিও ভুলে গেছি।"

'পোস্টমাস্টারবাবু এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন; এইবার তিনি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখ থেকেই আমি বিদ্যাপতিবাবুর পরিচয় শুনলাম।

'বিস্মিত হ'তে হ'লো। কিন্তু পরমুহূর্তে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো যে তাঁর মুখের উপর সীতাপতি চৌধুরীর সেই আশ্চর্য চোখ দুটি আমি প্রথম দেখেই কেন চিনতে পারিনি? বাল্যকালে আমার কল্পনায় যিনি শুধু ঈশ্বরের চেয়ে ছোটো ছিলেন, সেই সীতাপতি চৌধুরীর একমাত্র রক্ত-সম্পর্কিত উত্তরাধিকারীকে দেখলাম—মনে হ'লো এ যেন আমার কত বড়ো সৌভাগ্য।'

এইখানে বাধা দিয়ে আমি জিগেস করলাম, 'তখন আমার হ'য়ে তুমি ক্ষমা চাইলে তো?'

বাবা হেসে বললেন, 'ও-সব লৌকিকতার কোনো প্রয়োজন তাঁর কাছে ছিলো না। তাঁকে বললাম, "আপনাকে দেখে আমার মন আজ আনন্দিত হ'য়ে উঠছে, কারণ আপনার সঙ্গে এমন-একজনের স্মৃতি বিজড়িত, যিনি আমার সমগ্র জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন।" '

'ঐ কেতাবি ভাষায় তুমি কথা কইলে বাবা?'

'বক্তব্য বিষয়টা যখন বইয়ে লেখবার মতো হয়, তখন ভাষাটাও সেই অনুসারে তৈরি হ'য়ে ওঠে বইকি।'

'তারপর ?'

'তারপর আমরা দু'জনে ডাকঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। অনেক আলাপ হ'লো। সাংসারিক ব্যাপারে সীতাপতি চৌধুরীর ঔদাসীন্য সবচেয়ে মারাত্মক হয় তাঁর মেয়ের পক্ষে। একমাত্র মেয়ের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশত তিনি তাঁর বিয়ে দিতেই ভুলে' যান। পিতার মৃত্যুর পর এই চতুর্বিংশতিবর্ষীয়া কন্যা আবিষ্কার করলেন যে পৃথিবীতে এখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়।

এইখানে মা ব'লে উঠলেন, 'কী সর্বনাশ !'

'কিন্তু সৌভাগ্যবশত সীতাপতি চৌধুরী তাঁর সঙ্গীত-দক্ষতা মেয়েকে দিয়ে গিয়েছিলেন ; ফলে তিনি কলকাতায় এক গানের ইশকুলে—'

মা বললেন, 'কিন্তু দেশের বিষয়-সম্পত্তি ?'

'জানোই তো, তোমার শ্বশুরের পূর্বপুরুষদের কল্যাণে তার নামমাত্র অস্তিত্ব ছিলো। তাছাড়া, শুধু অর্থ হ'লেই মেয়েদের চলে না। তদ্ব্যতীত যা প্রয়োজন, তা তাঁর ভাগ্যাকাশে অনতিবিলম্বেই উদিত হ'লো।'

জিগেস করলাম, 'কে সেই ভাগ্যবান ?'

'এক দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট সাহিত্যিক। বিয়ে ক'রে তাঁর অর্থকষ্ট ঘুচলো। কিন্তু সে-সুখ তাঁর কপালে বেশিদিন সইলো না। বছর তিনেক পর তিনি মারা গেলেন। বিদ্যাপতি বাঁডুয্যে তখন এক বছরের শিশু।'

মা রুদ্ধস্বরে ব'লে উঠলেন, 'তারপর কী হ'লো ?'

'হবে আবার কী ? সেই সাহিত্যিকজায়া যে কত কষ্ট ক'রে ছেলেটিকে মানুষ ক'রে তুলতে লাগলেন, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বিদ্যাপতিবাবু ও-প্রসঙ্গ যেন এড়িয়ে গেলেন মনে হ'লো—সম্প্রতি তাঁর মাতৃ-বিয়োগও হয়েছে কিনা। মা র অবশ্যি যথেষ্ট বয়েস হয়েছিলো, কিন্তু বিদ্যাপতিবাবু বোধহয় এই অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনাকে এখন পর্যন্ত ক্ষমা ক'রে উঠতে পারছেন না।'

মা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'কী যে বলো ! আর-কেউ নেই যার—'

'হ্যাঁ, সত্যি। একান্ত স্বজনহীনতা যে কত বড়ো দুর্ভাগ্য, তা আমাদের বুঝতে পারার কথা নয়।'

'তা এই বিদ্যাপতিবাবু কী করছেন এখন ?' মা শুধোলেন।

'কলম্বোর এক বৌদ্ধ মিশনারি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়ান ও মাঝে-মাঝে ছুটি পেলে এইখেনে আসেন। জানো তো, আমাদের জন্যই আজ তাঁর এই দুরবস্থা। তাঁর কথা শুনতে-শুনতে আমি লজ্জিত হ'য়ে উঠছিলাম ; আমার পূর্বপুরুষ আমার

ঘাড়ে যত অন্যায়ের ঋণ চাপিয়ে গেছেন—মনে হচ্ছিলো, তা যেন আমার শোধ করা উচিত।'

মা হাসতে-হাসতে বললেন, 'সে-উদ্দেশ্যে কী করলে তুমি?'

চলতে-চলতে যখন আমাদের দু'জনের দুদিকে যাবার সময় হ'লো, আমি একটু থেমে বললাম, "যদ্দিন এখানে আছি, আপনার সঙ্গলাভের আশা নিশ্চয়ই করতে পারি?"

'তিনি অল্প একটু হেসে বললেন, "আপনাদের যদি তা-ই অভিরুচি হয়, আমার আমার কোনো মতান্তর নেই, জানবেন।"

'ফলে আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি। আজ রাত্তিরে।'

আমি ব'লে উঠলাম, 'আজই?'

'হ্যাঁ, আজই। তোর মত জিগেস করবার সময় ছিলো না, কিন্তু তোর কোনো আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?'

'না, না—আপত্তি কিসের?' সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, বিদ্যাপতিবাবু ঐ কথাটা অমন ক'রে বললেন কেন? 'আপনাদের যদি তা-ই অভিরুচি হয়, আমার কোনো মতান্তর নেই, জানবেন।' 'আপনাদের' কেন? আর, 'আমার কোনো মতান্তর নেই, জানবেন'—এ-কথার মানে তো শুধু সম্মতি নয়, বরং সাধারণ ভাষায় তর্জমা করলে তা অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়: 'যা অনিবার্য, তার সঙ্গে সংগ্রাম করা চলে না; বিনা দ্বিধায় তার হাতে আত্ম-সমর্পণ করা ভিন্ন উপায় নেই।'

সে যা-ই হোক, আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বিদ্যাপতিবাবু স্বয়ং আবির্ভূত হবেন, আপাতত এই আশা করা যাচ্ছে। এবং এইমাত্র খেয়াল হ'লো যে এখনো আমার সাজসজ্জা বাকি। সুতরাং—যদিও তোকে আরো অনেক কথা বলবার ছিলো—আজকের মতো এইখানেই ইতি।

তোর লীনা

—নং বীডন স্ট্রীট
২৩শে জ্যৈষ্ঠ

লীনা,

আজই তোকে চিঠি লিখতাম না, কিন্তু পর-পর তোর দু'খানা দীর্ঘ চিঠি পেয়ে তোর সম্বন্ধে আমি এতদূর উৎকণ্ঠিত হয়েছি যে বিস্তর কাজের মধ্যেও তোকে দু'চার কথা লেখবার সময় ক'রে নিতে হচ্ছে।

আমি তোকে সাবধান ক'রে দিতে চাই, লীনা—তোর ঐ নব-পরিচিত বিত্থাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে। তোর চিঠি দু'খানা প'ড়ে তাঁকে আমি যেমন চিনেছি, আমি তাঁর আজন্ম-পরিচিত হ'লেও তার চেয়ে ভালো চিনতাম না। যে-দুর্ভাগ্য তাঁর মা-কে ক্ষমায়, নম্রতায়, সহনশীলতায় মধুর ক'রে তুলেছিলো, সেই দুর্ভাগ্যই তাঁকে হিংস্র, স্বার্থপর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ ক'রে তুলেছে। এটা অবশ্যি তাঁর অপরাধ নয়; নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যই এখানে। দৈব দোষে বিত্থাপতিবাবু যে-সব দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন বা পাচ্ছেন, সেগুলো মেনে নেবার মতো উদারতা বা কাটিয়ে ওঠার মতো শক্তি তাঁর নেই; খাঁচায় অবরুদ্ধ চিতাবাঘের মতো তিনি ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছেন, আর ভাবছেন, অন্য কাউকে অসুখী করতে পারলে বুঝি তাঁরও শান্তি হবে। তাঁর যে-প্রচণ্ড অহংকারের ফলে তাঁর মুখের প্রায় প্রত্যেকটি কথা বিদ্রূপের মতো শোনায়, সেটাই তাঁর চরিত্রের কলঙ্ক, কারণ অতখানি অহংকারের যোগ্যতা তাঁর নেই। এবং তিনি তা জানেন। জানেন ব'লেই প্রকাণ্ড অভিমানের ভাণ ক'রে লোকচক্ষে সেই অভাব তিনি পূরণ করতে চান। যেটা অহংকার ব'লে মনে হয়, আসলে সেটা তাঁর ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।

এ-কথা অবশ্যি ঠিক যে প্রথম দর্শনে এই ধরনের লোকের মস্ত একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, এবং বিপদ সেই কারণেই ঘোরতর। শোনা যায়, বায়রনকে প্রথম দেখে ইংলণ্ডের সুন্দরীবৃন্দ সবাই মনে-মনে ব'লে উঠতেন, 'That pale face is my fate'। তুই কি অস্বীকার করতে পারবি যে এ-ক'দিন ধ'রে তেমনি একটা চিন্তা তোর মনে আনাগোনা করছে? কিন্তু ঐ কথাটা বাংলায় বলতে গেলে কী হয়, জানিস—'ঐ মুখই আমার কাল হবে।' কারণ সেই মহিলাদের পক্ষে বায়রন যে কালই হতেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ কী? বায়রনের জাতের লোকেরা উগ্র, দয়াহীন, বেপরোয়া—এঁরা না-করতে পারেন, এমন কাজ নেই। তাই তাঁদের সংশ্রব বর্জনীয়। সাপের মতো এঁরা আকর্ষণ করেন—তার ফল হয় মর্মান্তিক। বিত্থাপতিবাবু ঐ শ্রেণীর মানুষ; প্রতিকূল অদৃষ্ট ও নির্বান্ধবতা তাঁকে রুক্ষতর করেছে। আমার মনে হয়—মনে হয় কেন, নিশ্চয়ই—তিনি এরই মধ্যে তোর উপর অনেকখানি মোহ বিস্তার করেছেন; কিন্তু তোর মনের স্বাভাবিক মোহবিমুখতা ও বুদ্ধির অত্যুজ্জ্বল তীক্ষ্ণতা শেষ পর্যন্ত তোকে রক্ষা করবেই, এই বিশ্বাসে নির্ভরশীল, তবু তোর জন্য উদ্বিগ্ন ও তোর চির-কল্যাণকামী বন্ধু,

নীলা

সোনারং
২৫শে জ্যৈষ্ঠ

প্রাণাধিক নীলা,

তোর সংক্ষিপ্ত - অর্থাৎ সম্যকরূপে ক্ষিপ্ত—চিঠিখানা পেয়ে আমি কিন্তু মোটেও বিচলিত হইনি। তোর কল্যাণ-কামনার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমার দিক থেকে এটুকু বলতে পারি যে বিপদ এখনো ততটা ঘনিয়ে আসেনি। সুতরাং তোর মহামূল্য উৎকণ্ঠার বাজে খরচ করতে নিষেধ করছি। জমিয়ে রেখে দে—কোনোকালে কাজে লাগতে পারে।

অথচ ইচ্ছে করলে তোর কথারও যে উত্তর না দিতে পারি, এমন নয়। প্রথমেই একটা পুরোনো নীতিবাক্য উচ্চারণ করতে হচ্ছে। সে হচ্ছে এই যে শয়তানকে (এবং বায়রনকে) যত কালো ক'রে আঁকা হয়, তত কালো সে নয়। তুই যদি বলিস যে ও-কথা বলার কোনো মানে হয় না, তাহ'লে আমি বলতে বাধ্য হবো যে বিদ্যাপতি-বাবুর সঙ্গে ঐ দুই মহাপুরুষের চরিত্রগত কোনো সাদৃশ্যই নেই। ডন জুয়ান বা মেফিস্টোফিলিস-এর অংশ নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি। উপন্যাসের নায়কের যে-কয়েকটি বড়ো-বড়ো ছাঁচ আমাদের চোখের সামনে আছে, তার কোনোটির সঙ্গেই তাঁর মেলে না। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের চোখ-ঝলসানো প্রখর দীপ্তি বা কবি রামচন্দ্রের মর্মস্পর্শী কারুণ্যের মধুরতা—কোনোটিই তাঁর নেই। তাঁর মধ্যে সে-মদিরতার অভাব, যাতে তাঁকে দেখামাত্র মনের নেশা ধ'রে যেতে পারে।

তারপর অহংকার। বিদ্যাপতিবাবু অহংকারী বটে, কিন্তু কে বলবে সে-অহংকারের যোগ্যতা তাঁর নেই? মানুষের মর্যাদা নির্ধারণের সত্য উপায়—যা হয়েছে নয়, যা হ'তে পারতো। তিনি দরিদ্র, এ হচ্ছে সাংসারিক তথ্য, কিন্তু কথাটা সত্য হচ্ছে এই যে দারিদ্র্য তাঁকে মানায় না। সেইজন্যই তাঁর মন বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে যায়। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে নিষ্ফল অভিযোগ করতে তিনি অভ্যস্ত নন, কিন্তু তার প্রতিকূলতাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে মনের জন্মগত উদারতাকে খর্ব করতে তিনি নারাজ। স্বভাব যাঁকে বড়ো করেছে, তাঁর জাত মারবে কে?

এই আত্ম-শ্লাঘা যদি তাঁর সর্বস্ব হ'তো, তাহ'লেও তোর ব্যাখ্যা মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি ছিলো না। উগ্র লাল রঙের গোলাপ দৃষ্টিকে পীড়া দিতো, যদি না তার আশে-পাশে থাকতো পত্রগুচ্ছের শ্যামলিমা। তেমনি একটি স্বভাবজাত বিনয়ের কোমলতা তাঁর গর্বকে সুদৃশ্য করেছে। এবং ঐ দুটি জিনিশ তাঁর মধ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখবার উপায় নেই। ইলেকট্রিকের

কোন তারে নেগেটিভ আর কোন তারে পজিটিভ শক্তি যাতায়াত করছে জানি না, কিন্তু এটুকু নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে দুয়ের সম্মিলনেই পরম বাঞ্ছিত আলোর উৎপত্তি।

বলাই বাহুল্য, ইতিমধ্যে বিদ্যাপতিবাবুর সঙ্গে আরো দেখা হয়েছে, এবং আমার কাছে তিনি যেমন মনে হয়েছেন, তার সঙ্গে মিলিয়ে তোর বর্ণনা পড়েছি। যে-সব অসামঞ্জস্য চোখে পড়লো, তা তোকে জানালাম।

সে-রাত্রে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করতে তিনি এসেছিলেন - আসবেন না-ই বা কেন? আহারান্তে নিচের হল-ঘরটিতে আমরা সমবেত হলাম। বাবা আমার সেতারটার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন, 'আপনাকে এর চেয়ে উচ্চশ্রেণীর কোনো যন্ত্র দিতে পারছি না ব'লে ক্ষমা করবেন।'

বিদ্যাপতিবাবু তাঁর অভ্যাসমতো একবার বাবার মুখে তাকিয়ে, তারপর নিজের প্রসারিত করতলে দৃষ্টি সংবদ্ধ ক'রে বললেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আমি বাজাতে জানিনে।'

বাবা বললেন, 'একেবারেই না? আশ্চর্য!'

'হ্যাঁ, আশ্চর্যই। আমার মাতামহ তাঁর কন্যাকে যে-অদ্ভুত শক্তির অধিকারিণী ক'রে যান, তা তাঁর—অর্থাৎ সেই কন্যার—সঙ্গে-সঙ্গেই লুপ্ত হ'লো। সেই প্রতিভার উত্তরাধিকারী হবার মতো সৌভাগ্য নিয়ে তাঁর পুত্রের জন্ম হয়নি।'

বাবা বললেন, 'সত্যি! আপনার মা-র কথা আমার স্মরণ হয় না, কিন্তু চৌধুরী মশায়ের আত্ম-বিস্মৃত মুখের লাবণ্যচ্ছটা আর কারো মুখে দেখবো না ভাবলে দুঃখ হয়।'

মা জিগেস করলেন, 'কিন্তু আপনি গান গাইতে পারেন নিশ্চয়ই? গায়কদের মতোই তো মার্জিত ও মসৃণ আপনার কণ্ঠস্বর।'

বিদ্যাপতিবাবু আবার দৃষ্টি আনত ক'রে বললেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আমার সম্বন্ধে আপনার এই অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

তারপর তাঁর সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি বাবাকে, মা-কে পরিভ্রমণ ক'রে অবশেষে আমার উপর এসে স্থির হ'লো। আমার দিকেই তাকিয়ে বলতে লাগলেন:

'দেখুন, প্রতিভাসম্পন্ন হবার প্রচুর সম্ভাবনা আমার ছিলো; কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যের ফলে সব গেলো ব্যর্থ হ'য়ে। পিতৃগণের পুণ্যফলের কিছুই আমাতে এসে বর্তালো না। আমার বাবা ছিলেন লেখক;—কেমন লিখতেন, সে-বিষয়ে আলোচনা করা আমাকে মানায় না, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের অনেক উপরে তিনি তাঁর সাহিত্যকে

স্থান দিয়েছিলেন, এ-কথা সগর্বে বলতে পারি। আমার এক কাকা ছিলেন—তাঁকে আমি কখনো দেখিনি। সতেরো বছর বয়সে তিনি পালিয়ে প্যারিসে চ'লে যান—ছবি আঁকা শিখতে। কালে চিত্রকর ও ভাস্কর হিশেবে ও-দেশে সুনাম অর্জন করতে তিনি সক্ষম হন। বছর দুই পূর্বে তাঁর মৃত্যু হ'লে প্যারিসে যে-শোকসভা আহূত হয়, তার সভাপতি ছিলেন রোদ্যাঁ।

'আমারও গীতি-কুশল, কবি বা চিত্রকর হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু হ'তে পারিনি ব'লেই আমার হয়েছে মুশকিল। তাঁদের কাছ থেকে আমি তদুপযোগী প্রাণশক্তি ও কল্পনাশক্তি পেয়েছি, কিন্তু পাইনি প্রকাশের ক্ষমতা। প্রতিভাশালী স্রষ্টাদের জ্যোতির্মণ্ডল বেষ্টন ক'রে যে-সব অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ ও নিকৃষ্ট লোক বিরাজ করে, আমি তাদের একজন। এরা নিজেরা স্রষ্টা না-হ'লেও স্রষ্টার ঠিক নিচেই এদের আসন, কারণ সৃষ্টির সৌন্দর্য পরিপূর্ণতম উপভোগ করার ক্ষমতা এদেরই আছে। যেমন আমি। আমার নিজের অযোগ্যতা দেখলেন্ তো, কিন্তু ছবি, কবিতা বা গান আমার চাইতে বেশি ভালোবাসে, এমন লোক নেই।'

এই দীর্ঘ বক্তৃতার আসল উদ্দেশ্য যে কী, তা এতক্ষণে বোঝা গেলো। আর তার ফল যে কী হ'লো, তা বুঝতেই পারছিস ; সেতারটা আমাকেই বাজাতে হ'লো।

যতক্ষণ বাজাচ্ছিলাম, বিদ্যাপতিবাবুর সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখ ধারালো তীরের ফলকের মতো আমার মুখের উপর বিদ্ধ হ'য়ে ছিলো। সেদিকে না-তাকিয়েও আমি তা বুঝতে পারছিলাম। মানুষের অমন চোখ হয়!—যে-চোখে কখনো পলক পড়ে না, প্রশান্ত গভীরতায় যা পাষাণের মতো স্থির হ'য়ে গেছে! আমার সমস্ত মুখ যেন জ্বালা ক'রে উঠলো ; স্পষ্ট অনুভব করলাম, আমার হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দ্রুত স্পন্দিত হ'য়ে বুক থেকে সমস্ত রক্ত মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ বাজনা থামিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু বিদ্যাপতিবাবুর সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ামাত্র তাঁর কঠিন দৃষ্টিতে অমন তরল চঞ্চলতা এলো কী ক'রে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন।

নীলা, আমার এই বিবরণ প'ড়ে তুই যা ইচ্ছে ভাবতে পারিস, কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তা করিসনে, এই মাত্র অনুরোধ। শ্যালটবাসিনীর মতো বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মায়া-মুকুরের ভিতর দিয়ে তো আমি পৃথিবীটাকে দেখিনি যে একদিন বিষণ্ণ সুরে ব'লে উঠবো, 'I'm half-sick of shadows'! আমার ল্যান্সলটকে যদি আমি দেখে থাকি, দিনের আলোয় শাদা চোখেই দেখেছি। প্রত্যুষের অস্পষ্ট আলোয় জ্বরের-ঘোরে-দেখা স্বপ্নের কুহেলি-আবরণে ক্ষণবিহারী ছায়ার মতো দেখা

দিয়েই তিনি অপসৃত হবেন না ; তাঁর আবির্ভাব হবে সূর্যোদয়ের মতো মহিমান্বিত, মৃত্যুর মতো সংশয়াতীত ও সুনিশ্চিত। সেই মোহ তিনি বিস্তার করবেন না, বুদ্ধি যাতে ঘোরালো হ'য়ে আসে। অন্ধকার নিরবয়ব ও অস্পষ্ট ব'লেই কুৎসিত, কালো ব'লে তো নয়। সূর্য উঠলে তার আলোয় যেমন পৃথিবীর সুগঠিত ও সুসমঞ্জস সৌন্দর্য আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি তাঁর স্পর্শে আমার দেহ মন আত্মা ঘুমের জড়িমা থেকে জেগে উঠবে ; শুধু ইন্দ্রিয়ের চেতনায় বা হৃদয়ের অনুভূতিতেই নয়, বুদ্ধির মমতাহীন প্রখর উজ্জ্বলতাতেও তাঁকে লাভ করবো—কোথাও কোনো ফাঁকি থাকবে না। এর নাম তো মোহ নয় ; বরং তাঁর প্রেম যখন মর্মান্তিক যন্ত্রণায় বুকে এসে বাজবে, তখনই সকল মোহ থেকে মুক্তি লাভ করবো, লাভ করবো নব জন্ম।

লীনা

সোনারং
৩২শে জ্যৈষ্ঠ

নীলা,

কাল রাত্রে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ঘ'টে গেছে ; তাই মনের মধ্যে তা একটুও ঝাপসা হ'য়ে যাবার আগেই তোকে লিখতে বসেছি। নিছক ঘটনা-হিশেবে দেখতে গেলে তা তেমন বিস্ময়কর মনে হবার কথা নয়, কিন্তু তার ফলে আমার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, আশ্চর্য সেইটি। এতদিন যে-যবনিকা মৃদু হাওয়ায় থেকে-থেকে কাঁপছিলো মাত্র, কাল আমার চোখের সামনা থেকে তা উঠে গেছে, এবং রঙ্গমঞ্চের উপর আমারই জীবন-নাট্য অভিনীত হচ্ছে, দেখলাম। সেই দিকে তাকিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করলাম, নিজেকে অভিনন্দন জানালাম। কারণ সেই আমি সবচেয়ে আশ্চর্য।

এখানে যখন আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'য়ে যায়, কলকাতায় লোকে তখন বেড়াতে বেরোয়। আহার ও নিদ্রার মাঝখানে সময়ের সুবৃহৎ ফাঁকাটা আমরা তিনটি প্রাণীতে মিলে গল্প-গুজব ক'রে ভ'রে তুলি। কিন্তু কাল মা-র শরীর অসুস্থ ছিলো, তাই আমাদের সভা বসেনি। বাধ্য হ'য়ে উপরে নিজের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হ'লো। ঝাড়লণ্ঠনের যতই চাকচিক্য থাক, সে-আলো বৈঠকখানারই উপযোগী, শোবার বা পড়বার ঘরের নয়। জানলার ধারের টেবিলে ব'সে মোমের আলোয় আমি বই পড়তে লাগলাম। সমস্ত পল্লী ঘুমিয়েছে।

কতক্ষণ পড়েছিলাম, ঠিক বলতে পারবো না ; কিন্তু মনে আছে, একটা মোমের

আধখানার বেশি পুড়ে গিয়েছিলো। কাজেই অনুমান করছি, তখন রাত বারোটার কম হবে না। বুঝতে পারলাম, এখন শয্যাগ্রহণ করলে সঙ্গে-সঙ্গেই নিদ্রাকর্ষণ হবে; তাই গল্পের বহু-পরিচিত নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে কষ্ট হ'লেও বইখানা মুড়ে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলাম।

খোঁপার কাঁটাগুলো খুলতে-খুলতে আমি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিলো, এখন আকাশের মেঘ কেটে চাঁদের মুখ দেখা দিয়েছে। দশমী বা একাদশীর চাঁদ রয়েছে আমার মাথার উপর—জানলা থেকে চাঁদ দেখতে পাচ্ছি না, দেখছি নীল আলোয় স্নাত স্তব্ধ আমাদের আম্রকানন. কাছের গাছগুলোর ভিজে পাতায় ঝিরিঝিরি হাওয়ায় জ্যোছনা আর জলের ঝিকিরমিকির। আমার জানলার নিচে আলো-ছায়ায় মিশে অদ্ভুত আবছায়ার জাল বুনে চলেছে, পেঁপে গাছটার পাশে এক টুকরো ছায়া এইমাত্র ন'ড়ে উঠলো।

কিন্তু ঐ ছায়াটাই কি সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়েছে? তার ফাঁকে-ফঁকে শাদা কাপড়ের মতো ও কী দেখা যাচ্ছে? যাক -এতদিনে বোধ হয় একটা আসল ভূতের দেখা পাওয়া গেলো! হাওয়ায় দু'একটা এলোচুল উড়ে এসে আমার চোখে-মুখে পড়ছিলো; হাত দিয়ে সরিয়ে আমি মুখ বাড়িয়ে নিচের দিকে তাকালাম।

বিদ্যাপতিবাবু ফিরছিলেন বোধহয়;—আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন।

বিস্ময়ের প্রথম আঘাত কাটিয়ে উঠতে-না-উঠতেই অসংখ্য প্রশ্ন একসঙ্গে আমার মনকে আক্রমণ করলো: এর মানে কী? গোলাপিকে তুলবো? উনি কি এ-পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন? বাবাকে ডাকবো? এত রাত্তিরে কোথায়ই বা যাবেন? আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়বো? কিন্তু···

এতক্ষণে এই অতি সরল সত্যটা আমার মনে উদয় হ'লো যে বিদ্যাপতিবাবু আমাকে দেখবার জন্যই ঐখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, এবং সম্ভবত বহুক্ষণ যাবৎই দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই আমাকে এমন-কোনো কথা তাঁর বলার ছিলো, জ্যোছনার নেশায় সারা পৃথিবী ঝিমিয়ে না-এলে যা বলা যায় না—আমার প্রতিটি হৃৎস্পন্দন চীৎকার ক'রে এই কথা ব'লে উঠলো। সেই কথা আমার শোনা চাই। ভাববার সময় নেই; যে-কোনো মুহূর্তে তিনি ঐ পথের মোড়ে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে পারেন। মনে হ'লো, সেই কথাটি শুনতে না-পারলে আমার পৃথিবী চিরকালের মতো অন্ধকার হ'য়ে যাবে। সেই

শুভলগ্ন বুঝি এলো, যার জন্য এতকাল অপেক্ষা করছি ; এ যদি বৃথা ব'য়ে যায়, তবে এ-জন্মের মতো আমার মনের বিরহ ঘুচবে না।

এখন বুঝতে পারছি, নীলা, যে বাইরে উপস্থিত হ'তে পারার আগে আমি অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নেমে, মাঝের হলটা পেরিয়ে নিজ হাতে পিছন দিককার প্রকাণ্ড দরজাটা খুলছিলাম। কিন্তু তখন মনে হয়েছিলো যেন ইচ্ছে করা মাত্র আমি হাওয়ায় উড়ে এসে সেখানে পড়লাম।

দরজার ঠিক বাইরে সিঁড়ির উপর আমি দাঁড়ালাম। বিদ্যাপতিবাবু যন্ত্র-চালিতের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। সিঁড়ির গোড়ায় এসে কী ভেবে যেন একটু অপেক্ষা করলেন—তারপর আমার ঠিক নিচের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন।

অস্ফুটস্বরে আমি জিগেস করলাম, 'আপনি ? এ-সময়ে ?'

মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠের উত্তর শুনলাম, 'কাল চ'লে যাচ্ছি ; তাই আপনাকে দেখতে এসেছিলাম।'

কী বলছি, নিজে তা বুঝতে পারার আগেই আমি ব'লে উঠলাম, 'কাল যাচ্ছেন ? অসম্ভব।' কথাটা নিজের কানেই বিসদৃশ শোনালো। একটু অপ্রতিভ হ'য়ে হাসবার চেষ্টা ক'রে তাড়াতাড়ি ব'লে ফেললাম, 'কিন্তু সময়টা কি খুব সুনির্বাচিত হয়েছে বিদ্যাপতিবাবু ? আপনার বিবেচনাকে ধন্যবাদ।'

'আমি তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি, আপনাকে দেখতে এসেছিলাম শুধু। দূর থেকে দেখে চ'লে গেলেই আমার তৃপ্তির সীমা থাকতো না ; আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি, এ আমার আশাতীত সৌভাগ্য।'

'দুঃখের বিষয়, এ-সৌভাগ্য আমার পক্ষেও সমান উপভোগ্য হচ্ছে না। পাশের ঘরে চাকর-বাকররা শুয়ে আছে ; –তারা যদি কেউ—'

'অনর্থক আপনি আশঙ্কা করছেন। আমি তো চ'লেই যাচ্ছিলাম—কেন আপনি এলেন ?'

ব'লে তিনি যাবার জন্য পা বাড়ালেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে হাওয়ার মতো স্বরহীন অথচ তীব্র স্বরে আমি ডাকলাম, 'শুনুন।'

বিদ্যাপতিবাবু আমার দিকে যে-মুখ ফেরালেন, তা ভূতের চেয়েও ম্লান। নিচের সিঁড়িতে না-নেমে যতটা সম্ভব তাঁর কাছে স'রে এসে আমি বললাম—না, বলিনি, কারণ আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোয়নি—আমার নিশ্বাস-পাতের সঙ্গে এই কথা উচ্চারিত হ'লো : 'কালই যাচ্ছেন ? সত্যি ?'

বিদ্যাপতিবাবুর বিবর্ণ মুখ মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, দেখলাম। ভীরু একটি

হাসি লাজুক আলোক-রেখার মতো তাঁর ঠোঁটের কিনারে একটু খেলা করলো, তারপর তাঁর দুই চোখের শ্যামল গভীরতায় ঝাঁপ দিয়ে খানিকক্ষণ ঝলমল ক'রে বিলীন হ'য়ে গেলো। অত্যন্ত সহজভাবে, প্রায় লঘুকণ্ঠেই তিনি বললেন, 'এ-কথা আমাকে কেন জিগেস করছেন? জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যাঁর নির্দেশ মেনে চলায় আমার জীবনের একমাত্র চরিতার্থতা, একটু আগেই তিনি নিজমুখে বলেছেন যে কাল আমার যাওয়া অসম্ভব।'

'তাঁর উপর আপনার বিশ্বাস যদি এমনি অন্ধ, তবে যাবার সংকল্প করার আগে তাঁর পরামর্শ নেননি কেন?'

'বিশ্বাস অন্ধ ব'লেই কোনো প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হয়নি। জানতাম, তাঁর যা অভিপ্রেত, তা হবেই; আমার কোনো চেষ্টার অপেক্ষা তিনি রাখবেন না। হ'লোও তা-ই।'

'তবে জানবেন, তিনি এই মুহূর্ত থেকে আপনার সমস্ত জীবন দাবি করছেন।'

হঠাৎ বিদ্যাপতিবাবু নতজানু হ'য়ে ব'সে পড়লেন আমার সামনে। তাঁর উৎসুক উত্তোলিত বাহু এড়াবার জন্য আমি বিদ্যুৎগতিতে স'রে যেতেই আমার শাড়ির আঁচলটা লুটিয়ে পড়লো। বিদ্যাপতিবাবু দুই হাতে সেই আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে তাতে মুখ ঢাকলেন।

ঈষৎ অবনত হ'য়ে আমি তাঁর চুলের উপর হাত রাখলাম। ধীরে-ধীরে তিনি মুখ তুললেন—সিংহের মতো প্রকাণ্ড মাথায় হরিণের চোখ আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখ—জ্যোছনা আর অশ্রুজল একত্র হ'য়েও সেই দুটি চোখকে উজ্জ্বলতর করতে পারেনি। দু'খানা আয়না মুখোমুখি রাখলে যেমন তারা পরস্পরের সংখ্যাহীন ছায়া সৃষ্টি করে, তেমনি আমাদের দৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হ'তেই তার ভিতর দিয়ে আমরা নিজেদের অনন্তবিস্তৃত অসংখ্য মূর্তি প্রত্যক্ষ করলাম;—সময় যখন শিশু, তখন থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনী। এক মুহূর্তে কেটে গেলো—শত সহস্র শতাব্দী। বিদ্যাপতিবাবু আবার আমার আঁচলে মুখ ঢাকলেন। সেন্ট ভেরনিকার রুমালে যীশুর মুখের ছাপের মতো আমার ঐ বস্ত্রাঞ্চলে যদি আজ তাঁর মুখচ্ছবি দেখতে পেতাম, তাহ'লে আমি একটুও বিস্মিত হ'তাম না।

পনেরো মিনিট আগে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে যে নেমে এসেছিলো, সে আর ফিরে এলো না; তার শূন্য স্থান যে অধিকার করেছে, শেলির মতো সে সুন্দর, দেবতার মতো সে অনির্বচনীয়। বিশ্বের সকল কবিদের অপরূপ আনন্দ ও বেদনা, কল্পনা ও অনুভূতি আমার মনে নেবুর রসে লেখা ছিলো, এতদিন তা পড়তে পারিনি, কিন্তু

যে মুহূর্তে প্রেমের আলো জ্বলেছে, তার উত্তাপে সেই লেখা উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে ফুটে উঠেছে। নিজেকে আবিষ্কার করলাম;—এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে লেখেনি।

আমাদের এই বিবাহকে আশীর্বাদ করবার জন্যই বিধাতা সেই অল্প একটু সময়ের জন্য আকাশ থেকে করেছিলেন জ্যোছনার পুষ্পবর্ষণ; নইলে উপরে এসে আমি বিছানায় শোবামাত্র আকাশ ভেঙে কেন নামবে বৃষ্টি? জলের ধারা যে গান করতে-করতে পৃথিবীতে নামে, আমার আগে কেউ কি তা জেনেছে? দুপুর রাতে অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে-শুয়ে কিছুতেই ঘুমুতে-না-পারাটি যে কত মিষ্টি, নীলা, আমার আগে কেউ কি তা বুঝেছে?

আজ সকালবেলা চোখ মেলতেই পৃথিবীর সঙ্গে আমার প্রথম শুভদৃষ্টি হ'লো। পুকুরের নিচের পাঁক থেকে আরম্ভ ক'রে আকাশের স্ফটিকাভ নীলিমা পর্যন্ত এমন-কিছু নেই, যা আমার ভালো না লাগছে। এমনকি, গোলাপির উঁচু দাঁতও আজ ক্ষমা করতে পারছি।

এই পর্যন্ত লিখেছি, এমন সময় লেখায় বাধা পড়লো। বাবা পাশের বারান্দা দিয়ে তাঁর নিজের ঘরে যাচ্ছিলেন; আমার দরজার কাছে এসে কী মনে ক'রে দাঁড়ালেন। উৎফুল্লকণ্ঠে ডাকলাম, 'এসো, বাবা।'

বাবা এলেন। তারপর তাঁর মুখে যা শুনলাম, তা এই:

এইমাত্র তিনি বিদ্যাপতিবাবুর বাড়ি থেকে ফিরছেন। দেওয়ানজির সঙ্গে মহালের দেখাশোনা করতে বেরিয়েছিলেন, বেরোবার পথে পড়লো সেই বাড়ি। ভাবলেন, বিদ্যাপতিবাবু অনেকদিন আসেন না, একবার খোঁজ নিয়ে যাওয়া যাক। গিয়ে দেখলেন, বিদ্যাপতিবাবু জ্বরে অচেতন হ'য়ে প'ড়ে আছেন; তাঁকে দেখে চোখ মেললেন, কিন্তু চিনতে পারলেন ব'লে মনে হ'লো না। চাকরের মুখে শুনলেন যে তিনি সন্ধের একটু পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। যখন ফিরেছেন, রাত তখন আর বেশি নেই, এবং জামা-কাপড় সব বৃষ্টিতে এমন ভিজেছে যে মনে হয় এইমাত্র তিনি নদীতে ডুব দিয়ে এসেছেন। কাপড় বদলাতে-বদলাতে চাকরকে বললেন, 'আমার বোধ হয় জ্বর হ'লো রে।' তারপর সেই যে বিছানায় পড়লেন, এ-পর্যন্ত আর-একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। বাবা কপালে হাত রেখে বুঝলেন, জ্বর খুব বেশি এবং সম্ভবত চেতনাও ঘোলাটে হ'য়ে গেছে। বাবা তৎক্ষণাৎ চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন তারপাশায়—সরকারি ডাক্তারকে ধ'রে আনতে। অবশ্যি নৌকোই যখন এ-অঞ্চলের একমাত্র যান, তখন ডাক্তারবাবুর আসতে-আসতে বিকেল। বাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় চাকরটাকে

যথাসাধ্য সাহস ও ভরসা দিয়ে মনুষ্যত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে এসেছেন, কিন্তু দুপুর-বেলায় তাঁকে আর-একবার যেতে হবে, কারণ তিনি—হ্যাঁ, তিনি একটু শঙ্কিতই হ'য়ে পড়েছেন।

পরে বাবা বললেন, 'বিদ্যাপতিবাবু কাল সারারাত কোথায় যে ছিলেন এবং কী ক'রেই বা ভিজলেন, সে এক রহস্য। বোধহয় কাছের কোনো গ্রামে গিয়েছিলেন নিমন্ত্রণে—বা কোনো কাজে—ফেরবার পথে মাঠের উপর পান বৃষ্টি—সেখান থেকে নিকটতম আশ্রয়ও হয়তো মাইল-খানেক দূরে। আর ঐ শেষ-রাত্তিরে কাছাকাছি বাড়ি-ঘর থাকলেই বা কী? স্বগৃহে উপস্থিত হ'তে-না-পারা পর্যন্ত কোনো আশ্রয়ের আশা নেই।—অথচ, আজ নাকি তাঁর এখান থেকে চ'লে যাবার কথা ছিলো।'

বাবার কথা শুনতে-শুনতে আমি মনে-মনে কী ভাবছিলাম, জানিস? আমাদের এখান থেকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছতে কোনোরকমেই আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবার কথা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় আধ ঘণ্টা ধ'রে নবধারাজলে স্নান করতে বারণ করবেন। তার ফলেই এই জ্বর। প্রভুর অনুপস্থিতিতে ভৃত্য সন্ধ্যা থেকেই সুখ-নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তাই রাত একটাকে নিশান্ত ব'লে স্বচ্ছন্দে ভুল করেছিলেন।

বললাম, 'আমাকেও নিয়ে চলো না, বাবা—তাঁকে দেখে আসি।'

'তুই যাবি? এই দুটি কথায় বাবা অনেক প্রশ্নই জিগেস করলেন। অসংকোচে উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, যাবো। কারণ আজ যে তাঁর এখান থেকে যাওয়া হ'লো না, সেজন্য আমিই দায়ী।'

বাবার চোখ সংশয়ের মেঘে মলিন হ'য়ে এলো—কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই দেখলাম, সেই দৃষ্টি সত্যবোধের পরিচ্ছন্ন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

'তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে, বাবা।'

'কী, লীনা?'

'তোমার বিলেত যাত্রার সঙ্গী-রূপে আর-একজনকেও নাও না।'

বাবা হাসিমুখে বললেন, 'বনবাসে যাওয়া তত দুঃখের নয়, লীনা, সমাজের মাঝখানে একঘরে হ'য়ে থাকা যত। দুটি লোক যখন পরস্পরের কাছে সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়ো হ'য়ে ওঠে, তখন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি যে কতখানি বাহুল্য, তা আমি জানি। সেই তৃতীয় ব্যক্তির স্থান অধিকার ক'রে নিজেকে লজ্জা দিতে আমি রাজি নই। তোরা পরের জাহাজে আসিস, আমি বরং জাহাজের ক'টা দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই কাটাবো—ওঁর হালের বইগুলো ভালো ক'রে এখনো পড়াই হয়নি।'

'কিন্তু বাবা, আমার প্রতি তুমি বড্ড অবিচার করছো।'

'কেননা, নিজের প্রতি সুবিচার করতে হচ্ছে। "তৃতীয় ব্যক্তি"র দুর্ভাগ্য জানি ব'লেই আমার এত ভয়। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তোর মা-কে জিগেস ক'রে দেখিস।'

আমিও হেসে ফেললাম।—'তোমার সঙ্গে তর্কে কে কবে জিতেছে, বাবা?'

'কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তর্কটা যে আদৌ আমার সঙ্গে হচ্ছিলো না। তুই তর্ক করছিলি নিজের সঙ্গে, এবং এই আত্ম-বিরোধে মানুষ সর্বদা হারতেই চায়।'

ব'লে বাবা আমার ললাট চুম্বন করলেন।

জানিস নীলা, বিদ্যাপতিবাবুর এই অসুখের খবর শুনে আমার একটুও দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠা হচ্ছে না। এখানেও আমি বিধাতার অঙ্গুলি-নির্দেশ দেখতে পাচ্ছি। এই রোগ মুহূর্তমধ্যে তাঁকে আমার একান্ত নিকটে এনে দিয়েছে; সাধারণভাবে দিন কাটলে এই প্রকাশ্য অন্তরঙ্গতায় উপনীত হ'তে বহুদিন লাগতো। সেই দীর্ঘকালের ব্যবধান বিধাতা নিজ হাতে দিলেন সরিয়ে; কাল রাত্রে যিনি ঐটুকু সময়ের জন্য আকাশ ভ'রে জ্যোছনা পাঠিয়েছিলেন, এই রোগও তাঁরই দান, মিলনতীর্থের দীর্ঘ পথকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য তাঁরই একটা কৌশল। যা-কিছু হচ্ছে, তার মধ্যে সেই চির-সুন্দরের পরম শুভেচ্ছা দেখতে পাচ্ছি।

আজ আর আমার মনে কোনো বিরোধ, কোনো সংশয় নেই; সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিপূর্ণ শান্তিতে তা শরতের আকাশের মতো স্তব্ধ ও সমাহিত। এমনকি, বিদ্যাপতিবাবুকে দেখতে যাবার জন্য কোনো অধীর উৎসুকতা নেই পর্যন্ত। কেননা, যা অবশ্যম্ভাবী, তা তো ঘটেছে, আমার আজন্ম-তপস্যার ফল-লাভ আমি করেছি;— দেবতা দিয়েছেন বর। এই বর আমি যখনই ব্যবহার করি না কেন, একবার যা পেয়েছি, চিরকালের মতো তা পেয়েছি; তা ফিরিয়ে নেয়া—যিনি বর দিয়েছেন, তাঁরও অসাধ্য।

লীনা

সোনারং,
১লা আষাঢ়

নীলা,

তারপাশা থেকে ডাক্তার এসেছিলেন, তিনি বললেন যে বিদ্যাপতিবাবুর চিকিৎসার ভার নেয়া তাঁর সাহসে কুলোয় না, বিদ্যাতেও নয় বোধ হয়। বললেন—বুকে সর্দি ব'সে গেছে, নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে, তাই কলকাতায় নিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং কাল আমরা সবাই কলকাতা রওনা হচ্ছি—এবং এই খবর দিতেই তোকে

এ-কার্ডখানা লিখলাম। বুঝতে তো পারছিস, আমার পক্ষে বাড়ি থেকে বেরোনো সম্ভব হবে না—তুই-ই আসিস, পরশু সকালেই আসিস। সোনারং বছরখানেকের মধ্যেই নাকি পদ্মার জলে তলিয়ে যাবে, ইহজীবনে তাকে আর দেখবো না, কিন্তু আমার স্মৃতির পৃথিবীতে তা আনন্দ-উজ্জ্বল ক্ষয়হীন আয়ুলাভ করলো।

লীনা

লীনার জীবনের যে-অংশের অভিব্যক্তি আনন্দে, সৌন্দর্যে, করুণতায় উজ্জ্বলতম, তার পরিচয় এই চিঠিগুলিতে আপনারা, আশা করি, যথেষ্ট নিবিড় ক'রেই পেয়েছেন। কিন্তু তার জীবনের চরম পরিপূর্ণতার কাহিনী আপনারা এখনো শোনেননি। সে-কথা বলবার ভার আমার নিজেরই নিতে হচ্ছে ব'লে আপনারা অপরাধ গ্রহণ করবেন না।

দশুই আষাঢ় ভোরবেলা টেলিফোনের আওয়াজে নীলার ঘুম ভেঙে গেলো। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে সে সেটা তুলে নিলে। তারপর নিম্নলিখিত কথাবার্তা হ'লো :

'কে ?'

'আমি।'

'ও, লীনা ? কী খবর সব ? ডাক্তার-নালরতন কাল বিকেলেও এসেছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'নর্স দু'জন কাল সারা রাত ছিলো ?'

'একজন ডাক্তারও ছিলেন সারারাত।'

'ডাক্তারও ? কেন ? তোর মা-র শরীর ভালো আছে তো ?'

'মা ভালোই আছেন।'

'কাল সারাদিনেও আমি একবার যাবার সময় ক'রে উঠতে পারলাম না;— হঠাৎ আমার এক দেওর সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হয়েছেন—তাঁদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। আজ যাবো। দশটা নাগাদ একবার গাড়ি পাঠাতে পারবি ?'

'তোর আসবার দরকার নেই।'

'কেন ?'

'বিদ্যাপতিবাবু'— লীনার কণ্ঠস্বর থেমে গেলো।

'কী রে ?' নীলার কণ্ঠ একটু কাঁপলো, 'কী হয়েছে ?'

'উনি – এইমাত্র উনি মারা গেলেন।···না, তোর আসবার দরকার নেই।'

১৯২৮ 'অভিনয়, অভিনয় নয়'

বোন

কেমন ক'রে নৈনিতাল যাবার পথে এক ইষ্টিশানে একব্যাটা গোরা তাঁর কামরার জানলায় উঁকি মেরেছিলো—তিনি প্রায় চীৎকার ক'রে উঠছিলেন আরকি! এমন সময় কমলালেবুর খোশা ছাড়াতে-ছাড়াতে 'মিস্টরে'র আবির্ভাব ;— রাঙামুখো কুত্তাটাকে দেখেই তাঁরও মুখ রাঙা হ'য়ে উঠলো - করলেন কী, এক টুকরো লেবুর খোশা নিয়ে পিছন থেকে দিলেন ব্যাটার চোখে ছিটিয়ে। চোখ কচলাতে-কচলাতে সাহেবমশাই 'আ'ম ভে-এ-রি সরি' ব'লে আর কূল পায় না। তারপর কেমন ক'রে দু'জনে খুব ভাব হ'য়ে গেলো, সায়েবটা সেই কামরাতেই উঠলো— সারাক্ষণ দু'জনে কী গপ্‌প, আর হাসাহাসি! সায়েব নামবার সময় 'মিস্টরে'র সৌজন্য ও ইংরিজি উচ্চারণের কী ব'লে তারিফ করছিলো—ছোড়দি এইসব গল্প করছিলেন, বা অমলা করছিলো। আর তাকে ঘিরে গোল হয়ে ব'সে শুনছিলেন মা আর পিসিমা, শুনছিলো ডলু, খুকু, পারুল, কমল, আর—লিলি।

হ্যাঁ, লিলিও শুনছিলো বইকি। যদিও এ-গল্প এর আগে উনিশবার শুনেছে, তবু। কিন্তু কানে শুনলে কি আর চোখে দেখা যায় না? তাই তো ঘড়ির কাঁটা সাতটা বাজো-বাজো হ'তেই খুকু ভ্যাঁ ক'রে চীৎকার দিয়ে উঠলো।

বাধা পড়লো গল্পয়—নিশ্বাস নেবার জন্যেও ছোড়দির একটু থামবার দরকার ছিলো।

—কী? কী হ'লো?

— ডলুটা আমায় চিমটি কেটেছে মা—ভ্যাঁ—ভ্যাঁ—

কে বা কানে তোলে ডলুর প্রতিবাদ! মা ডলুকে ধমকালেন— দোষ ক'রে আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে! চুপ ক'রে থাক, নইলে খাবি থাপ্পড়।

ছোড়দি কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, ইশশ—ছেলেপিলের কান্না! থাম না রে খুকু।

লিলি কিন্তু আদর্শ দিদি! চট ক'রে খুকুকে কোলে তুলে নিয়ে বললে চল তোকে খাইয়ে আনি। ডিমভাজা খাবিনে—ডিমভাজা? ডলু আজ ডিম পাবে না—ওর ভাগেরটা তোর।

খুকুকে নাচাতে-নাচাতে লিলি নেমে গেলো। অমলা শুরু করলে—বুঝলে মা, তারপর—

রান্না না-হ'য়ে থাকলে লিলি আর কী করবে?—যত দোষ ঐ রামের মা-র! জানে, সন্ধে হ'লেই ছেলেপিলেদের ঘুম পায়, তবু একদিনও যদি তার রান্না হয়। নাঃ—!

নিতান্তই চ'টে গিয়ে খুকুকে নিয়ে সে বাইরের ঘরে গেলো। সাতটা-পাঁচ। জানলাগুলি খুলে পাখাটা খুলে দিয়ে সে টেবিলের ধারে ব'সে পড়লো। দরজাটা বন্ধই থাকলো।

খবরের কাগজ। খুকুর কান্না ততক্ষণে থেমে গিয়েছিলো- সে উপরে মা-র কাছে ফিরে যাবার জন্যে দিদির কোল থেকে পালাই-পালাই করছিলো। লিলি আদর্শ দিদি কিনা—কিছুতেই ওকে যেতে দেবে না গেলেই পড়বে ঘুমিয়ে, তারপর খাওয়া নিয়ে ভজকট! কিন্তু অবোধ খুকু কি আর সে-কথা বোঝে!

সাতটা-বারো।···অগত্যা সেই কী-ছাই কাগজটাকেই খুলতে হ'লো—খুকুকে পোষ মানাবার জন্য। ছবি দেখতে পেয়ে খুকু মহা খুশি! 'ওটা কী, লিলি-দি? এলোপ্লেন? এই দাড়িওলা লোকটা হাসছে কেন? বাঃ, কী সুন্দর এই কুকুরটা!'··· সওয়া-সাত। কোনো-কোনো লোকের উপর লিলির এমন রাগ হয়—বিশেষ ক'রে তাদের উপর, কথা দিয়ে যারা কথা রাখে না। অথচ সেদিন হাস্নাহানাদের বাড়ি থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়েছিলো—ওরা কিছুতেই ছাড়ে না—কী ব'লেই বা হঠাৎ চ'লে আসা যায়?—এ-সব কথা কি আর কেউ বোঝে? সেই নিয়ে কত—

দরজায় খুট ক'রে একটু শব্দ হ'লো। হঠাৎ খুকুর কৌতূহল-নিবারণে আদর্শ-দিদির বিপুল আগ্রহ দেখা গেলো।—হ্যাঁ, এইটে হচ্ছে এরোপ্লেন। এই যে পাখার মতো দুটো দেখছিস, এ দুটো চালিয়ে আকাশে ওড়ে—ঘণ্টায় একশো মাইল—

—মোটে একশো! আমি হ'লে তো ছাব্বিশ হাজার মাইল (আবার খুট!) উড়ে যেতাম ভোঁ ক'রে।

—দূর বোকা! লিলি উঠে দরজাটার খিল খুলে দিয়ে নীরবে আবার এসে বসলো।—আর ভিতরে ছোট্ট ঘরের মতো আছে—সেখানে বসবার জায়গা—

এইবার ঘা পড়লো জোরে—দরজাও খুলে গেলো।

—চারদিক অবিশ্যি কাচ দিয়ে ঢাকা—নইলে হাওয়ায়—

—ছাখো লিলি-দি, পিরটি-দা এসেছেন—পিরটি-দা!

পিরটি বা প্রিটি—নামটা আসলে প্রীতীশ—মৃদুস্বরে জিগেস করলে, দরজাটা খোলাই ছিলো নাকি?

খুকু অবাধে ব'লে যেতে লাগলো, না, পিরটি-দা—লিলি-দি এইমাত্র উঠে—

—হ্যাঁহ্—এইমাত্র উঠে! তুই দেখেছিলি! চুপ থাক, ফাজিল মেয়ে।

খুকু ঘাবড়াবার পাত্র নয়। তবু আস্তে-আস্তে বলতে আরম্ভ করলো, হ্যাঁ, সত্যি—

প্রিটি খুকুর চেয়েও আস্তে বললে, কী হয়েছে তোমার ?

—হবে আবার কী? সে—ই কখন থেকে—। যাও, এখন আর কী হয়েছে জিগেস করতে হবে না !

ও, এই ! প্রিটি এতক্ষণে সহজভাবে নিশ্বাস টানতে পারলো। এতক্ষণ তার ভয় হচ্ছিলো, বুঝি তার সেই চিঠিঠা—যাক।

—আমি বুঝি ইচ্ছে ক'রে দেরি করেছি ? পথে আসতে আসতে বাস্‌টার—

—অ্যাক্সিডেণ্ট ! লিলির গলা কেঁপে গেলো।

—বাস্‌টার টায়ার গেলো ফেটে। সারাতে পুরো পনেরো মিনিট। যা-তা !

—কলকাতার শহরে ওই একখানা বাস্‌ই চলছে নাকি আজকাল ?

প্রিটি চুপ ক'রে রইলো।

—না-হয় ফেরবার সময় আমার কাছ থেকেই দু'আনা নিতে—ধার। কাল আমি ঠিক ফেরৎ নিতাম—পয়সার প্রতি আমার বেজায় লোভ কিনা !

প্রিটি তবু নিরুত্তর।

—না-হয় হেঁটেই ফিরতে একদিন—

—আজ তা-ই যাবো।

—কেন, শুনি ! তারপর গলার আওয়াজে স্বাভাবিকতা আনবার চেষ্টা ক'রে বললে, আমার বাক্সয় প্রায় দশ টাকা জমেছে।...তুমি নেবে না? এমনি ক'রে তোমার হাতে যদি গুঁজে দিই-- তবু নেবে না ?

এর পর এরা পরস্পরের হাত নিয়ে যে-কাণ্ডটা করতে লাগলো, ভাগ্যিশ খুকু ছাড়া আর-কেউ তা দেখেনি। যে দেখতো সে-ই বলতো, কী ছেলেমানুষি !

এমন-কী দোষই বা ওর—একদিন না-হয় পনেরো মিনিট দেরিই ক'রে ফেলেছে—তা পনেরোই তো মিনিট ! আর, ইচ্ছে ক'রে তো আর করেনি ! বাস্‌-এর টায়ার ফাটলে কার দোষ? পকেটে আর পয়সা না-থাকলে দোষ কার ? তাছাড়া, দোষ ক'রে ফেলেছে ব'লে বেচারার করুণ মুখ দেখলে দয়াও হয় ;—লিলির কেন—কারই বা না হয় ? অনেকের হয়তো না-ও হ'তে পারে, কিন্তু লিলি তাদের মতো নয় ; লিলি ক্ষমাশীল, লিলি মহানুভব, অল্পতেই ওর করুণা হয়, বড়ো সহজেই ক্ষমা ক'রে ফেলে। তাই—

আচ্ছা, এইবার তোমাকে ক্ষমা করলুম। এখন বসতে পারো—হঠাৎ হাত সরিয়ে

নিয়ে লিলি বললে। তারপর খুকুকে কোলের কাছে টেনে আদর করতে-করতে: দেখলে, আমার মন কেমন উদার! একটু ঝগড়াও করলুম না!

—ভারি তো! আমি বুঝি একবার ক্ষমা করিনি—এর চেয়ে অনেক গুরুতর অপরাধ?

—ওমা, কবে আবার—! লিলি অবাক।

মেয়েরা সুবিধেমতো নানা কথাই ভুলে' যায়–বিশেষ ক'রে যে-সব কথা অন্যের মুখে শুনতে তাদের ভালো লাগে। প্রিটি তা জানে, তাই সে বিস্তৃত বর্ণনা শুরু করলে:

—সেই যে একবার একমাস ধ'রে কালাজ্বরে ভুগলাম—একবার দেখতে যাওয়া হয়েছিলো? হ্যাঁ, ছোটো ভাইকে রোজ পাঠানো হ'তো বটে—কখনো চিঠি দিয়ে, কখনো এমনি–কিন্তু না-ও তো বাঁচতে পারতাম! আমার যে-মেশোমশাই বছরে শুধু একবার–বিজয়া দশমীর দিনে–আমাদের বাড়ি আসেন, তিনিও তিন দিন এসেছিলেন–এমনকি পাশের বাড়ির গিন্নি একবার খোঁজ নিইয়েছিলেন;—রোজই ভাবতাম, মানুষ ম'রে গেলে তো আর চোখে দেখতে পায় না!

—হ্যাঁ, অমন দূর থেকে দোষ দিতে সবাই পারে! যারা জানে না, মেয়েদের কত অসুবিধে, তারাই কিনা—

—চুপ! চুপ! এখন তোমার এ-পার্ট নয়। শোনো, সবই আসছে।···প্রথম ইনজেকশনের পর জ্বরটা যেদিন একটু কমলো প্রতিজ্ঞা করলাম–আর না। মনে পড়লো শোপেনহাওয়ার, মনে পড়লো এভোল্যুশনে মেয়েরা পুরুষের এক ধাপ পিছে। তৃতীয় ইনজেকশনের পর জ্বর গেলো ছেড়ে–চাঙ্গা হ'য়ে উঠলো পৌরুষ। ভাবলাম, ভালো হ'য়ে উঠেই একদিন য়্যাসা ব'কে আসবো। সাতদিন তালিম দিলাম–ভাত খাওয়া অবধি। ভাত খেলাম;—কত যে প্রার্থনা করেছি—কবে গিয়ে মনের ঝাল ঝেড়ে আসতে পারবো!

—সেই যেদিন তুমি এলে—মাথায় রুমাল বাঁধা—কী কাহিল, কালো, শুকনো—দেখে এমন মন-খারাপ লাগছিলো, অথচ সেরে উঠেছো ভাবতে ফুর্তিও হচ্ছিলো খুব—সে ভারি অদ্ভুত।

—সেদিন তোমার চোখে জল দেখেছিলাম—আমার সেই অনেক সাধের বকুনিগুলো কোথায় যে উড়ে গেলো—চিহ্নও রইলো না। নিমেষে ক্ষমা ক'রে বসলুম। সে-কথা মনে রইলো না, বরং হোঁচট খেয়ে তোমার পা যে মচকে গিয়েছিলো—

—তোমার আবার সবটাতেই বাড়াবাড়ি! ভারি না একটু—

—এ-বেলা ডাক এসেছে রে, লিলি?

—এসেছে, ছোড়দি, কিন্তু শ্রীশবাবুর চিঠি নেই।

অমলা এগিয়ে এসে টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়ালো।—খুকুকে খাইয়েছিস ?

—রান্নাই হয়নি তো—

—না, হয়নি ! রামের মা প্যানপ্যান করছে শুনে এলাম ছেলেপিলেদের আগে খাইয়ে নেয় না - শেষে সবাই একসঙ্গে আসে, অথচ সে তো আর দুটোর বেশি তিনটে হাত গজাতে পারে না।

—হয়েছে নাকি রান্না ? যাই তবে --

—গল্প করতে পেলে সব আকাশে বৃহস্পতি ! কেন, এতক্ষণে ওকে খাইয়ে আনা যেতো না ? ও যে ঝিমুচ্ছে, সেদিকেও খেয়াল নেই তোর ? খালি গল্প করলেই দিন কাটে নাকি ? যা শিগগির ওকে নিয়ে—পারুল কমলকেও ডেকে আন। আমরা ছোটো ছিলাম যখন—কোনো কাজের কথা বলতেও হ'তো না -- আর তোরা যা হচ্ছিস –

খুকু সত্যিই ঝিমুচ্ছিলো ; লিলি ওকে কোলে নিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলো। প্রিটি জানে যে রান্নাঘর চমৎকার জায়গা ; প্রিটি জানে যে সে যদি শুধু একবার মুখ ফুটে বলে যে তার খিদে পেয়েছে, তাহ'লে বাকি ব্যবস্থা লিলিই করতে পারে। কিন্তু ওদের প্রেমের তখন সবে শৈশব, একটুও ঠাণ্ডা সয় না।

অমলা টেবিলের উপর তার চিৎ-করা বাঁ হাতখানা মেলে ধ'রে জিগেস করলে—তুমি হাত দেখতে পারো, প্রিটি ?

রসনার পরিচালনায় প্রিটির আর উৎসাহ ছিলো না ; সে মাথা নেড়ে জানালে– না।

-- জানো না ? আমি জানি মোটামুটি। এসো তোমাকে শিখিয়ে দিই।

প্রিটি ভাবছিলো, পানের আশা যখন নেই, ট্যানট্যালাসের মতো আঠোঁট জলমগ্ন হ'য়ে থেকে লাভ কী ? এই বেলা স'রে পড়া যাক।…শ্রীশবাবু ভারি অদ্ভুত লোক কিন্তু—বৌকে নেয়াবার একটু গরজ নেই তাঁর।

অমলা তার পুরু নরম বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের বেঁটে ও মোটা একটা আঙুল চালাতে-চালাতে বলতে লাগলো, এই যে খুব স্পষ্ট রেখাটা দেখছো, হিন্দু মতে এটা ভাগ্য-রেখা, বিলেতি মতে হার্ট-লাইন। ফেট-লাইন ওঠে প্রায় কব্জির কাছ থেকে উপরের দিকে ;—আমারটা মাঝ-পথে এসেই হারিয়ে গেছে। দেখি তোমারটা ?

প্রিটির তখন মনে পড়েছে যে পকেটে তার একটি পয়সা নেই। যা থাকে কপালে —হেঁটেই লম্বা দেবে।

প্রিটির ভাগ্য-রেখা এতই সূক্ষ্ম যে তা আবিষ্কার করবার জন্য হাতখানাকে দুই হাত

দিয়ে টান ক'রে ধ'রে খুব নিচু হ'য়ে দেখতে হয়। প্রিটি হঠাৎ টের পেলো যে তার নাকের ঠিক নিচেই অমলার কালো মাথাটা। সে শশব্যস্তে ব'লে উঠলো. আপনার নিশ্চয়ই ভারি অসুবিধে হচ্ছে। বসুন না, ছোড়দি।

—রাত্তিরে ভালোমতো বোঝা যায় না। একদিন সকালবেলায় এসো, তোমার হাত দেখে সব ব'লে দেবো।

সব শুনে কাজ নেই প্রিটির। সে জানে হাত-দেখা বাজে. তবু তার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো, হাতখানা তক্ষুনি সরিয়ে না-নিয়ে পারলো না—একটু অভদ্র-ভাবেই।...নাঃ, এই এক রাজার মুল্লুক হেঁটে পাড়ি দেয়া কি সম্ভব? আরো, যাবার সময়? আসতে সে স্বচ্ছন্দে পারতো—হেঁটে কেন, বোধহয় এক পায়ে লাফাতে-লাফাতেও আসতে পারতো। কিন্তু যাওয়া অন্য কথা।

অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে সে ব'লে ফেললো, আমাকে দু'আনা পয়সা ধার দিতে পারেন, ছোড়দি—আমার বাস্-এর পয়সা নেই।

অমলা সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বললে, নেই? অথচ তুমি এত দূর এসেছো? রোজই এ-রকম থাকে না নাকি?

প্রিটির কান লাল ও গরম হ'য়ে উঠলো। যে-ছেলে জীবনের প্রথম প্রেমে পড়েছে, একটুতেই তার অপমান লাগে। স গম্ভীরভাবে জবাব দিলে, আর কখনো এ-রকম হয়নি।

—ও কী? চটলে নাকি?—অমলা হাসতে-হাসতে প্রিটির চুলগুলো ধ'রে এক নাড়া দিলে।

—পয়সা আমি তোমাকে দেবো, এক সর্তে।

এ আবার কী? প্রিটির মনে হ'লো তারও হাসা উচিত, কিন্তু সে চট ক'রে গম্ভীর ভাবটা সরাতে পারলো না। জিগেস করলে, কী সর্ত?

—আমাকে নাম নিয়ে ডাকবে আর 'তুমি' বলবে।

—কেন? বয়েসে তো আপনি বড়োই।

—ছাই বড়ো! ছ' না সাত মাসের মোটে—আজকালকার দিনে তাকে আবার বড়ো বলে নাকি! ছোড়দি আর আপনি শুনতে-শুনতে হয়রান হলুম। মনে হয় কতই যেন বুড়ো হ'য়ে গিয়েছি!

দু'আনার পক্ষে এ বড়ো বেশি সুদ। প্রিটি এতে রাজি নয়। একেই তার কিছু ভালো লাগছে না, তার উপর ছোড়দি এতও বাজে বকতে পারেন! নাঃ, এবার আর না-পালালেই নয়। হেঁটেই যাবে সে।

প্রিটিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে অমলা বললে, যাচ্ছো নাকি ? পয়সা নিলে না ?

—আমি তো আপনার সর্তে রাজি হইনি।

—প্রথমটায় একটু বাধো বাধো ঠেকেই—একটু চেষ্টা করো, অভ্যাস হ'য়ে যাবে। ভারি বিশ্রী শোনায় আপনিটা . একটু বোসো, আসছি।

অমলার অটোগ্রাফের বইটা খুঁজে বার করতে একটু দেরি হ'য়ে গেলো। প্রিটিকে লিখতে বলবে—ও নিশ্চয়ই এক্ষুনি লিখবে না বাড়ি নিয়ে যেতে চাইবে। অমলা প্রথমটায় আপত্তি করবে···

অমলা যখন ফিরে এলো, তার তিন সেকেণ্ড আগে প্রিটি লিলির হাত থেকে একটা টাকা নিয়ে রাস্তায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

—প্রিটি কোথায় রে ?

—চ'লে গেছে।

—চ'লে গেছে ? কখন ?

—এই তো এইমাত্র।

—কী ক'রে গেলো ? ওর না পয়সা ছিলো না ?

লিলি ঢোঁক গিলে বললে, উপরের পকেটে একটা সিকি ছিলো—আগে টের পায়নি।

ছোড়দি দাঁতে দাঁত চেপে কী উচ্চারণ করলেন, লিলি ঠিক বুঝতে পারলো না।

—মা, তুমি ভারি কেয়ার্লেস। অমলার মুখে এই অভিযোগ শুনে মা তো অবাক।

—কেন, কী করেছি আমি ? বা করিনি ?

অমলা তার ঘন চুলের বোঝা পিঠের উপর ছেড়ে দিয়ে বললে, মেয়ে মানুষ করতে তুমি জানো না।

মা হেসে উঠলেন।—তুমি নিজে মানুষ হওনি ? না অন্য কারুর পেটে হয়েছিলে ?

—আমার কথা আলাদা। আমাদের সময়ে ঘর-ভরা ছেলেমেয়ে ছিলো না, তুমি সব সময় আমাদের দেখাশোনা করতে পারতে। তা ছাড়া, চোদ্দ বছরে পড়তেই আমার তো বিয়েই হ'য়ে যায়।

মা মেয়ের চুল নিয়ে বিনুনি বাঁধতে-বাঁধতে বললেন, তুমি আর তোমার দিদি অনেক বেশি আদর পেয়েছো, তা ঠিক; কিন্তু লিলি ওরাও তো কষ্টে নেই।

অমলার ঠোঁটের উপর দিয়ে যে-বাঁকা হাসি খেলে গেলো, মা তা দেখতে পেলেন না।

—না, না, কষ্টে থাকবে কেন? সুখেই তো আছে খুব, কিন্তু সুখেরও বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

—তুমি দূর থেকে দু'দিনের জন্য এসেছো কিনা বাড়াবাড়িই তো দেখবে। সব কথা যদি শুনতে—

—চাইনে শুনতে। এখন আমি তো আর এ-বাড়ির কেউ নই, পরের কথা শোনবার মাথা-ব্যথা নেই আমার। যা চোখে পড়ে, না-ব'লে পারিনে—এই যা। এত বড়ো মেয়ে যার, সেই মা-র একটু ভ্রূক্ষেপ নেই—এমন আর দেখিনি।

—এত বড়ো আবার কে? লিলি? ও তো সবে পনেরোয় পা দিয়েছে—এখনি ওর বিয়ে?

—বিয়ে দাও বা না দাও সে তোমার ইচ্ছে,—কিন্তু ও তো আর শিশু নয়! ওর বয়েসে আমার এক বছর কারাবাস হ'য়ে গেছে—আর লিলি তো দিব্যি ইস্কুলে যায় আর গপ্প ক'রে দিন কাটায়।

—শ্রীশের মতো ভালো পাত্র পেয়েছিলাম—ছাড়তে সাহস হয়নি। লিলির জন্যে তেমন পাচ্ছি কই? এ ক'বছরে হাওয়াও বদলে গেছে—আঠারোর আগে বিয়ের কথা ভাবেই না কেউ। লিলিও যেন কেমন—বয়েস বাড়ছে, কিন্তু বড়ো হচ্ছে না, এখনো কী-রকম ছেলেমানুষ দেখছিস তো। ভাবতে অবাক লাগে, ওর বয়েসে আমার একটি মেয়ে হয়েছিলো।

—তোমার কাছে- উঃ, অত শক্ত ক'রে বেঁধো না, মা—তোমার কাছে ছেলেমানুষ মনে হবেই তো—এই জন্যেই তো তোমাকে আমি কেয়ার্লেস বলি। মেয়েরা যেদিন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরে, সেদিন থেকেই তাদের চব্বিশ ঘণ্টা চোখে-চোখে রাখতে হয়, তা-ও তুমি জানো না! কী অবাধ স্বাধীনতা দাও তুমি!

—আমার কাছে যদ্দিন আছে, একটু হেসে-খেলে বেড়াক না। জন্মের মতো তো কয়েদখানায় ঢুকতেই হবে।

—হেসে-খেলে তো বেড়াচ্ছে, শেষকালে গড়াতে-গড়াতে না গোল্লায় যায়। কোনো-দিকেই তো তোমার চোখ নেই!

—কেন? লিলি তো বরাবর পরীক্ষায় ফার্স্ট হচ্ছে—গান শেলাই সুদ্ধ। ঘরের কাজকর্মও শিখছে—তা কী-ই বা বয়েস, কতটুকুই বা পারে!

—তুমি মা ব'লেই এ-কথা বলছো, কিন্তু আমার শাশুড়ি যখন আমার কাছ থেকে কড়ায়-গণ্ডায় কাজ আদায় ক'রে নিতেন, আমার বয়েসও ওরই মতো ছিলো। কিন্তু সে-কথা হচ্ছে না। তুমি যে একেবারে রাশ আলগা ক'রে দিয়েছো—মেয়ে যা খুশি

তা-ই করে, যার সঙ্গে ইচ্ছে তার সঙ্গেই মেশে। একটা কথার কথা বলছি—প্রিটির সঙ্গে কি ওকে অত মিশতে দেয়া উচিত? এমন-কিছু নিকট আত্মীয় তো নয়;—আজকালকার দিনে বাপ-খুড়োর সঙ্গেই লোকের সম্পর্ক থাকে না—আর এ তো কত লতা-পাতা! তুমি ভাবো, মেয়ে তোমার কচি খুকিটি কিচ্ছু বোঝেন না! তোমাদের দিনকাল আর নেই গো—এখনকার মেয়েরা সব বারোতে বুড়ো। সব পারে ওরা—চোখ-কান খোলা থাকলেই সব বুঝতে। মানুষকে বিশ্বাস করবার একটা সীমা থাকা ভালো। শেষটায় একটা-কিছু হোক লোকে তখন দুষবে তোমাকেই, নইলে আমার কী, বিয়ে হ'য়ে গেলে মেয়ে পরস্য পর। আমি তোমাদের সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা ব'লে অমলা দম নেবার জন্যে থামলো। সে থামা-মাত্র পিসিমা—তিনি এতক্ষণ ঘরের এক কোণে ব'সে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে মালা জপ করছিলেন—কথাটা লুফে নিলেন: ঠিক বলেছিস অমি, ঠিক বলেছিস। অত বড়ো মেয়ে পরের ছেলের সঙ্গে তোর অত গুজগুজ করতে যাওয়া কেন? এখন নাকি নিয়ম-কানুন সব উল্টে গেছে—আমরা সেকেলে লোক বাপু আমাদের চোখে এতটা ভালো লাগে না।

ব'লে তিনি গভীর অর্থসূচক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

মা এতক্ষণে গাঙে ঠাঁই পেলেন। অমলার খোঁপায় কাঁটা গুঁজতে-গুঁজতে বললেন, তুই কি খেপেছিস, অমলা? প্রিটি ভারি ভালো ছেলে- পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে;—চেহারাখানাও কী মিষ্টি! অথচ এমনি পোড়াকপাল, মা-টা গেলো ম'রে—আর মা মরলে বাপ তো তালুই। যে যাই বলুক, প্রিটির সঙ্গে কোনোরকম খারাপ ব্যবহার করতে আমি পারবো না।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে হাই ঠেকিয়ে অমলা বললে—আহা, খারাপ ব্যবহার করতে কে বলছে? প্রিটি এখানে আসুক না যত খুশি ওকে আদর-যত্ন করো, খাওয়াও-দাওয়াও লোকে ভালোই বলবে। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো।

কথাটা তখনকার মতো এখানেই চাপা পড়লো। অমলা আবার বড়ো ঘুম-কাতুরে।

মা হ'লে হবে কী, স্ত্রীলোক তো! অমলার ওকালতিতে টাল সামলাতে পারবেন কেন? সুতরাং লিলি আর প্রিটি হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে, কী-যেন একটা হয়েছে, কী হয়েছে তা ঠিক বুঝতে না পারলেও এটা ঠিক বুঝলো যে কিছু-একটা হয়েছে।

এই তো সেদিন ওরা দু'জনে ব'সে গল্প করছিলো, হঠাৎ ছোড়-দি এসে জিগেস্ করলেন, কী আলাপ হচ্ছে তোমাদের ?

প্রশ্নটা নিতান্তই বেমানান। লিলি গম্ভীরমুখে জবাব দিলে, এই কত দেশ-বিদেশের কথা !

—আমিও একটু দেশ-বিদেশের কথা শুনি। মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—কাজে লেগে যাবে। ব'লে তিনি গ্যাঁট হ'য়ে বসলেন।

মহা মুশকিল ! প্রেমের ইস্কুলে ওরা সবে ভর্তি হয়েছে—দু'জনে ব'সে পাটের চাষ নিয়ে আলাপ করবার আর্ট এখনো ওদের আয়ত্ত হয়নি। তাই খানিকক্ষণ এটা-ওটা নিয়ে হুঁ-হাঁ বিনিময়ের পর প্রিটির হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো যে কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি থেকে তার একখানা খাতা আনতে হবে।

সেদিনকার মতো ওরা বেঁচে গেলো—মানে, ম'রে বাঁচলো বটে; কিন্তু রোজই এ-রকম হচ্ছে, দু'দণ্ড নিরালায় ব'সে কথা কইতে পারে না ওরা। হাতের কাজ সেরে লিলি একটু বসেছে কি মা ডাকলেন শেলাই করতে, কি ছোড়-দি প্রিটিকে ডাকলেন তাঁকে একটা এমব্রয়ডারির নক্সা এঁকে দেবার জন্যে কখনো বা পিসিমা নিতান্ত অযাচিত অনুগ্রহ ক'রে তাঁর তীর্থযাত্রার কাহিনী ওদের শোনাতে বসেন। চাইকি, একজন-একজন ক'রে সবাই এসে জুটলেন—ঘর সরগরম। লিলি মনের দুঃখে এক ফাঁকে উঠে গিয়ে বই খুলে বসে, প্রিটি মুখের অম্লানতা বজায় রাখবার চেষ্টা করে, পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার আছে কিনা—এই আলোচনায় যোগ দেয়।

যদি একদিন দু'জনে শুধু আলাপ করতে পারতো—'কী বিশ্রী !' 'ছোড়-দি একটি চ্যাটারবক্স !' 'পিসিমা ভারি ফানি'—এর বেশি, মনে-মনে ভাবলেও, মুখে বলার সাহস ওদের হয় না;—তাহ'লে এত দুঃখ সত্ত্বেও ওরা সুখী হ'তে পারতো। কিন্তু সেটুকু সময়ও হয় না। দু'জনের বুকে হিমালয় পর্বত চেপে বসেছে।

প্রিটি যদি সবার সামনে বলতে পারতো—'শোনো লিলি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে,' বা লিলি, 'আমাকে একটা এক্সট্রা ক'ষে দাও না, প্রিটি-দা', ব'লে তাকে হাত ধ'রে টেনে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে পারতো, তাহ'লে সবই সহজ হ'য়ে যেতো জলের মতো। কিন্তু ওদের ধারণা, পরস্পরকে ভালোবেসে ওরা পৃথিবী-সুদ্ধ্ লোকের কাছে অপরাধী হ'য়ে আছে, তাই ওদের বড়ো ভয়, বড়ো কুণ্ঠা। একজন আর-একজনের সঙ্গে কথাও কয় না—চেনেই না যেন। ওদের নবিশি এখনো শেষ হয়নি, তাই ওরা ভাবছে যে এই ভাবেই সকল সন্দেহ থেকে ওরা রেহাই পাবে ; আর-একটু পাকা

হ'লেই বুঝতে পারতো যে লুকোবার কিছু নেই, এই ভাণ করাই লুকোবার অব্যর্থ উপায়। ওরা জানে না, লুকোবার চেষ্টা করতে গিয়েই ওরা আরো বেশি ক'রে ধরা প'ড়ে যাচ্ছে।

প্রিটির সবচেয়ে অবাক লাগে এই ভেবে যে ছোড়দি ওকে রোজই আসতে বলেন, এবং দেখা হ'লেই নানা আলাপ করেন—যা কথা বলতে পারেন তিনি! ওরা যা আশঙ্কা করে তা-ই যদি হ'তো, যদি ওদের কপালই পুড়ে থাকতো, তাহ'লে—তাহ'লে ছোড়দি অন্তত ওকে অমন আপ্যায়িত করতেন না নিশ্চয়ই। অথচ সবই কেমন-যেন বদলে গেছে, কিছুই আগের মতো নেই। প্রিটি ভাবে—কিন্তু কোনোই কূলকিনারা করতে না-পেরে, ভাগ্যের হাতে তার সব সমস্যা তুলে দিয়ে আগেকার মতোই আসা-যাওয়া করছে।

এক সন্ধ্যায় নিচের ঘর অন্ধকার দেখে সে—ভুল করলে, রান্নাঘরে আগে খোঁজ নিয়ে—সোজা উপরে উঠে গেলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে তার বুদ্ধি খেললো—সামনের বড়ো ঘরটায় না-গিয়ে কোণের যে-ছোটো ঘরটায় গিয়ে ঢুকলো, সেটা লিলির। দায়ে প'ড়ে বেচারার সাহস হয়েছে।

ঘরের আলো জ্বালা হয়নি—টেবিলের উপর একটা মোমবাতি জ্বলছে। আর খাটের উপর শুয়ে আছে—প্রিটির হৃৎপিণ্ড তার বুকে ঠাশ ক'রে এক বাড়ি দিয়ে তারপর একেবারে যেন থেমেই গেলো—ও নয়, ছোড়দি। ছোড়দির চোখ বোজা—ঘুমুচ্ছেন বোধহয়।

প্রিটি ফিরে যাচ্ছিলো, এমন সময়—পায়ের শব্দেই বোধহয়—অমলা চোখ মেললো। ডাকলো—প্রিটি নাকি? যাচ্ছো কোথায়?

দরজার কাছে এসে প্রিটি থমকে দাঁড়ালো। যেন সে চুরি করতে এসে ধরা পড়েছে—সমস্ত কথা গুলিয়ে গেছে তার।

ছোড়দি আবার ডাকলেন, ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? কাছে এসো না! আমার মাথা ধরেছে—চেঁচিয়ে কথা বলতে পারছি না।

যেন, কথা তাঁকে বলতেই হবে—এমন মাথার দিব্যি দিয়েছে কেউ। প্রিটি সভয়ে খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ছোড়দি কাঁধের নিচে একটা বালিশ ঠিক ক'রে নিতে-নিতে বললেন,—উঃ কী ভীষণ মাথা-ধরা! প্রায়ই হয়—এমন কষ্ট পাই যে বলার নয়। চুপচাপ এখানে শুয়ে ছিলাম—কারু সঙ্গে কথা কইতেও ইচ্ছে করে না।

প্রিটি ত্বরিতে জবাব দিলে—আমি তাহ'লে যাই। আপনি ঘুমোন।

—না, না—ঘুমোবো কী? এখন ঘুমোলে সারা রাত আর চোখ বুজতে পারবো না।

—ঘুমই হচ্ছে মাথা-ধরার একমাত্র ওষুধ।

—এলে তো বাঁচতাম! কিন্তু এই এতক্ষণ ধ'রে সাধ্য-সাধনা করছি—কার ঘুম কোথায়? উঃ, সিঁড়ির আলোটা কী বিশ্রী লাগছে চোখে—দরজাটা একটু ভেজিয়ে দাও না।

প্রিটি শেষ চেষ্টা করলো—আমি বরং চ'লেই যাই। আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন—ঘুম না আসে তো একটা অ্যাসপিরিন খেয়ে দেখলে পারেন।

—কাজ নেই বাপু আমার অ্যাসপিরিন খেয়ে—এমনিতেই হার্ট যথেষ্ট উঈক আছে। তুমি এখানে একটু বোসো না, প্রিটি। দু'দিন বাদে চ'লেই তো যাবো, আর তো তোমাদের বিরক্ত করবো না।

অদূর ভবিষ্যতে ছোড়দি চ'লে যাবেন—খবরটা এতই শুভ যে আজ একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে প্রিটি তার দাম দিতে প্রস্তুত। তাই, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে ফিরে এসে—

চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ছোড়দি করলেন বারণ।

বললেন, এইখানেই বোসো প্রিটি—ব'লে হাত দিয়ে বালিশের পাশে একটুখানি জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

প্রিটি সসংকোচে সেখানেই বসলো। ছোড়দির একখানা হাত যেন দৈবাৎ তার হাতের উপর এসে পড়লো। বার দুই সেখানে একটু চাপ দিয়ে ছোড়দি বললেন, বাঃ, তোমার হাত ভারি নরম তো, প্রিটি—একবারে মেয়ের হাতের মতো। ব'লে নরমত্বটা পরখ করবার জন্যই আবার চাপ দিলেন।—কী ঠাণ্ডা তোমার হাতখানা, বরফের মতো। ব'লে সেই হাত কপালের উপর রাখলেন।—আমার মাথাটা একটু টিপে দাও না, প্রিটি। না—অত জোরে না—হ্যাঁ, এমনি। বে—শ; লক্ষ্মী ছেলে তুমি।

প্রিটি বলতে যাচ্ছিলো, লিলিকে ডেকে আনি—ও আমার চেয়ে ভালো পারবে। কিন্তু 'ল্' পর্যন্ত ব'লেই সে থেমে গেলো। পাছে ছোড়দি কিছু মনে করেন।

একটু পরে ছোড়দি ডাকলেন—প্রিটি।

প্রিটি সসম্মানে জবাব দিলে—বলুন।

—বলুন কী? ভক্তির অথই পাথার যে! জানো তো, অতিভক্তি কিসের লক্ষণ?

প্রিটি ঢোক গিললো।

কী মনে ক'রে ছোড়দি হঠাৎ হেসে উঠলেন।—প্রিটি, তোমার নামটি কিন্তু বেশ, প্রিটি।

অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে প্রিটি জবাব দিলে, সবাই তা-ই বলে।

—সব মেয়েরাই তা-ই বলে—না, প্রিটি? লজ্জা কোরো না—বলো না!

প্রিটির সমস্ত অন্তর-মন কুঁকড়ে এতটুকু হ'য়ে গেলো। ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, ছি, এ-সব কথা আপনি কী বলছেন, ছোড়দি!

—নাঃ, তুমি বেজায় লাজুক। কত বয়েস হয়েছে তোমার? উনিশ? যাক—এ-বয়সে একটু লজ্জা থাকাই ভালো। কিন্তু মেয়েরা যদি তা ব'লেই থাকে, এমন আর দোষের কথা কী? শুধু নামেই তো তুমি প্রিটি নও—চেহারাতেও প্রিটি। তুমি যে দেখতে বেশ ভালো তা তুমি জানো নিশ্চয়ই?

তারপর, প্রিটিকে নিরুত্তর দেখে:

সব মেয়েরাই এ-কথা বলে—না, প্রিটি?

প্রিটির ততক্ষণে হ'য়ে এসেছে। এই প্রসঙ্গ অবলম্বন ক'রে ছোড়দি যে কোথায় গিয়ে পৌঁছবেন, তা ভেবে তার শরীরের রক্ত বরফ হ'য়ে গেলো। ছোড়দি কী চালাক—আর কী খারাপ! একটা ছুতো ক'রে তাকে আটকে রেখে তার মুখ দিয়ে বের ক'রে নিতে চাচ্ছেন যে সে লিলিকে—প্রিটি ফাঁদে পা দিয়ে বসেছে, এখন আর এড়াতে পারবে না। এ-বাড়িতে আসা তার এই বোধহয় শেষ।

এতক্ষণ যা একটু ঘোর-কপট ছিলো, তা-ও ঘুচলো। ছোড়দি স্পষ্ট ভাষায় জিগেস করলেন, আচ্ছা প্রিটি, কোনো মেয়ে তোমার প্রেমে পড়েনি?

—না— এই একটি কথা বলতে গিয়ে প্রিটির গলা আটকে এলো।

—না! বলো কী? এমন সুন্দর চেহারা তোমার—না-প'ড়ে পারে?—দু' একজন নয়, নিশ্চয় অনেকেই পড়েছে—থাক, থাক, আমার কাছে না-ই বা বললে। যা লাজুক তুমি! এমনও হ'তে পারে যে তুমি তা জানো না। এমনও হ'তে পারে যে মেয়েদের মনের কথা জানবার ক্ষমতাই তোমার নেই। কিন্তু তুমি? তোমার নিজের মনের কথা তো জানো? তুমি কখনো পড়োনি কোনো মেয়ের প্রেমে?

প্রিটির নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এলো। তার ইচ্ছে হ'লো ছোড়দির পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ে চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে। যদি তাঁর একটু করুণা হয়। ইশ—একটু দয়া-মায়াও নেই ছোড়দির।

—বলো না, কার সঙ্গে? আবদারের সুরে ছোড়-দি বললেন ছোড়দি কী চালাক! তাকে মিষ্টি কথায় ভোলাতে চান।

—কারু সঙ্গে নয়। কথাটা ব'লে প্রিটি হাঁপাতে লাগলো।

—কারু সঙ্গে নয়? একদিনের জন্যেও না?...আচ্ছা প্রিটি, কোনো মেয়েকে চুমো খাওনি তুমি?

প্রিটি ভাবলে, কখনো তার জন্ম না-হ'লেই ভালো ছিলো।

এ-প্রশ্নের উত্তরে কী ক'রে সে 'না' বললে, তা সে নিজেই বুঝতে পারলো না।

—কক্ষনো না? হ'তেই পারে না।

পরের মুহূর্তেই আবার :

—পারবেই বা না কেন? ইচ্ছে হয়েছিলো, সাহস হয়নি, পারোনি না? বলো না, প্রিটি! চুমো খাওয়াতে দোষ কী? বিলেতে তো লোকে রাস্তায় চুমো খায়।... তুমি একেবারে বোকা—তাই ঘাবড়ে যাও। মেয়েরা মুখে অমন আপত্তি করেই—ওর নামই ইচ্ছে। সে-আপত্তি বুঝি কেউ মানে? তুমি কিচ্ছু জানো না দেখছি! ব'লে ছোড়-দি একখানা হাত কপালের উপর তুলে দিলেন।

—আচ্ছা প্রিটি, যদি কোনো মেয়ে মুখেও আপত্তি না করে, তাহ'লে তুমি পারো? যে ভিতু তুমি—নিশ্চয়ই পারবে না। আমি দশ টাকা বাজি রাখতে পারি—এসো তোমার সাহস পরীক্ষা করা যাক। ধরো, আমার কোনো আপত্তি নেই—পারবে আমাকে চুমো খেতে? ছোড়দির হাতখানা কপাল থেকে যেন লাফিয়ে উঠে প্রিটির গলায় এসে পড়লো।

প্রিটির সমস্ত শরীর কাঠ হ'য়ে এসেছিলো। যন্ত্রের মতো সে অমলার হাতখানা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সঙ্গে-সঙ্গে অমলা তড়াক ক'রে উঠে বসলো।—ভারি আস্পর্ধা তো তোমার! তুমি ভেবেছো নাকি যে সত্যি-সত্যি আমি তোমাকে—! সবার কাছে রং চড়িয়ে এ-কথা ব'লে বেড়াবে—না? খবরদার—! বেশ তো! বলো না—যাও! কেউ বিশ্বাস করবে কিনা! উল্টে তোমাকেই ঠেশে ধরবে। ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও এ-ঘর থেকে—না, যেয়ো না, শোনো, বোসো—থাক, না-বসলেও চলবে। শোনো, আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে তামাশা করছিলাম।

—আমারও তা-ই মনে হয়েছে।

—তোমারও তা-ই মনে হয়েছে, না? তামাশা করবার আর লোক নেই আমার—না? কী বেয়াদপি! আমি তোমার সঙ্গে তামাশা করবো? তামাশা! তামাশা কাকে

বলে, জানো ? সব নিয়েই তোমার ফাজলেমি ! যাও তুমি এখান থেকে—আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাইনে।

হতভম্ব হ'য়ে প্রিটি বেরিয়ে যাচ্ছিলো, অমলা হঠাৎ ছুটে এসে তার হাত ধ'রে বললে, যেয়ো না, প্রিটি। রাগ করলে আমার উপর ? সত্যি তুমি চমৎকার দেখতে ! ব'লে সে প্রিটির হাতখানা নিয়ে নিজের গলায় জড়াতে যাচ্ছিলো, প্রিটি জোর ক'রে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলে।

হঠাৎ অমলার তীক্ষ্ণ চীৎকারে সারা বাড়ি কেঁপে উঠলো। চৌকাঠের কাছে এসে প্রিটি বাধ্য হ'লো থমকে দাঁড়াতে।

ছুটে এলেন মা, দৌড়ে এলেন পিসিমা, আর কাঁপতে-কাঁপতে লিলি—তার বুকের উপর ঢেঁকির পাড় পড়ছে—কাঁপতে-কাঁপতে লিলি এলো।

অমলা তখন খাটের উপর লুটিয়ে আকুল হ'য়ে কাঁদছে।

—কী ? কী হয়েছে ?

অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে অমলা বললে, ঐ প্রিটি···ঐ ছেলেটা, মা—ও আমাকে—বাকি কথাটা বলতে অমলার লজ্জায় বাধলো।

রোদনে তিরস্কারে বিলাপে মিশে যে তুমুল সোর উঠলো প্রিটি তাতে একটি কথাও বলতে পারলো না। বললেই বা কে শুনতো, শুনলেই বা বিশ্বাস করতো কে ? যে-একজন করতো, তাকেও বলা হ'লো না।

লিলি সমস্ত রাত কাঁদলো, ইহজীবনে তাকে আর দেখবে না ব'লে নয়—তার চেয়েও বড়ো ও নিষ্ঠুর এক দুঃখে—সে-কথা কাউকে বলা যায় না, সে-কথা দুঃস্বপ্নেও মনে আনা অসম্ভব।

প্রিটি সমস্ত রাত রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো, ইহজীবনে ওকে আর দেখবে না ব'লে নয়—লিলি যে-কারণে শোক করবে, তা তাকে আর দেখতে পাবে না ব'লে নয়, সেই দুঃখে।

১৯২৯ 'অভিনয়, অভিনয় নয়'

আকাশে যখন সাত তারা ফুটলো

সকালবেলায় চিঠি পেলাম বজ্রধরের—ডাকযোগে। ও নাকি কী একটা বিষম সমস্যায় পড়েছে, অনেক ভেবে-চিন্তে কিছুতেই কোনো কূল-কিনারা ক'রে উঠতে পারছে না, আমার পরামর্শে ওর নিতান্ত প্রয়োজন, সুতরাং যদিচ স্বর্গের দেবতারা আশা করছেন যে ফাল্গুনের এই ঝিরঝিরে সকালবেলায়, যে-জানলা দিয়ে তাকালে কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত আভায় আকাশকে লাল ব'লে মনে হয়, সেই জানলার ধারে চেয়ার টেনে নিয়ে আমি নিম্নস্বরে সুইনবর্ন পড়বো—তবু আমাকে যেতে হবে সুদূর ভবানীপুর, বজ্রধরকে পরামর্শ দিতে, যে-বজ্রধর কী-একটা বিষম সমস্যায় প'ড়ে অনেক ভেবে-চিন্তে কিছুতেই কোনো কূল-কিনারা ক'রে উঠতে পারছে না।

কাজে-কাজেই আজকের মতো স্বর্গের দেবতাদের হতাশ করতে হ'লো। বজ্রধর আমার বন্ধু, এবং বন্ধুদের উপকারে আসাই যে আমার জীবনের 'মহান আদর্শ ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছি, এ-কথা আমার বন্ধুরাও যখন মানে, তখন আপনাদের মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু ভেবে অবাক হলাম—বজ্রধর কেন আমার পরামর্শ চাইবে। আমার পরামর্শ চাইবার মধ্যে কিছু আশ্চর্য নেই, কারো কাছে পরামর্শ যদি চাইতেই হয় তাহ'লে বাংলা দেশের সব লোকের মধ্যে আমার কাছেই চাওয়া উচিত--মানে বজ্রধরের উচিত। আশ্চর্য হচ্ছে এই যে বজ্রধরকে কেন পরামর্শ চাইতে হচ্ছে? ও অদ্যাবধি কখনো কারো কাছে যে-সব জিনিশ চায়নি, পরামর্শ তার মধ্যে প্রথম। কারণ, পরামর্শ চাইবার উপলক্ষ্য জীবনে ওর কখনো হয়নি, কারণ ও কখনো কোনো সমস্যায় পড়েনি, কারণ জীবনে ও কখনো কোনো অন্যায় করেনি। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীতে ন্যায় আর অন্যায় ব'লে দুটো জিনিশ আছে, এবং ন্যায় থেকে অন্যায়কে চিনে নিতে ওর মুহূর্তকাল ভাবতে হয় না, এবং চিরকাল ও অন্যায়কে—অন্য-কোনো কারণে নয়—ন্যায় নয় বলেই বর্জন ক'রে এসেছে।

সুকুমার অবশ্যি বলে, এটা আর কিছুই নয়, শুধু ওর sense of humour-এর অভাব। কিন্তু সুকুমার এমন অনেক কথাই বলে, এবং সত্যি বলতে কী, ওর অনেক কথাই আমি বিশ্বাস করিনে। যদিও ওর সব কথা শুনেই আমি হাসি। আমাদের এক বন্ধু আছেন, যিনি সুকুমারকে বলেন রসিকতার ফেরিওলা, কিন্তু বজ্রধরের মতে ওগুলো রসিকতাই নয়। বাজে কথা বজ্রধর পছন্দ করে না। বাজে কথা হচ্ছে—ওর মতে—দুর্বল চরিত্রের লক্ষণ। যে-কর্তব্য দিনের সূর্যের মতো

জাজ্বল্যমান, সেই কর্তব্যকে দেখেও না-চেনবার ভাণ করবার স্ত্রৈণ কৌশল। যে-পুরুষাণুরা আত্ম-বিরোধে জর্জর, তাদের আশ্রয়-গুহা। বজ্রধরের মনে কখনো কোনো বিরোধ উপস্থিত হয় না। যাদের হয়, তাদের ও অপ্রশংসার চোখে দেখে। এই তো সেদিন সুরেশ লাহিড়ীর আচরণকে ও বাড়াবাড়ি বলছিলো। অঞ্জলি গাঙ্গুলির সঙ্গে লাহিড়ীর বিয়ে ঠিক হ'য়ে আছে ছ'মাস। বিয়ে হবার আগেই ওরা দু'জনে বেরিয়েছে ভারত ভ্রমণে—সুকুমারের ভাষায়, honey-হীন হনিমুন উপভোগ করতে। বজ্রধর রক্তমুখে জবাব দিলে, 'Honey-র কিছুমাত্র অভাব তো হবেই না, উপরন্তু সামাজিক হানিও ঘটবে।'

আমি বলেছিলাম, 'কিন্তু বিয়ে তো ওদের হবেই।'

'সেইজন্যেই তো বলছি। বিয়ের পর ভারত-ভ্রমণ কেন—মহাভারত পরিভ্রমণ করলেও ওদের মারতো কে? এটাই হচ্ছে অসংযম, এবং অসংযম অন্যায়। তাছাড়া দেখতেও অশোভন।'

সুকুমার বলেছিলো, 'ওদের ইচ্ছে যাবে—তাতে কার কী।'

বজ্রধর কঠিন কণ্ঠে বলেছিলো, 'তুমি কেন, সমস্ত পৃথিবী যদি আজ একযোগে অন্যায় করতে আরম্ভ করে, তবু ন্যায় ন্যায়ই থাকবে, এবং অন্যায় অন্যায়।'

স্পষ্ট, দৃঢ়, পরিষ্কার বিশ্বাস, কখনো ঘোলাটে হয় না, টলমলায় না—অকুণ্ঠিত নিঃসংশয়ে বজ্রধর তার একমাত্র কর্তব্য করে· কর্তব্য সর্বদাই একমাত্র। সেই বজ্রধরের আজ হ'লো কী? এমন-কী ব্যাপার হ'লো যাতে ওর একমাত্র কর্তব্যকে চিনতে ওর দেরি হচ্ছে? এমন-কী সমস্যা ওর জীবনে আসতে পারে, দিনের সূর্যের মতো জাজ্বল্যমান সত্যকে দিয়ে যার সমাধান চক্ষের পলকে হ'য়ে না যায়। এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলুম না যে ও কোনো খারাপ কাজ করেছে। তবে কি অন্যের পাপ দৈবচক্রে ওর ঘাড়ে এসে পড়েছে? ও কি কোনো চোরাই মাল কিনে ঠেকেছে? না, কেউ মানুষ খুন ক'রে ওর ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে? কিম্বা হয়তো —এটাই সম্ভব মনে হ'লো—কোনো বিষম bore সিন্দবাদের মতো ওর কাঁধে চ'ড়ে বসেছে, ও কিছুতেই তাকে স্পষ্ট বাংলায় (বা ইংরেজিতে) কাঁধ থেকে নামতে বলতে পারছে না।

এবম্বিধ জল্পনা করতে-করতে কেশ-বিন্যাস করছি, এমন সময় ঘরে ঢুকলো—কে আর? সুকুমার, সুকুমার সেন। সুকুমার সেন ছাড়া বাংলাদেশে এমন কে আর আছে জুতোর শব্দ না-ক'রে যে ঘরে ঢুকতে পারে, বাংলা দেশে কে এমন আছে, যার আগমনে এ মুহূর্তে আমি এর চেয়েও খুশি হতাম?

এই গল্প যাঁরা পড়বেন তাঁদের মধ্যে সুকুমারকে কে-ই বা না চেনেন—মানে, এই গল্প যাঁদের ভালো লাগবে (আর তাঁদের নিয়েই তো কথা !) তাঁদের মধ্যে। আপনি বুঝি সুকুমারকে দেখেননি ? তাহ'লে ওর চেহারার বর্ণনা শুনে নিশ্চয়ই হতাশ হবেন, কারণ ওর সৌন্দর্য বলবার নয়, দেখবার। আমি বলবো সুকুমার লম্বা নয়, ফর্শা নয়, কিন্তু যদি কখনো আপনার ওকে দেখবার সৌভাগ্য হয়, তাহ'লে বারো সেকেণ্ডের জন্য ট্রেন ফেল করার পর ওর মুখ মনে আনবার চেষ্টা করবেন—পৃথিবীটাকে টুকরো-টুকরো ক'রে ভেঙে ফেলবার ভয়ংকর লিপ্সা আর হবে না। হ্যাঁ, ওর রং কালো, কিন্তু ওর চুল আরো অনেক কালো—কালো আর ঘন আর পরিচ্ছন্ন—দেখলে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। এবং ওর চুল যত কালো, ওর দাঁত তত শাদা—সার-বাঁধা, সমান—ও যতবার হাসবে, ততবার আপনার চোখে একটা শাদা আভা খেলে যাবে। মুচকি-হাসাটা ওর বিশেষত্ব—ঠোঁট দুটির চার কিনারে যে-বাঁকা রেখাগুলো লুকোচুরি খেলে, তা দেখে শ্রীমতী অমিতা চন্দ সাতদিন আয়নায় মুখ দেখেনি ব'লে শহরে জনরব। হ্যাঁ, এর ফলে যদি আমাকে মুন্সেফও হ'তে হয়, তবু আমি বলবো, সুকুমার সেনের মতো অমন মিষ্টি ক'রে মুচকি হাসতে কোনো মেয়েকে আমি দেখিনি।

বললাম, 'বসবার কষ্টটা কোরো না, সুকুমার—এখুনি আবার উঠতে হবে।'

'আমি তোমার সঙ্গে কোথায় যাবো ?'

'বজ্রধরের বাড়ি।'

'গিয়ে তো দেখবো ও সকালবেলার প্রথম চা খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'আশা করি তা দেখবে না।' বজ্রধরের চিঠিটা ওকে পড়তে দিলাম।

'আমি বলতে পারি ওর কী হয়েছে।'

'প্রেমে পড়েছে ?'

'ঠিক বলেছো। তবে ও নয়, ওর সঙ্গে এক ফোড়া। ও মনে-মনে ভাবছে, ফোড়াটা এত কষ্ট ক'রে আমার গায়ে উঠলো, এখন আমি যদি ওকে ফাটিয়ে ফেলি সেটা কি উচিত হবে ? ফোড়াটাই বা মনে করবে কী ?'

'নাও—ওঠো এবার।'

'চলো, বজ্রধরের ফোড়া ফাটিয়ে আসি।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে আমি বললুম, 'কিংবা ফাঁড়া কাটিয়ে।'

২

জানলার পরদাগুলো সরিয়ে দিয়ে জ্ঞানদা পাখাটা খুলে দিতে যাচ্ছিলো। বজ্রধর বললে, 'দরকার নেই। আর-কোনো দরকার নেই, জ্ঞানদা।'

জ্ঞানদা চ'লে গেলে বজ্রধর বসু বলতে শুরু করলো :

'সুকুমার এসে ভালোই করেছো। জানোই তো, humorous vein-টেইন আমার বড়ো-একটা নেই, এবং সেইজন্যই বোধহয়—তোমার কাছে যা নিতান্ত সাধারণ মনে হবে, সুকুমার—তারই চাপে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। অবশ্যি তোমাকে দিয়েই আমার দরকার, বিভূতি, কারণ মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার বিস্তৃত ও অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা থেকে তুমি আমাকে সাহায্য করতে না-পারলে আশ্চর্যই হবো। থামো, সুকুমার। জানি, তুমি যা বলতে যাচ্ছিলে, সেটা খুব witty, কিন্তু আমাকে বাধা দিলে আমি গুছিয়ে বলতে পারবো না। সুতরাং, আপাতত মন দিয়ে শোনো। জ্যাম? এই যে।

'মাস ছয় হ'লো একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে—তোমরা বোধহয় তাকে আগে থেকেই চিনতে—শর্বরী রায়। অমিতা চন্দর জন্মদিনের পার্টিতে ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। তোমাদের বলা বাহুল্য যে ১৯২৬ সন থেকে যে-মার্জিত উচ্ছৃঙ্খলতা দেশের কলচর্ড মহলের ফ্যাশান হয়েছে, তা আমাকে কখনোই আকর্ষণ করেনি। তোমার সঙ্গে মতদ্বৈধ হবে, বিভূতি, কিন্তু আমার কাছে সব মেয়েই—কী বলা যায়?—সব মেয়েই স্ত্রীলোক নয়।

'কিন্তু শর্বরী রায়ের অন্ধকার চুল দেখে আমার অমাবস্যার অজস্র তারার কথা মনে প'ড়ে গেলো। কৃষ্ণকেশী শর্বরীকে প্রথম যখন দেখলাম সেই কালো চুলের ঘন অরণ্য ছাড়া আর-কিছুই দেখতে পেলাম না।

'পার্টি ভেঙে যাওয়ার পরও আমি ঘোরাফেরা করছি দেখে অমিতা, ফুরফুরে অমিতা আমার কাছে এসে বললে, "শর্বরী রায় সম্বন্ধে আমি যা জানি, তা তোমাকে বললে কী দেবে?"

'আমি ওর হাত ধ'রে বললাম, "এখানে নয়। চলো বাইরে, লন-এ।"

'অমিতার সঙ্গে লন-এ আধঘণ্টা পাইচারি করার পর আমি বাড়ি ফিরলাম। সে-রাতে এই মধুর চিন্তা নিয়ে বিছানায় গেলাম যে শর্বরী রায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘনীভূত করবার একটা সুযোগ মিলেছে।

'সুযোগ হচ্ছে এই। ষোলো বছর বয়েসে, মানে. চার বছর আগে শর্বরী প্রথম প্রেমে পড়ে। ছেলেটি নিতান্তই উপন্যাসের নায়ক—ছবি-আঁকে-বাঁশি-বাজায় গোছের। নামও তেমনি—মলয়। চেহারাও সেই রকম—পাৎলা-লম্বা-ফর্শা-বড়ো-চুল। না, চেহারার কথা অমিতা বলেনি; আমি ওকে—মলয়কে—চিনতাম। আরো চা, সুকুমার?

'অমিতা বললো ওদের সেই প্রেম বছরখানেক ছিলো। তারপর—তারপর কী যে হ'লো অমিতা ঠিক বলতে পারলে না—কিছু-একটা হ'লো আরকি, যাতে প্রেম ভাঙলো। বোধহয় ঈর্ষা, ছেলেবয়সে ঈর্ষা যেমন কথায়-কথায় ফোঁশ ক'রে ফণা তোলে, এমন আর কখনও না - কি বা হয়তো শর্বরী ওকে ছোটো ক'রে চুল ছাঁটতে অনুরোধ করেছিলো। সে যা-ই হোক, সেই বিচ্ছেদের পর মলয় একটা চাকরি নিয়ে আহমেদাবাদ চ'লে যায়—তারপর তাকে আর নাকি কলকাতায় দেখা যায়নি।

'তারপর—অমিতা বললো—তারপর শর্বরীর জীবনেও আর কারো আবির্ভাব হয়নি। দুষ্টু অমিতা আরো বললো, "এর পরে তোমার পালা।"

'পরের দিন সকালে আমি টেলিফোনে শর্বরীকে ডাকলুম। হ্যাঁ, সাহস হ'লো। হবে না কেন? মলয়ের বন্ধু ব'লে নিজের পরিচয় দিতে ক'টা লোক পারে?

'আমার গলা শুনে আমাকে চিনতে পারলো না—পারবার কথাও নয়। বললাম, "বজ্রধর—বজ্রধর বসু আপনার সঙ্গে কথা বলছে। কালকে—"

' "হ্যাঁ, কালকেই আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লো।" ইংরেজিতে ঐ কণ্ঠস্বরকে বলে icy।

'বরফের প্রভাবে জ'মে যাবার আগেই বললাম, "Excuse me, পরে অমিতার কাছে শুনলাম, মলয়ের সঙ্গে আপনার --ও কী?"

' "কিছু নয়। কী শুনলেন?"

' "না, মলয়কে আমি চিনতাম কিনা—ও আমার বন্ধু ছিলো, তাই--"

' "আপনি মলয়কে চিনতেন?"

"চিনতাম ব'লেই আপনাকে বিরক্ত করলাম। আচ্ছা—"

' "না—না--এই একটু। আপনি দয়া ক'রে একবার আমার এখানে আসবেন? টেলিফোনে বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। আসবেন?" আরো চা, বিভূতি?

'কালিঘাট ট্র্যাম-ডিপো ছাড়িয়ে গ্রীক গির্জার পুবদিকে ছোটো, একতলা, লাল একটি বাড়ি চেনো, সুকুমার? সামনে ফুলের বাগান আছে। সেই বাড়িতে গেলাম—বিকেলে—সেইদিনই। সেই থেকে প্রায়ই যাচ্ছি—রোজই বলতে পারো—আজ ছ'মাস হ'লো।

'সে বাড়িতে থাকে শর্বরী আর তার ভাই;—ভাইটি বয়েসে বড়ো, কিন্তু দেখতে ছোটো মনে হয়। ভাইটিও খুব ইন্টরেসটিং, কিন্তু সম্প্রতি তার সঙ্গে মুখ চেনা ক'রেই বিদায় নিতে হচ্ছে। পাখাটা খুলে দেবো?

'মলয়কে অবলম্বন ক'রে আলাপ আরম্ভ করলাম। জমলো। এমন জমলো যে সেদিন শর্বরীর জীবনচরিত লেখবার মতো তথ্য নিয়ে ফিরে এলাম।

'মাসান্তে অপূর্ব আনন্দের সঙ্গে আবিষ্কার করা গেলো যে আমি শর্বরীর প্রেমে পড়েছি, এবং আর যা-ই হোক, শর্বরীর আমাকে ভালো লাগে। বর্তমানে ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে আমি ওকে বিয়ে করবার সংকল্প করেছি, কিন্তু কিছুতেই এ-কথা ওকে বলতে পারছি না।'

সুকুমার প্রশ্ন করলে, 'বাধা ?'

'বাধা মলয়। মলয়ের নামটা সিঁড়ির মতো ব্যবহার করবার উদ্দেশ্য আমার ছিলো, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেই সিঁড়ি ছাড়িয়ে ওঠা আমার হবে না। মলয় আমাদের দু'জনকে পেয়ে বসেছে। বুঝতে পারছো ? এ-অবস্থায় এমন-কিছু আমি ভাবতে পারছি না, যা করলে নিষ্ঠুর বা কুৎসিত হবে না। সেইজন্যই তোমাদের পরামর্শ চাইছি। পাখাটা খুলেই দিই।

'হ্যাঁ, মলয়। আজও মলয়, কালও মলয়। মলয়কে ও ভুলেই গিয়েছিলো, কিন্তু আমি মলয়কে ফিরিয়ে এনেছি। শর্বরীর জীবনে ওর ষোলো বছরের প্রেম, ওর এক বছরের প্রেম, ওর প্রথম প্রেম ফিরে এসেছে। সেইজন্যই ওর কাছে আমার এত খাতির। আমিও সুবিধে পেয়ে ওর এই কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়েছি—মলয়ের সম্বন্ধে আমার স্বল্প অভিজ্ঞতাকে রং চড়িয়ে নানা ভাবে ওর কাছে উপস্থিত করেছি, ও আমাকে আবার আসতে বলবে, আমার জন্য অন্যান্য এনগেজমেণ্ট ভাঙবে, এই আশায়, এই লোভে যা বিশ্বাস করি না, তা-ই বলেছি—মলয়ের চোখ ছিলো শেলির মতো, ছবির চর্চা করলে ও ইণ্ডিয়ান আর্টের মোড় ফেরাতে পারতো, মলয়ের প্রেম অদৃশ্য ডানার মতো ঢেকে রাখতো, জড়িয়ে রাখতো ওকে—পৃথিবীর কোনো মলিনতা ওকে স্পর্শ করতে পারতো না। বলেছি, মলয় এ-সব বিষয়ে কথা বলতো কম, কিন্তু একদিন—এক রাত্তিরে বলেছিলো, কোনো নাম করেনি, শুধু বলেছিলো, "তাকে প্রথম যখন দেখেছিলাম, তার ঘন কালো চুলের অরণ্য ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি।"

'এমনি ক'রে যে-মলয়কে আমি রচনা করেছি, শর্বরী তার প্রেমে প'ড়ে গেছে, সেই মলয়কে এখন আমি কী ক'রে পথ থেকে সরাই ? এখন যে-কোনো বিষয়েই কথা উঠুক না, ঘুরে ফিরে আসতেই হবে মলয়ের কাছে। যে-কোনো উপলক্ষ্যে মলয় কী করতো আর কী ভাবতো, মলয় কবে কী বলেছিলো, কোন চিঠিতে কী লিখেছিলো—তারই আলোচনা। স্মৃতিশক্তির উপর অত্যাচার ক'রে শর্বরী অনেক খুঁটিনাটি বার করেছে, কিন্তু হাজার হোক, এক বছরেরই তো আলাপ! একই গল্প ন'শো এগারো

বার শুনলাম, এবং ন'শো এগারো বার সায় দিলাম। এখন এমন হয়েছে যে আগে থেকেই বুঝতে পারি, মলয়ের জীবনকাহিনী থেকে কোন প্যারাগ্রাফ আসছে। আপত্তি করতে পারি না: ওকে যে দেখছি, ওর কথা শুনছি—এই আমার লাভ। এদিকে বিয়ের কথা তোলাও অসম্ভব—কোনো ভদ্রলোকের পক্ষেই অসম্ভব। যে-মলয়কে আমিই তৈরি করলাম, তার এমন অপমান করি কী ক'রে? তাহ'লে শর্বরী হয়তো আমার আর মুখ দেখবে না। ও যে আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালো—হ্যাঁ, ভালোইবাসে বলতে হবে, তা শুধু আমি মলয়কে শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি ব'লেই। অথচ শর্বরীকে—কৃষ্ণকেশী শর্বরীকে আমি ভালোবেসেছি, সত্যি ভালোবেসেছি; মণিকার সঙ্গে ব্যাপারটা যে আসলে ভালোবাসাই নয়, এখন তা বুঝতে পারছি।

'মণিকা বলতে মনে পড়লো। সেটা আবার শর্বরী কী ক'রে যেন জেনেছে। একদিন—অনেকদিন আগে—ওর সঙ্গে আলাপের প্রথম অবস্থায়, শর্বরী আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে:

"মণিকাকে তুমি চিনতে না?"

'প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে গেলাম। জানোই তো সুকুমার, আমার উপস্থিতবুদ্ধি তোমার মতো ধারালো নয়। বোধহয় একটু লাল হ'য়েও উঠেছিলাম। আমতা-আমতা ক'রে যে-জবাব দিয়েছিলাম, সেটার বিশেষ-কোনো মানে হয় না।

'এর পরে মাঝে-মাঝে ও মণিকার কথা শুনতে চাইতো, আমি চুপ ক'রে থাকতাম। আমার একটু ভয়ই হয়েছিলো, কিন্তু শিগগিরই ও মণিকাকে ভুলে' গেলো। বোধ হয় ও বুঝতে পেরেছে যে ওটা আসলে কিছু নয়, নইলে মণিকার প্রসঙ্গ আমার কাছে অপ্রীতিকর হবে কেন? এখন মুশকিল হয়েছে মলয়কে নিয়ে। আচ্ছা বিভূতি, বলো তো, তুমি এ অবস্থায় পড়লে কী করতে?'

জবাব দিলে সুকুমার, 'আমি হ'লে শর্বরীকে চিঠি লিখতাম, "কাল রাত্রে ঈশ্বর এসে আমাকে ব'লে গেলেন যে তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো, তাহ'লে তোমার জন্য তিনি অনন্ত নরকবাসের ব্যবস্থা করবেন। অনন্ত নরকবাসের চাইতে কি আমি ভালো নই?" '

সুকুমারের কথাটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে বজ্রধর আমার মুখের দিকে তাকালো।

আমি বললাম, 'উপস্থিত মুহূর্তে আমি কিছুই বলতে পারবো না, বজ্রধর। আমাকে ভাবতে সময় দাও।'

সুকুমার বললে, 'আমি এক ভদ্রলোককে জানতাম, যিনি বলতেন যে পৃথিবীর

সবচেয়ে কঠিন সমস্যার মীমাংসা করতে তাঁর লাগে পনেরো মিনিট, আর ছোটো-খাটো ঘরোয়া সমস্যাগুলো দেড় থেকে দু' মিনিটের মধ্যে হ'য়ে যায়। সেই ভদ্রলোককে এখন পেলে হ'তো।'

বজ্রধরের মুখ দিয়ে যে-শব্দটা বেরুলো সেটা অত্যন্ত শ্রুতিকটু।

৩

সুকুমার মৃদুকণ্ঠে ড্রাইভরকে বললে, 'এণ্টালি।'

এই ভর-দুপুরে এণ্টালিতে সুকুমার সেনের কী প্রয়োজন বা আকর্ষণ থাকতে পারে, এ-প্রশ্ন করায় ও শুধু একবার ওর ফোলা-ফোলা চুলের উপর আঙুল বুলোলো। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা গেলো। সংক্ষিপ্ত জবাব এলো, 'অমিতার কাছে।'

'সেটা তুমি না-বলতেই বুঝেছিলাম, কিন্তু—'

'ব্যস্ত হচ্ছো কেন? একটু পরে তো প্রত্যক্ষই করবে।'

করলাম প্রত্যক্ষ। অমিতা চন্দ তার ঠাণ্ডা, আধো-অন্ধকার ঘরে ব'সে পীসবোর্ডের উপর নানারঙের কাগজের টুকরো আঠা দিয়ে লাগিয়ে-লাগিয়ে একটা বিচিত্র মনুষ্যমূর্তি বানাবার দুরূহ এবং প্রশংসনীয় চেষ্টা করছিলো। স্নানান্তে তার গায়ে একটা হলদের উপর কালো ছোপ-বসানো ড্রেসিং গাউন, খোলা গলায় শাড়ির লাল-পাড় আঁচলটা চাদরের মতো ক'রে জড়ানো; চুলগুলো দু' ভাগ হ'য়ে কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপর এসে লোটাচ্ছে।

সুকুমার ঢুকেই বললো, 'তোমাকে চিতা-বাঘের মতো দেখাচ্ছে।'

'খিদেও পেয়েছে চিতা-বাঘের মতোই। খেয়ে আসবো?'

'অনেকদিন পর কোনো মেয়েকে দেখে এইমাত্র মুগ্ধ হওয়া গেছে—তাই তোমার এ-অভদ্রতা ক্ষমা করলাম। খেতে আমাদেরও হবে। এবং সে-অনুষ্ঠানটা যাতে যথাশীঘ্র সম্পাদিত হ'তে পারে, সে-জন্য তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করছি। পাঁচ মিনিট।'

'তুমি জানো, সুকুমার, আমি এই অসময়ে কিছুতেই তোমাদের খেতে বলবো না। বোহিমিয়ানিজম-এর দিন গেছে। পৃথিবীর সব চমৎকার ফ্যাশনের যা হয়, ওরও তা-ই হয়েছে;—কয়েকজন লোক দায়ে প'ড়ে সেটা শুরু করে, পরে সবাই তাদের অনুকরণ ক'রে জিনিশটাকে প্রেমে পড়ার মতোই মামুলি ক'রে তোলে। আচ্ছা, আজকালকার সাহিত্যিকরা নাকি প্রেমে পড়ার চল তুলে দিচ্ছেন? ও নাকি

ঘোরতর সেকেলে ব্যাপার। কী উপায় করি, বলো তো? সেকেলে হ'তে আমার মন কিছুতেই সরবে না, অথচ—'

'তোমার কিছু ভয় নেই, নারী। সাহিত্যিকদের কাঁচকলা দেখিয়ে আরো দু'জন লোক হৃদয়ের চর্চায় নিযুক্ত। সুতরাং সেকেলে যদি হ'তেই হয়, তুমি—মানে, তোমরা—নিতান্ত নিঃসঙ্গ হবে না।'

'আমাদের জানাশোনার মধ্যে আর কে—? দাঁড়াও, ভেবে দেখছি।—ও—'

'বজ্রধর তো বিয়ে করবার জন্য খেপে গেছে।'

'বেশ তো—করুক না।'

'এ-কথা ভেবে ভুল করছো, অমিতা, যে তোমার অনুমতির জন্যই ও অপেক্ষা করছে। কেননা, বজ্রধর যাকে বিয়ে করবে ব'লে ভাবছে, সে তুমি নও।'

'না-হ'লেও তার হ'য়ে আমি অনুমতি দিতে পারি। তোমরা পুরুষরা এ-কথা কেন সর্বদা ধ'রে নাও যে মেয়েদের মনে তোমাদের মতো কোনো আবেগ হ'তে পারে না?'

'হয়েছে নাকি আবেগ? সত্যি? জানলে কী ক'রে?'

'কী ক'রে আবার! যেমন ক'রে সবাই জানে। আজ থেকে জানি? ওদের তখন পরিচয় হয়েছে মাত্র। শর্বরী একদিন এসে এটা-ওটা আলাপ করতে লাগলো। বয়স্ক লোকের এই লাজুক ভাবটা আমার বরদাস্ত হয় না। মনে-মনে আমি সেই কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ শর্বরীর "টেনিসনের আগে পোয়েট-লরিয়েট কে ছিলো?" প্রশ্নের উত্তরে আমি ব'লে ফেললাম, "হ্যাঁ, এর আগে মণিকা ছিলো, তা সে চুকে-বুকে ভূত হয়েছে। এর পরে তোমার পালা।" শর্বরী মোটেও না-বোঝবার কি অখুশি হবার ভাণ করলো না। তারপর সাহিত্যের বদলে আমরা যে-জিনিশের চর্চা করলাম, আজকালকার সাহিত্যে তা অর্চনীয়।'

'পালা-বদল করবার খুব গরজ দেখালো নাকি শর্বরী?'

'পালা-বদল মানেই তো মালা-বদল? কিন্তু বজ্রধর তোমাকে পাঠিয়েছে কেন? নিজে এলেই পারতো।'

'বজ্রধর আমাকে পাঠায়নি। না—সত্যি।'

'আমি তোমাকে শুধু একটি খবর দেবো—সে-খবর মূল্যবান। শর্বরী সেদিন মোটরে ওঠবার মুখে মুখ ফিরিয়ে আমাকে জিগেস করলে, "মণিকা কে, জানো?"—নাও এবার, তোমাদের মতো আমি সকাল সাতটা থেকে এগারোটার মধ্যে চারবার চা খাইনে। আর রূপকথার রাজকন্যাও আমি নই যে আমার খিদে পাবে না। তুমি

যদি কখনো কোনো বই লেখো, সুকুমার, আশা করি তার নায়িকার আহার-বর্ণনা সবিস্তারে করতে ভুলবে না।'

'নিশ্চয়ই ভুলবো, কারণ জীবমাত্রকেই যে আহার করতে হয়, এ-কথা সবাই জানে।'

৪

বাইরে এসে সুকুমার বললে, 'গর্বিত হও, বিভূতি—সুকুমার সেন এ-বেলা তোমার সঙ্গে খাবে।'

বেলা তখন দুপুর ছাড়িয়ে গেছে। ছোটো-ছোটো বাতাসে সার্কুলর রোডে ধুলোর ঘূর্ণি উড়ছে। সকালবেলাটা বসন্ত হ'লেও মধ্যাহ্ন গ্রীষ্মের। দিনের সঙ্গে-সঙ্গে আমার মেজাজও গরম হচ্ছিলো, তাই আমি চুপ ক'রে রইলাম। বিশ্রী কথা বলার চাইতে চুপ ক'রে থাকা ভালো।

এলো বিকেল—লম্বা ছায়া ফেলে, ঠাণ্ডা হাওয়া ছড়িয়ে। চায়ের পর সুকুমার বললে, 'চলো শর্বরীর কাছে।'

আমি (আশা করি) দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, 'একদিনের পক্ষে যথেষ্ট ঘোরা হয়েছে। এখন আর কেউ আমাকে ঘরের বার করতে পারবে না।'

কিন্তু সুকুমার পারলো। সুকুমার কী না পারে? যদিও শর্বরীকে চিনি না, যদিও সন্ধ্যায় আমি অতিথি আশা করছিলাম—তবু।

বজ্রধর-বর্ণিত লাল একতলা বাড়ির ফটকে সুকুমার নামলো। আমি গাড়িতে ব'সে অপেক্ষা করলাম। ব'সে ভাবতে লাগলাম, হাতের উপর চিবুক, উরুর উপর কনুই, পায়ের উপর পা রেখে একটি মেয়ে ব'সে আছে—তার ঘন চুলের কালো অরণ্য দেখে অমাবস্যার তারার কথা মনে পড়ে—ব'সে ব'সে ভাবছে, কখন আসবে বজ্রধর, এসে সেই ওর একটি মরা বছরকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে।

মনটা আর-একটু হলেই করুণ কোমল হ'য়ে উঠতো, ভাগ্যিশ সেই মুহূর্তে অতিশয় মন্থর পদক্ষেপে সুকুমারকে বাগান অতিক্রম করতে দেখা গেলো।

—'কী হে, এত শিগগির এলে?

সুকুমার ধপ ক'রে আমার পাশে ব'সে প'ড়ে এমন আরামের নিশ্বাস ছাড়লো, যা শুনলে মন ভালো হয়।

'—পদ্মপুকুর।'

'এখন আবার বজ্রধরের কাছে? তোমার আজ হয়েছে কী?

'ওর বিয়ের খবরটা ওকে দিয়ে আসা যাক।'

'শুনি?'

'শোনো। শর্বরী অবশ্যি বুঝতে পারেনি, আমি ঐ জন্যেই এসেছি। প্রসঙ্গক্রমে কী ক'রে আসল কথা উত্থাপন করতে হয়, তা আমি জানি। শর্বরী—বেচারার অবস্থা কাহিল—বজ্রধরের নাম করা মাত্র সেটা লুফে নিলে। অন্য-কোনো বিষয়ে আমি চেষ্টা করেছিলাম—কথা উঠতেই দিলো না। পরে বললে, "কোনো আশা দেখছি না সুকুমার। ও এত ভালো, এমন unsophisticated! আজকালকার ছেলেদের মতো—তোমার মতো—cynicism-এর বিশ্রী ভাণ নেই, একেবারে নিরহংকার, নিরলংকার, নির্মল। ওর অমন উৎকট কটমট নাম কে রেখেছিলো? ওর নাম অমল হ'লে মানাতো, মনে-মনে আমি ওকে অমল ব'লে ভাবি।"

' "অমলবাবুকে হিংসে হচ্ছে, শর্বরী।

' "ঈশ্বর আমাদেরও একটি নির্মল হৃদয় দিয়েছিলেন, সুকুমার। আমরা নানা আঁকিবুঁকি কেটে সেটা নষ্ট ক'রে ফেলেছি। বজ্রধর তা করেনি। তার পবিত্রতা আমাকে—হ্যাঁ, পীড়াই দেয়। জানো, মণিকাকে ও ভুলতে পারেনি। আমি ভেবেছিলাম—অমিতা আমাকে তা-ই বুঝতে দিয়েছিলো—কিন্তু ভাগ্যিশ কিছু বলিনি—ছী-ছি, কী লজ্জাই পেতাম তাহ'লে! মণিকার নাম করতেই ওর মুখে রক্ত উঠে আসে, একেবারে বোবা ব'নে যায়। সেইজন্যই মলয়—মলয় সে-সময়ে ওর বন্ধু ছিলো—মলয়ের উপরও ওর শ্রদ্ধার সীমা নেই। ও ভাবছে যে ও যেমন মণিকাকে, আমিও তেমনি মলয়কে—কিন্তু আমি যে নানারকম আঁকিবুঁকি কেটে আমার হৃদয়কে নষ্ট ক'রে ফেলেছি, তা তো আর ও জানে না। ও জানে না, ও যখন আমার সঙ্গে মলয়ের বিষয়ে আলাপ করে, আমি কত ক্লান্ত হই, কত চেষ্টায় হাই চাপি। অবশ্যি ওকে খুশি করবার জন্য আমিও উৎসাহ দেখাই, এমনকি, এক ভাঙা বাক্স থেকে মলয়ের চিঠিগুলোও টেনে বা'র করেছি। আমি জানি ও আমার কাছে কী আশা করে; ওর সেই আশা পূরণ করবার জন্য আমি যখন-তখন মলয়ের কথা তুলি—মলয়-সম্বন্ধে করুণ হবার ভাণ করি—এত কষ্ট করি শুধু ওর শ্রদ্ধা অর্জন করবার জন্য—কিন্তু মন কি শুধু শ্রদ্ধাই চায়! প্রথমে খেলাচ্ছলে শুরু করেছিলাম, কিন্তু এখন এই হ'য়ে উঠেছে সব। এখন আর ওর মোহ ভাঙা সম্ভব নয়। সে বড়ো বেশি নিষ্ঠুর হবে, সুকুমার। আমার কেমন ক্লান্ত লাগছে—বজ্রধর আমাকে খুবই ভালোবাসতে পারতো, কিন্তু ওর হৃদয় এত পবিত্র কেন? মণিকা—" এই যে, এলাম।'

'ব্যাপার ভারি মজার হে। বজ্রধরটা কী বোকা!'

'বোকা নয় হে, ভালো, বড়ো বেশি ভালো। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে ও যদি শর্বরীকে বিয়ে ক'রে না-ফেলে, তাহ'লে ওকে বোকা ব'লেই সন্দেহ করবো।'

৫

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন যে ওদের বিয়ে হ'লো না, সে-কথা—অসংখ্য আঁকিবুঁকি কেটে হৃদয়কে যারা নষ্ট ক'রে ফেলেছে, কী ক'রে তাদের বোঝানো যায়? একমাস গেলো; —সুকুমারের ভবিষ্যদ্বাণী আংশিকরূপে সফল হ'লো—শর্বরী স্বগৃহ পরিত্যাগ করলো, কিন্তু পদ্মপুকুরের সিঁড়িতে পদ্ম ফুটলো না—গ্রীক গির্জার পিছনের ছোটো লাল বাড়িটির শাদা ফটক বন্ধ হ'লো, বন্ধ হ'লো সবুজ শেডের নিচে সবুজ জানলার পাট—আমাদের সকলকে তাক লাগিয়ে শর্বরী এমন-একটা কাজ করলে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি হ'লে যা মানাতো। শর্বরী ভাইকে নিয়ে মুসৌরি চ'লে গেলো—আসন্ন গ্রীষ্মটা ওখানেই কাটাবে ব'লে।

ব্যাপারটা একটু জটিলই। বোঝানো শক্ত। বজ্রধরের মুখে শুনে সুকুমার কিছুতেই 'point'টা বুঝতে পারেনি। এর আদৌ কোনো 'point' আছে কিনা, সে নিয়ে তর্ক করা যায়। বজ্রধর বলে—বলবেই তো!—এ না-হ'য়েই নাকি উপায় ছিলো না, অন্যায় না-জেনে করলেও অন্যায়।

অবাক হচ্ছেন? এখানে আবার অন্যায়ের কথা এলো কিসে? বজ্রধর ঐ রকমই—ও কেন মলয়ের নামের অপব্যবহার করেছিলো, এটুকু বক্রতার কোন প্রয়োজন ছিলো ওর, এত তাড়াই বা কেন করলে? অপেক্ষা করলে সবই হ'তো। এই—ওর মতে—নিদারুণ অপরাধে ওদের সমস্ত জীবন ভণ্ডুল হ'য়ে গেলো—আমাদের মতে যা অনিবার্য তা হ'লো না, ওর মতে যা অবশ্যম্ভাবী, তা-ই হ'লো। সুকুমারের মধ্যস্থতায় সব ঘোর-প্যাঁচ পরিষ্কার হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও বজ্রধরের মন নাকি আশানুরূপ পরিষ্কার হয়নি, একটা কেমন-কেমন ভাব নিয়ে পরের দিন ও শর্বরীর কাছে গিয়ে—

বাকিটা নিয়ে একটা ছোটোখাটো নাটক হয়। যেমন:

[সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে। বাগানে দুটো ডেক-চেয়ার অত্যন্ত নিচু ক'রে পাশাপাশি পাতা। একটাতে শর্বরী ব'সে। আর-একটার শূন্যতা এইমাত্র পূর্ণ করলে বজ্রধর]

শর্বরী। তুমি এত দেরি ক'রে এলে!

বজ্রধর। ভাবছিলাম, আসবো কিনা। হঠাৎ এমন-একটা ব্যাপার—

শর্বরী। ঠিক এমনি সংকোচ মলয়েরও ছিলো।

বজ্রধর। তুমি চুপ করো, শর্বরী।

শর্বরী। চুপ করবো? কেন?

বজ্রধর। কেন নয়, এমনি। দু'জন অন্তরঙ্গ নীরবে ব'সে আছে, এ-দৃশ্য দেখতে দেবতারা ভালোবাসেন। কথা না-কইলেই কি নয়, অন্তত, আজকের মতো? তুমি কি কখনো ভাবো, শর্বরী?

শর্বরী। এখন আমরা দু'জনে পাশাপাশি ব'সে ভাববো তো? বেশ। কিন্তু কার - কিসের কথা ভাববো?

বজ্রধর। তোমার মতে, তুমি মলয়ের কথা ও আমি মণিকার। কিন্তু আমার মতটা অন্য রকম।

শর্বরী (সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে)। মানে?

বজ্রধর। একটা ইংরিজি কবিতা মনে পড়ছে—শুনবে? মানে, কবিতাটা নয়, গল্পটা।

শর্বরী। কার?

বজ্রধর। লেখকের নামটা স্মরণীয় নয়। পঞ্চম শ্রেণীর কবি, কিন্তু শুনবে?

শর্বরী। (আবার গা এলিয়ে) বলো।

বজ্রধর। একটি ছেলে প্রেমে ব্যর্থ হ'য়ে এক পুকুরে গেলো ডুবে মরতে। গিয়ে দেখে, একটু দূরে একটি মেয়ে ব'সে আছে। ডেকে জিগেস করলে, 'তোমার swain বুঝি আমার nymph-এর মতোই নিষ্ঠুর? তাই বুঝি ডুবে মরতে এসেছো?'

মেয়েটি জবাব দিলে, 'আহা—তোমারও বুঝি সেই দশা? মেয়ের প্রাণ এত কঠিন হয়? এসো, দু'জনে একসঙ্গেই মরা যাক।'

ছেলেটি প্রতিধ্বনি ক'রে বললে, 'মরা যাক।'

শর্বরী। ভূতের গল্প?

বজ্রধর। শোনোই না।—দু'জনেই মরতে প্রস্তুত, কিন্তু কেউই জলে নামছে না। ছেলেটি পায়ের আঙুল দিয়ে জলটা একটু ছুঁয়েই শিউরে উঠলো—'উঃ, কী ঠাণ্ডা!'

মেয়েটি পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠলো: 'ইশ, জলগুলো কী কালো আর নোংরা আর বিশ্রী!'

ছেলেটি বললে, 'শীতকালটা যাক, তারপর গ্রীষ্ম এলে দু'জনে একসঙ্গে মরা যাবে।'

মেয়েটি প্রতিধ্বনি ক'রে বললে, 'মরা যাবে।'

শর্বরী। (আবার উঠে ব'সে) এ-গল্প তুমি নিজে বানিয়ে বলছো?

বজ্রধর। না, কবিতা একটা সত্যি আছে, তবে হয়তো কিছু বাড়িয়ে-টাড়িয়ে

বলতে পারি।—তারপর, শোনো। তারপর ওরা সেই পুকুরের ধারে এক কুটির বাঁধলে শীত কাটাবে ব'লে—গ্রীষ্ম এলেই মরবে। শীত এলো। বরফে পৃথিবী শাদা হ'য়ে গেলো, পুকুরের জল গেলো জ'মে। তারপর গ্রীষ্মের সূচনা দেখা দিলো। পৃথিবীতে সবুজের আভা এলো, পুকুর গ'লে জল হ'লো—ঈষদুষ্ণ জল। অনেকদিন পর ওরা দু'জন ঘরের বাইরে এলো।

ছেলেটি জিগেস করলে, 'মরবে ?'

মেয়েটি প্রতিধ্বনি ক'রে বললে, 'মরবে ?'

ছেলেটি বললে, 'ও বড়ো ঝকমারি। তার চেয়ে এসো আমরা বিয়ে করি।'

মেয়েটি প্রতিধ্বনি ক'রে বললে, 'এসো করি।'

শর্বরী (ঝুঁকে বজ্রধরের মুখের দিকে চেয়ে)। আমাকে এ-গল্প বলার মানে ?

বজ্রধর। গল্পটার একটা moral আছে, শর্বরী।

শর্বরী খপ ক'রে বজ্রধরের হাত ধ'রে)। এ-moral-এ তুমি বিশ্বাস করো ?

বজ্রধর। তুমি কি মলয়কে ভুলে যাওনি ?

শর্বরী (বজ্রধরের হাত শক্ত ক'রে আঁকড়ে)। তুমি কি মণিকাকে ভুলে গিয়েছো ?

বজ্রধর। হ্যাঁ।

শর্বরী। হ্যাঁ। (ব'লেই বজ্রধরের হাত ছেড়ে দিয়ে শুয়ে প'ড়ে হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো। খানিকক্ষণ নীরবতা)।

বজ্রধর। শর্বরী।

শর্বরী। (নীরব)

বজ্রধর। শর্বরী।

শর্বরী। (নীরব)

বজ্রধর। শর্বরী।

শর্বরী (চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে)। আমরা এতদিন খেলা করছিলাম,

বজ্রধর। হ্যাঁ, এতদিন খেলাই হচ্ছিলো, কিন্তু আজ তোমাকে একটা সত্যি কথা বলবো ?

শর্বরী (নিম্নস্বরে)। আজই বলবে ? এখুনি ?

বজ্রধর। হ্যাঁ, সেইজন্যই তো আজ আসতে দেরি হ'লো।

শর্বরী। ও।

বজ্রধর। শর্বরী।

শর্বরী। বলো।

বজ্রধর। বলবো? শর্বরী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

শর্বরী। তারপর?

বজ্রধর। শর্বরী, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

শর্বরী। হ'লো? এইবার আমার পালা।

বজ্রধর। বলো।

শর্বরী। বলবো? বজ্রধর, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বজ্রধর। তারপর?

শর্বরী। বজ্রধর, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

(হঠাৎ দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠলো। তারপর বেশ খানিকক্ষণ নীরবতা)

বজ্রধর। যাই এবার।

শর্বরী। তুমি কখনো ছোটো ছিলে, বজ্রধর? সন্ধেবেলা আকাশের তারা গুনে ঘরে যেতে না? ছাখো, ঐ একটিমাত্র তারা ফুটেছে আকাশে। এখন ঘরে যেতে নেই। সাত তারা যখন ফুটবে, তখন তুমি যাবে।

বজ্রধর। এক তারা দেখে ঘরে গেলে কী হয়?

শর্বরী। কে জানে কী হয়। মলয় বলতো—

বজ্রধর। থেমে গেলে যে?

শর্বরী। এমনি। (হেসে) মলয়ের কথা বলা অভ্যেস হ'য়ে গেছে, দেখছি।

বজ্রধর। কী অদ্ভুত, ভাবো তো শর্বরী! এখন যদি মলয় এখানে এসে উপস্থিত হয়—

শর্বরী। থাক, ও-কথা আর কেন?

বজ্রধর। না, কিসে যে কী হয়, কেউ বলতে পারে না। আচ্ছা, এখন যদি শুনি মলয়-মণিকার বিয়ে হচ্ছে, সে কেমন হয়?

শর্বরী। কেমন আবার হবে? কথা বোলো না, বজ্রধর। ঐ ছাখো—দুই,—না, তিন তারা ফুটেছে।

বজ্রধর। আচ্ছা, মলয়-মণিকা যখন এ-খবর শুনবে, কী ভাববে ওরা?

শর্বরী (ক্ষীণস্বরে)। কী আবার ভাববে।

বজ্রধর। কিছুই ভাববে না? আচ্ছা শর্বরী, তুমি মলয়কে ভালোবাসতে?

শর্বরী। বজ্রধর, তুমি মণিকাকে ভালোবাসতে?

বজ্রধর। তখন তো তাই মনে হ'তো।

শর্বরী। তখন তো তা-ই মনে হ'তো।

বজ্রধর। আশ্চর্য, না ?

শর্বরী। আর কথা বোলো না, বজ্রধর। চার তারা—

বজ্রধর। আচ্ছা শর্বরী, চার বছর পর আমরাও তো পরস্পরকে একেবারে ভু'লে যেতে পারি !

শর্বরী। তা ভুলবো না, কারণ আমরা সর্বদা কাছাকাছি থাকবো।

বজ্রধর। আর না-থাকলেই ভুলতাম ? তোমার কথার কি তা-ই মানে নয় ?

শর্বরী। তুমি এইমাত্র যে-গল্পটা বললে—

বজ্রধর (উঠে দাঁড়িয়ে)। হ্যাঁ, আমিই বলেছি। Moralটা বড়ো বেশি সত্যি—না, শর্বরী ? কেন আমি ওটা বলতে গেলাম ?

শর্বরী। একটু বোসো, বজ্রধর, একটু। পাঁচ—পাঁচ, ঐ যে ছ' তারা। (হাতে ধ'রে) একটু বোসো না।

বজ্রধর (শর্বরীর হাতে চাপ দিয়ে)। তখন ওটাও কি কম সত্যি মনে হয়েছিলো ? কী বলো, শর্বরী ? ঠিক এখনকার মতোই কি নয় ? চার বছর পর আমাকে ভুলে'ই যেয়ো, শর্বরী, আমি তোমাকে ভুলি কিনা দেখা যাবে। (হাত ছেড়ে দিয়ে) সেই ভালো। প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিলে তবে মনে থাকে। আশ্চর্য—না, শর্বরী।

শর্বরী। (রুদ্ধস্বরে) মানে ?

বজ্রধর। আকাশে সাত তারা ফুটলো।

(বজ্রধর দৃঢ় পদক্ষেপে বাগান পেরিয়ে রাস্তায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।)

শর্বরী (কয়েক মিনিট পরে)। দাদা।

(বাড়ির ভিতর থেকে লম্বা একটি ছেলে বেরিয়ে শর্বরীর কাছে এসে দাঁড়ালো। তার মুখের সিগারেট জ্বালানো নয়, হাতে দেশলাই।)

শর্বরী। কাল সকালে উঠেই একটা কাজ করবে, দাদা, মুসৌরির দুটো টিকিট কিনে আনবে। জহরকে ব'লে দিয়ো, জিনিসপত্তর বেঁধে-ছেঁদে রাখে যেন।

দাদা। মুসৌরি—

শর্বরী। হ্যাঁ, মুসৌরি। তুমি যা-ই বলো, অন্য কোথাও আমি যাবো না। বাড়িটা ক'মাস বন্ধই থাক। ভাড়া দিলে নষ্ট হবে।

দাদা। কিন্তু—

শর্বরী। না, দাদা—তুমি আপত্তি কোরো না—কলকাতায় আর ভালো লাগছে না আমার।

দাদা (সিগারেটের জন্য দেশলাই জ্বাললে, কিন্তু ধরাবার আগেই কাঠিটা তার হাত থেকে প'ড়ে গেলো)। তোমার চোখে ও কী, শর্বরী ?

শর্বরী। জল, দাদা। বাজে জিনিশ, বলতে, পারো। জলের কি কোনো দাম আছে ? ঘরে চলো, দাদা—আকাশে যে অনেক সাত তারা ফুটলো

১৯২৯ 'এরা আর ওরা'

প্রশ্ন

‘একে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যান’, নিখুঁতভাবে বুরুশ-করা চুলের উপর ডাক্তার একবার সযত্নে, যেন ঠিক না-ছুঁয়ে, প্রজাপতি-ধরনে হাত বুলিয়ে গেলেন। (ডাক্তারদের ধরন-ধারনই আলাদা, ভবকুমার ভাববার সময় পেলো, এরা সবাই যেন চিকিৎসা-শাস্ত্রের জীবন্ত বিজ্ঞাপন। কী গোলগাল, নধর, সুপুষ্ট চেহারা, যেন ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ নিয়ে এরা বাঁচছে। আর কী মার্জিত, কী পরিপাটি, অত্যন্তই বেশি, বলতে হবে। এক এক সময় অসহ্য লাগে।) ‘যত শিগগির পারেন,’ দরজার দিকে এগোতে-এগোতে হঠাৎ একটু থমকে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বললেন। ‘যদি একে বাঁচাতে চান,’ ডাক্তারের স্বর মৃদু, প্রায় আদরের মতো। তারপর—কারণ, ভবকুমার নীরব—‘বুঝেছেন?’ প্রশ্নটা তীব্র, স্পষ্ট; ভবকুমারের মুখের উপর সোনার চশমার ঝলকের দ্বারা তীব্রতররূপে পরিস্ফুট।

ভবকুমার তবু কোনো কথা বললে না, শুধু মাথা নাড়লো। বুঝেছে—অনেক আগেই সে বুঝেছে, সবই বুঝেছে। আর, বোঝবার আছেই বা কী—সানু বাঁচবে না, এ-ই তো কথা। সানু বাঁচবে না—সে এর কী করতে পারে? সানু তো ইচ্ছে ক’রেই মরতে বসেছে—তা ছাড়া আর কী? নয়তো সানুকে কি মানায় এ-রকম বড়োলোকি রোগ বাধিয়ে বসা? সমুদ্রের ধারে নিয়ে না-গেলে যার চিকিৎসা হয় না? আশ্চর্য, সানুটার একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকতো! ভবকুমারের মনে ছেলের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ—রীতিমতো একটা রাগ—স্পষ্ট রূপ নিলো। ওর কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, ওর নিবুদ্ধিতা, ওর এই অসময়ে—হাস্যকর অসময়ে মরবে ব’লে পণ! কিন্তু আমি কী করতে পারি, নিজের মনে ভবকুমার বার-বার বলতে লাগলো, আমি কী করতে পারি।

ডাক্তারের গাড়ির স্টার্ট নেবার শব্দে ভবকুমারের চমক ভাঙলো। সমুদ্র—সমুদ্রের ধারে একে নিয়ে যাও। পুরি, ওয়াল্টেয়ার, গোপালপুর-অন-সী। পুজো আসছে—রেল-কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপনের দামামা পিটোচ্ছে। সেদিন আপিশ থেকে ফেরবার পথে বেঙ্গল-নাগপুর রেলোয়ের টিকিট-অপিশের জানলায় একটা প্রকাণ্ড জ্বলন্ত পোস্টর তার চোখে পড়েছিলো—নীল, গভীর-নীল সমুদ্র যে-রকম নীল রেল-কোম্পানির পোস্টরের বাইরে কোথাও দেখা যায় না একটা বৃহৎ পোষ-মানা পশুর মতো প’ড়ে আছে; সামনের দিকে মাঝামাঝি জায়গায় টেনিস-ক্রীড়ারত কয়েকটি মেয়ে-

পুরুষের ক্ষুদ্রাকৃতি রেখাচিত্র, সেখান থেকে একটা ছাই রঙের মোটরগাড়ি-সংবলিত, আঁকাবাঁকা, শাদা একটি রাস্তা ছবির বাঁ কোণস্থ বিশাল হোটেল পর্যন্ত চ'লে গেছে। আর, সমুদ্রের উপরকার জমানো-নীল আকাশের গায়ে বড়ো-বড়ো লাল অক্ষরে লেখা, ওয়াল্টেয়ার। এবার রেলভাড়া অন্যান্য বছরের চেয়েও কমিয়ে দেয়া হয়েছে; রেলোয়ে হোটেলের চার্জ দেশের সাধারণ অবস্থার বিবেচনায় দৈনিক পনেরো থেকে নামানো হয়েছে দশ টাকায়। এমন লোকও আছে, একটা হোটেলে দৈনিক পনেরো টাকা যারা স্বচ্ছন্দে দিতে পারে, দশ টাকা যাদের পক্ষে শস্তা। এমন লোকও আছে যারা স্ত্রীর মুখ একটু ম্লান দেখাচ্ছে কি এখানে কিছুই ভালো লাগছে না, স্রেফ্ এই কারণে ঝাঁ ক'রে চ'লে যায় ওয়াল্টেয়ার কি উটকামণ্ড কি কাশ্মির। সে এখন পর্যন্ত ফিল্মে ছাড়া কখনো সমুদ্র দেখেনি—বয়েস তার হ'তে চললো পঁয়ত্রিশ। সানুকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে যে-কোনো জায়গায় গিয়ে অন্তত এক মাসও থাকতে হ'লে কম পক্ষে তার তিন মাসের মাইনে দরকার। সানুর অসুখের আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত যেখানে যা পেয়েছে সে ধার করেছে—করতে বাধ্য হয়েছে—এখন আর কে তাকে ধার দেবে? বরং—পুজো আসছে এখন সবাই সেগুলো ফেরৎ পেলেই বাধিত হবে। ওষুধের দোকানে দেনা জমেছে পর্বতপ্রমাণ। ডাক্তারের ভিজিট যা দেয়া হয়েছে, তা যোগ করলে কলম্বো পর্যন্ত সেকেণ্ড ক্লাশের ভাড়া হয়। সমুদ্রই যদি সানুর একমাত্র ওষুধ, ডাক্তার তাহ'লে তা আগে বললেই পারতো! নিজে কেন তবে সর্দারি করতে গেলো—ওর তো কত টাকাই আছে, তার এ-ক'টা টাকা না-নিলে কি ওর চলতো না? ছোটোলোক, ছোটোলোক। 'ভয় নেই; কিছু ভয় নেই,' কতদিন পর্যন্ত তো এ-বুলিই শুধু জপেছে। কিন্তু জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না, ছেলের চেহারাও দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। কত প্রেসক্রপশন বদলানো, অশ্রুতপূর্ব কত পেটেণ্ট ফুড আর বিদেশী ফল—কী হ'লো ও-সবে? ছাই হ'লো—শুধু মাঝখান থেকে কতগুলো টাকা গেলো জলে। একেবারে জলে। ওটা অবশ্যি কথার কথা; টাকা কখনো জলে যায় না; আমার যা ছিলো, তা আর-একজনের হ'লো, আমার যেটুকু কম, আর-একজনের সেটুকু বেশি। ভবকুমারের যেটুকু গেছে, ডাক্তার সুশীল সরকারের সেটুকু বেড়েছে। তারপর—এতদিন ধ'রে আগডুম-বাগডুম ক'রে শেষটায় আজ কিনা বলে, 'সমুদ্রের ধারে একে নিয়ে যান, যদি একে বাঁচাতে চান!' বাঁচাতে কি আর চাই! কেবল তোমার চাঁদমুখ দেখবার জন্যেই অষ্টমুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে তোমাকে রোজ-রোজ ডাকতুম। ডাক্তারের স্ফীতগণ্ড, রক্তিম মুখমণ্ডল ভবকুমারের মনে পড়লো, আদরের মতো মৃদু সেই কণ্ঠস্বর: 'ভয় নেই, ভয় নেই।' না, ভয় আর কী। ছেলেটা ম'রে যাবে, তাতে আর ভয় কী।

ভবকুমার ভিতরে গেলো। সানুর শিয়রে ব'সে সুরমা; হঠাৎ দেখে মনে হয়, সুরমারই বুঝি অসুখ করেছে। 'কী বললে ডাক্তার?' উৎকণ্ঠিতস্বরে সুরমা প্রশ্ন করলে।

'বললে,' এক দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময় উপায়ে ভবকুমার ডাক্তারের উপর প্রতিশোধ নিলে, 'কোনো ভয় নেই।'

'তা-ই বললে?' বহু অনিদ্রায়, বহু ক্লেশে শুষ্ক, ম্লান সুরমার মুখ হঠাৎ আশ্চর্যরকম উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। সে-হাসি এত উৎফুল্ল, এমন নির্লজ্জরকম সুন্দর যে ভবকুমারের চোখে তা রীতিমতো বিসদৃশ—এমনকি, একটু অশ্লীল ঠেকলো। ইচ্ছে করলেই মুহূর্তের মধ্যে এই সমস্ত আলো সে নিবিয়ে দিতে পারে। যদি সে বলে, 'তোমার ছেলে মরবে।' তার হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক, উৎকট ইচ্ছা হ'লো ও-কথা বলবার, নির্বোধের মতো মনে-মনে বললে, 'তোমার ছেলে মরবে, তোমার ছেলে মরবে।'

'তুমি একটু বোসো এখানে', সুরমার কণ্ঠস্বরে একটা সুর বেজে উঠলো, যাতে ভবকুমারের মনে পড়লো তার বিয়ের প্রথম বছরের কথা; 'আমি ততক্ষণ বেদানার রস ক'রে আনি।'

তাদের বিয়ের প্রথম বছর, সুরমার বয়েস তখন আঠারো। দেখতে সে তখন ভালোই ছিলো—লোকে তা-ই বলতো · পুজোর সময় সুরমাকে নিয়ে সে তাদের দেশের বাড়িতে গিয়েছিলো। তারা যে-ঘরটায় শুতো, জানলার ঠিক বাইরে ছিলো একটা শেফালি গাছ। ভোরের দিকে ঝরতো অজস্র ফুল, গন্ধে ভেঙে যেতো ঘুম। সেই শেফালি-সৌরভ, শেফালি-শুভ্রতা পরের বছর মূর্তি নিয়ে এলো খোকা হ'য়ে, তার ছেলে, সুরমার ছেলে হ'য়ে। ক'দিনের কথাই বা। এরই মধ্যে···?

একপাশে কাৎ হ'য়ে, তার শীর্ণ মাংসহীন হাত দুটি অলসভাবে পাশবালিশের উপর রেখে সানু এতক্ষণ চোখ বুজে ঘুমের আর জ্বরের মাঝামাঝি মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় প'ড়ে ছিলো; হঠাৎ ডেকে উঠলো, 'মা।'

'মা তোমার জন্য বেদানার রস ক'রে আনতে গেছেন।'

'বেদানার রস ভালো না, বাবা।' সানু পরিপূর্ণ ক'রে চোখ মেলে বাবার দিকে তাকালো। দীর্ঘ, কালো পলকের নিচে সেই কালো দুটি চোখ ভবকুমার ভালো-বেসেছিলো। সুরমার চোখ—না, আরো সুন্দর। কিন্তু সে-চোখের সব আলো নিবে গেছে; কোটরের গহ্বর থেকে ম্লান, ব্যঞ্জনাহীন, ঐ ছোটো শরীরের সমস্ত দীর্ঘ যন্ত্রণার দৃশ্যমান প্রতীকের মতো সে-চোখ তাকিয়ে আছে। 'বেদানার রস খাবো না, বাবা।'

'আঙুর?' ভবকুমার তার সাধ্যমতো সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো।

'না, না, আঙুরও খাবো না। ডিম খাবো, ইলিশমাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবো, কাঁচা আমের অম্বল—'

'আর ?'

'আমি কবে ভালো হবো, বাবা ?'

'শিগগিরই,' গতানুগতিকভাবে ভবকুমার বললে।

'কেন আমার অসুখ করলো ?'

কেন ? এ-প্রশ্ন সে করতেই পারে। আরো বেশি : কেন তাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাওয়া হবে না, কেন তাকে বড়ো হ'য়ে উঠতে দেয়া হবে না, কেন একজন কবি হবার সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে ? কেন ? কেন ?

খানিক চুপ থেকে সানু হঠাৎ একটু আগ্রহের সুরে ব'লে উঠলো, 'বাবা, কবিতা বলো।'

'কোনটা, সানু ?

'রামায়ণ বলো।'

ভবকুমার— ছেলের সঙ্গে পড়তে-পড়তে তারও মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো—সুর ক'রে আবৃত্তি করলো :

'বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে,
ছায়া তায় মধুময় বায়ু বয় ধীরে।
সুখে পাখি গায় গান, ফোটে কত ফুল,
কিবা জল নিরমল, চলে কুলকুল।
মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়,
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
সে বড়ো সুন্দর কথা শুন মন দিয়া।'

শুনতে-শুনতে সানুর চোখে যেন আলো ফিরে এলো, তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো। লাইনগুলো বাবার বলা শেষ হবার আগেই সে তার নিজের মনে আবৃত্তি করছিলো ; পরবর্তী পরিচিত পদের প্রত্যাশায় অস্ফুট উচ্চারণে ন'ড়ে উঠছিলো তার ঠোঁট।

'ওটা বলো, বাবা—রামগরুড়ের ছানা—'

ভবকুমার আনুষঙ্গিক অঙ্গভঙ্গি-সহকারে আবৃত্তি করলে :

'রামগরুড়ের ছানা— হাসতে তাদের মানা
হাসির কথা শুনলে বলে 'হাসবো না, না, না, না,।'
সদাই মরে ত্রাসে, ঐ বুঝি কেউ হাসে,
একচোখে তাই মিটমিটিয়ে তাকায় আশে-পাশে।
যায় না বনের কাছে, কিংবা গাছে-গাছে,
দখিন হাওয়ায় সুড়সুড়িতে হাসিয়ে ফেলে পাছে।'

'হী-হি-হি,' সানু হেসে উঠলো, 'একচোখে তাই মিট-মিটিয়ে—হী-হি—তাকায় আশে-পাশে। আরো বলো, বাবা।'

ঠিক এই মুহূর্তে ঘরে ঢুকে সুরমার মনে হ'লো, যেন তার সামনে স্বর্গের এক দৃশ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। 'খুব যে হাসা হচ্ছে দু'জনে মিলে। আগে ঢক ক'রে এটুকু খেয়ে নাও তো লক্ষ্মী, তারপর আরো শুনো।'

বেলা বারোটার পর, সেদিনকার সব কল সেরে, এবং চার ঘণ্টার মধ্যে ভবকুমারের পাকা এক মাসের মাইনে উপার্জন ক'রে ডাক্তার সুশীল সরকার সবে বাড়ি ফিরেছে, একটু পরেই চাকর এসে খবর দিলে, কর্তাবাবু তাকে ডাকছেন।

'কর্তাবাবুর নিকুচি! দাঁতের ফাঁকে তীব্রস্বরে সুশীল ব'লে উঠলো।

'আজ্ঞে?' চাকরটা দরজার কাছে গিয়ে তাকে কিছু বলা হয়েছে মনে ক'রে থামলো।

'না, তুই যা।' ডাক্তারের নীল সিল্কের শার্টটা ঘামে একেবারে ভিজে গিয়েছিলো, সেটাকে দেয়ালের গায়ে একটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখে সে তার স্ত্রীর দিকে তাকালো। 'কর্তাবাবুর হয়েছে কী?'

'নতুন আর কী হবে,' ঠোঁট বাঁকিয়ে স্ত্রী বললে। 'একটু বেশি ক'রে ব্র্যাণ্ডি প্রেসক্রাইব কোরো—তাহ'লেই বুড়ো আর জ্বালাবে না।'

'ব্র্যাণ্ডি! যেন উনি এক জীবনে সাত জনের আন্দাজ ব্র্যাণ্ডি গেলেননি। আর সেই জন্যেই তো—' গেঞ্জিটা মুখের উপর দিয়ে টেনে খুলতে সুশীলের বাকি কথাগুলো চাপা পড়লো।

কয়েক মিনিট পর সুশীল তাদের প্রকাণ্ড পৈতৃক বাড়ির তেতলায় গিয়ে পৌঁছলো। দক্ষিণের ঘরটায় পাহাড়ের মতো উঁচু ও মাঠের মতো বিস্তৃত একটি খাটে অগুনতি

বালিশে শরীরটাকে আশ্রিত ক'রে এককালীন প্রতাপশালী জমিদার, এককালীন বঙ্গবিখ্যাত মগুপ ও কৌমার্যহর জগবন্ধু সরকার শায়িত। তাঁর পরনে সবুজ সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে সিল্কের ফতুয়া। অশীতিপর বৃদ্ধ, তাঁর ঘন কুঞ্চিত কালো চুলের এখন যা অবশিষ্ট আছে, তা শুধু মাথার পিছনে ও দু'কানের উপর কয়েক গোছা শাদা দড়ি। তাঁর মুখ নতুন-কামানো, সুচারু ক'রে ছাঁটা শাদা গোঁফে কাছে গেলে আতরের গন্ধ পাওয়া যায়। বালিশের স্তূপের উপর কাঁধ রেখে আধো-শোয়া অবস্থায় তিনি শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন। সন্তর্পণে, একটু ভয়ে-ভয়ে সুশীল ঢুকলো; জগবন্ধু নড়লেন না, যেন তার পায়ের শব্দ শুনতে পাননি। মস্ত পারস্য কার্পেটের উপর নিঃশব্দ পা ফেলে সুশীল খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো। জগবন্ধু যেন শাদা দেয়ালের গায়ে কোনো অদৃশ্য লেখা পড়ছেন, সেখান থেকে চোখ তাঁর সরছেই না। সুশীল অপেক্ষা করলো, একবার এ-পায়ে, একবার ও-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো; একটু কাশলো; তারপর বললো, 'আমাকে ডেকেছিলেন?'

একদা-ভীতিকর মাথা আস্তে-আস্তে সরলো সুশীলের মুখের দিকে। খানিকক্ষণ জগবন্ধু তাকিয়েই রইলেন, যেন দেয়ালে এতক্ষণ যা পড়ছিলেন, তারই শেষাংশ এখন সুশীলের মুখে পড়ছেন। বুড়ো ও-রকম ক'রে তাকিয়ে আছে কেন, সুশীল মনে-মনে ভাবলো। ভারি অস্বস্তি লাগছিলো তার; এদিকে খিদেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছে। নিজের শরীরের কী-একটু হয়েছে কি না হয়েছে, তা নিয়ে হৈ-চৈ ক'রে বাড়ি মাথায় করতে তার বাবার মতো কেউ না। চুপ ক'রে সে বাবার কথা বলার অপেক্ষা করতে লাগলো; ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ শুধু ইলেকট্রিক পাখার মৃদু গুঞ্জন কালাতিপাত নির্দেশ করছে।

হঠাৎ, যেন তাঁর অদৃশ্য বই পড়া হ'য়ে গেছে এবং সে-সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করছেন, এ ভাবে জগবন্ধু ব'লে উঠলেন, 'আমি আর বাঁচবো না।

'না, না, সে কী কথা!' তার পেশাদার ধরনে, রেশমি-নরম স্বরে সুশীল বললে, 'আপনার তো কিছুই হয়নি।'

'ভালো লাগছে না—শরীর ভালো লাগছে না।'

'কিন্তু হয়েছে কী?'

'হয়েছে কী!' জগবন্ধু হঠাৎ গর্জন ক'রে উঠলেন, 'সেইজন্যই তো তোকে ডেকেছি। তা-ও যদি আমাকে ব'লে দিতে হবে, তাহ'লে পাঁচ বছর মেডিকেল কলেজে আর পাঁচ বছর বিলেতে ঘ'ষে তুই কী করলি!'

এই ভয়ানক কণ্ঠস্বরে সুশীলের মনে আবার যেন মুহূর্তের জন্য তার ছেলেবেলাকার

পিতৃভীতি ফিরে এলো। ছেলেবেলায় তার মনে বাবার প্রতি যে-দুর্জয়, যে-প্রচণ্ড ভয় বদ্ধমূল হয়েছিলো, এখন পর্যন্ত সে যেন তা ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তার বাবার উপস্থিতিতে পুরোপুরি সাবালক হ'য়ে উঠতে এখনো সে পারলো না। সেই ভয়ংকর রক্ত-হিম-করা কণ্ঠস্বর, সেই-সব মার···ভাবতে এখন পর্যন্ত সুশীলের হাত-পা দুর্বল হ'য়ে আসে। মার খেতে-খেতে নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যেতো। ওঃ, সর্বান্ত করণে কী ঘৃণাই সে বাবাকে করতো! আর সেই-সব মারের প্রতিহিংসা-স্বরূপ, সেই ঘৃণাকে প্রকাশ করবার দুর্দম তাড়নায় ইচ্ছে ক'রে, জোর ক'রে, আরো বেশি খারাপ হ'তো, আরো বেশি অন্যায় কাজ করতো। তার ফলে আরো বেশি মার, এবং তার ফলে আবার আরো বেশি ঘৃণা, আবার আরো বেশি নষ্টামি। এমনি ক'রে, অন্তহীন চক্রপথে চলতো পিতা-পুত্রের বিষাক্ত সম্বন্ধ। এখনো সেই ঘৃণা প্রচ্ছন্নভাবে আছে তার মনের মধ্যে—সেই উত্তপ্ত, সেই হিংস্র, সেই অসহ্য ঘৃণা। বাবার শিথিলচর্ম, পরিচ্ছন্ন, মোলায়েম মুখের দিকে সে একটু তাকালো, তারপর বললে, 'কালকেই তো আপনাকে খুব ভালো ক'রে এগজামিন করলুম; কিছু হয়নি তো।'

'তাহ'লে খারাপ লাগে কেন? ভালো লাগে না কেন?'

'আপনার বয়েসের অনেকের চাইতেই তো আপনি ভালো আছেন।'

'রাখ বয়েস!' তাঁর বার্ধক্যের প্রতি কোনো ইঙ্গিত জগবন্ধু একেবারেই সইতে পারেন না। হ্যাঁ, তাঁর বয়স অনুসারে তিনি ভালো আছেন, তা ঠিক। কিন্তু তাতে কী! বয়স তো তাঁর কম হয়নি—পাকা একাশি, একটি দিন কম নয়। ও-বয়সের লোক এ-দেশে তো সাধারণত বেঁচেই থাকে না। কিন্তু একে কি ভালো থাকা বলে, বেঁচে থাকা বলে! এ তো মরা মানুষের তুলনায় ভালো! জীবিত লোকের মধ্যে তিনি বাঁচতে চান; মৃতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুগ্রহ চান না। 'বয়স হয়েছে ব'লেই সারাক্ষণ খাটের উপর চিং হ'য়ে প'ড়ে থাকতে হবে নাকি?'

'কিন্তু আপনার এখন বিশ্রাম দরকার—complete rest।'

জগবন্ধু মাথা নাড়লেন।—'না, আমি আর বাঁচবো না।'

সুশীল মৌখিক এবং মামুলি প্রতিবাদ করলে। কিন্তু মনে-মনে সে ভাবলে, 'সত্যি, বুড়ো কি কোনোদিন মরবে না? কতকাল আর বেঁচে থাকবে! কী আসুরিক শরীর!'

'আমি মরছি', অনেকটা নিজের মনে জগবন্ধু বললেন, 'এবার আমি নিশ্চয় মরছি।'

কথাটা নতুন নয়। গেলো দু'বছর ধ'রে ক্রমান্বয়ে, অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি মরছেন। তেতলায় তাঁর কার্পেট-বিছানো ঘরে বৃহদায়তন খাটে শুয়ে তিনি মরছেন, এ-সংবাদ

দু'বছর ধ'রে তাঁর ছেলেমেয়ে, পুত্রবধূ-জামাতা, নাতি-নাৎনি, নাতি-নাৎনির অপত্যাবলী, আশ্রিত, জ্ঞাতি, ভৃত্য, সবারই গোচর হ'য়ে আসছে। কর্তাবাবু মরবেন—এ-কথা শুনে-শুনে অভ্যেস হ'য়ে গেছে তাদের, যে-কোনোদিন, যে-কোনো সময়ে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শোনবার জন্য তারা প্রস্তুত। তাদের কল্পনায় কর্তাবাবু ইতিমধ্যেই মৃত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, দু'বছরের মধ্যে তিনি মৃত্যুর এতটুকু বেশি কাছে এসেছেন ব'লে মনে করা যায় না। যেন মৃত্যুর বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিজ্ঞায় তিনি টি'কে আছেন, আরো কতকাল থাকবেন, বাড়ির লোক মাঝে-মাঝে ভেবে অবাক হয়। তাঁর অসুখ আর-কিছুই নয়; অসুখ তাঁর নিজের জীবন, তাঁর একাশি বছরের দীর্ঘ জীবন। তাঁর জীবনই এখন তাঁকে ক্ষয় করছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই ক্রিয়াকে তিনি রোধ করছেন, উল্টো আক্রমণ করছেন, ঘড়ির কাঁটা অনুসারে দিন-যাপনে, পরিমিত আহারে, খাদ্যের সঙ্গে প্রায় সম-পরিমাণে পেটেন্ট ওষুধ-সেবনে, ডাক্তারকে নিত্য সঙ্গী ক'রে। তাতে তাঁর রীতিমতো শারীরিক যন্ত্রণা হয়, তবু তাঁর মদ্য-সেবন তিনি সন্ধেবেলা দু'টিমাত্র পেগে পর্যবসিত করেছেন। কেননা, তাঁকে বাঁচতে হবে। কেন বাঁচতে হবে? বাঁচলেই বা আর কতদিন বাঁচবেন? ও-সব কথা তাঁর মনে হয় না, হ'লেও তিনি সেগুলো জোর ক'রে চাপা দিয়ে রাখেন: ও-সব অনাবশ্যক। ইচ্ছা, বাঁচবার অন্ধ ইচ্ছা এখন তাঁর মধ্যে অন্য-সব জিনিশের চাইতে প্রবল। যে-ক'দিন পারেন, এবং যেমন ক'রে পারেন, বাঁচবেন তিনি। আর সেই কারণেই মুখে তিনি বার-বার জোর ক'রে বলছেন, 'আমি মরছি, আমি মরছি।' কারণ, তাঁর মনে এ-কুসংস্কার আছে যে যা মুখে বলা যায়, তা কখনো ঘটে না। কোনো অদ্ভুত রহস্যময় উপায়ে মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রাখছেন তিনি; মুখের কথায় বার-বার মৃত্যুকে আহ্বান ক'রে মৃত্যু-দেবতাকে তিনি তুষ্ট রাখছেন, এই আশায় যে দেবতা তাঁকে সত্যি-সত্যি আঘাত করতে ভুলে থাকবেন।

আরো একটু মামুলি আশ্বাস-দানের পর সুশীল চ'লে যাচ্ছিলো, জগবন্ধু পিছন থেকে তাকে ডাকলেন। 'শোন—কাল রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি।'

'সেই ঘুমের ওষুধটা খেয়েছিলেন?'

'খেয়েছিলাম।'

'তবু হয়নি?'

'না, না, তবু না.' জগবন্ধুর মেজাজ হঠাৎ চ'ড়ে গেলো, 'তোকে বললুম কী?' তারপর আবার স্বাভাবিকভাবে: 'আমার মনে হয় রাত্তিরে আরো দুটো পেগ ব্র্যাণ্ডি খেয়ে শুলে ঘুমটা ঠিক আসবে।'

'আমার তো মনে হয় না সেটা ঠিক হবে।'

'তোদের ডাক্তারিশাস্ত্রে মদ সম্বন্ধে এত কড়াক্কড় কেন? Idiotic!'

সমস্ত ডাক্তারিশাস্ত্রের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, সুশীল কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'হয়েছে কী—আপনার লিভারটা তো ঠিক—এখন আপনার শরীরটাকে একটা নিখুঁত ব্যালেন্সের মধ্যে রাখতে হবে, একটু এদিক-ওদিক হ'লেই '

'যা-যাঃ—আর শুনতে চাইনে।' সত্যি, আর শুনতে জগবন্ধু চানও না। একটু এদিক-ওদিক হ'লে কী হবে তা তিনি জানেন—ভালো ক'রেই জানেন। ডাক্তারগুলো গাধা, ওদের তাড়ায় এক ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি খাবার পর্যন্ত উপায় নেই। রোজ দু'পেগ! ছী-ছি, লোকে ভাববে কী! এ-কথা শুনলে তাঁর বন্ধু জয়নারায়ণ সিংহ কি হেসে লুটিয়ে পড়তেন না? কিন্তু জয়নারায়ণ সিংহ আজ কুড়ি বছর মৃত। তাঁর এই হাস্যকর, অবিশ্বাস্য অবস্থা দেখবার জন্য বন্ধুদের মধ্যে একজনও বেঁচে নেই, একজনও না। সেটা, যা-ই হোক, একটা বাঁচোয়া। বালিশের স্তূপে আশ্রিত, জগবন্ধু সামনের দেয়ালে আবার তাঁর অন্তহীন অদৃশ্য বই পড়তে লাগলেন।

ছোটো একটি ভারাক্রান্ত টেবিল সামুর বিদ্যাচর্চার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাঁধানো সন্দেশ, চলতি বছরের মৌচাক, আবোল-তাবোল, কাগজের মলাটে ছবি-ভরা সংক্ষিপ্ত টেমপেস্ট, অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার্ল্যাণ্ড, মলাটহীন, মলিন একখানা সুইস ফ্যামিলি রবিনসন। লাল আর কালো কালির দোয়াত, কলম আর পেনসিল অগুনতি। একস্তূপ খাতা। টেবিল সাজানো সামুর একটা বাতিক ছিলো; রোজ দু'বেলা অফুরন্ত উৎসাহে তার টেবিলটি ঝেড়ে-মুছে, সাজিয়ে-গুছিয়ে একেবারে ঝকঝকে ক'রে না-তুললে তার মনে শান্তি হ'তো না। সামু তিন মাস বিছানায় প'ড়ে আছে, তার টেবিলে হাত দেবার সময় তার মা-রও নেই। সামু শেষদিন যেমন ক'রে সাজিয়ে রেখেছিলো, ঠিক তেমনিই রয়েছে; শুধু সময়ের স্পর্শের দৃশ্যমান চিহ্নের মতো তার উপর পড়েছে তিন মাসের ধুলো। এ বই ও-বই তুলে ভবকুমার একটু নাড়া-চাড়া ক'রে রেখে দিলে, তারপর খাতার ছোটো স্তূপ ঘাঁটাঘাঁটি করতে-করতে বেরিয়ে পড়লো সুতো দিয়ে ঘরে-শেলাই-করা বালি-কাগজের এক খাতা, যার ভিতরকার লেখাগুলি ভবকুমার সবই জানে। খাতাটা খুলে সে পড়তে আরম্ভ করলো। অসমান অক্ষরে সযত্নে কালি দিয়ে লেখা :

আমি কী কী ভালোবাসি

ভালোবাসি লাল ফুল
ভালোবাসি নীলাকাশ
ভালোবাসি পা-র নিচে,
নরম সবুজ ঘাস।
ভালেবাসি বিছানায়,
হালকা চাঁদের আলো,
আবছা ঘুমের চোখে
মা-র মুখ বাসি ভালো।
ভালোবাসি কাঁচা আম
আর বৃষ্টির ধুম,
সবচেয়ে ভালোবাসি
রাত্তিরে মিঠে ঘুম।

ভবকুমার পাতা উল্‌টিয়ে গেলো :

আমাদের বাড়ি

আমাদের বাড়ি ভাই সীতারামপুর,
চাঁপাটি স্টেশন থেকে নয় বেশি দূর।
রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে যে ছিলো হাওড়ায়,
চলিতে-চলিতে কত পদ্য আওড়ায়।
ছুটে চলে গাছপালা মাঠ ঝোপ বন,
আকাশটা বেঁকে যায় অদ্ভুত কেমন।
টেলিগেরাফের তারে ব'সে ছোটো পাখি,
ওরা কি শুনিতে পায় আমি যত ডাকি।
এঞ্জিনের ধোঁয়া ওঠে মোটা কালো থাম,
ব'সে-ব'সে দেখি আমি ক'মাইল এলাম।
এই দ্যাখো এলো এক বড়ো ইষ্টিশান,
কেউ চায় সীতাভোগ, কেউ চায় পান।
বিকেল পাঁচটা হ'লো, এসেছি চাঁপাটি,
মা যাবেন পাল্কি চ'ড়ে, আমি যাবো হাঁটি'।
আমি চলি আগে-আগে, বাবা আসে পাছে,
আকাশে পাখির ঝাঁক উড়ে চলিয়াছে।
হঠাৎ হোঁচট খেয়ে যেই যাই প'ড়ে,
অমনি বাবার কোলে বসি আমি চ'ড়ে।
চলেছে খেতের মধ্যে গোরু একপাল,
সূর্যটা অদ্ভুত, দ্যাখো, গোল আর লাল।

তারপর :

আমাদের ঝি

ঐ আমাদের ঝি—
বলতে পারো আনছে সে তার কোঁচড় ভ'রে কী ?
থরথরিয়ে হাতটি কাঁপে,
নিজের মনে কেবল শাপে,
একশো বছর বয়স হবে এমন বুড়ি ঝি।
বলতে পারো আনছে সে তার কোঁচড় ভ'রে কী ?
ভাবছো বুঝি চিনেবাদাম
কালো কিংবা গোলাপি জাম ?
হাঃ হাঃ হাঃ। এমন মজা কোথাও দেখিনি।
কোঁচড় ভ'রে আনছে বুড়ি শুকনো ঘুঁটে—হিঃ।
হিঃ হিঃ—হিঃ—!

এর নিচে লেখা : 'আমি যখন বড়ো হবো, এমন একটা বাড়ি বানাবো যা দেখে সবাই বলবে—'বাঃ, কী সুন্দর !'

ভবকুমার আর পড়লো না, খাতাটা বন্ধ ক'রে রেখে দিলো। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো, শরতের নীল আকাশে বৃহদায়তন শাদা সব মেঘ পরম পরিতৃপ্তভাবে ঘুমুচ্ছে—তাদের গা থেকে রোদ যেন ফেটে বেরুচ্ছে—এত উজ্জ্বল। সমস্ত আকাশ যেন শান্তিতে, পরিপূর্ণতায় স্তব্ধ ; শান্তি : অন্তহীন, অবর্ণনীয় শান্তি। পৃথিবীতে এত সৌন্দর্য—অযাচিত, বিনামূল্যে বিতরিত এত সৌন্দর্য, তা যেন বিশ্বাস করা যায় না। আর এই শান্তি আর সৌন্দর্যের মধ্যে সানু, তার ছেলে সানু, মরছে।

* * *

জগবন্ধু সরকারের হৃৎপিণ্ড বহু সহস্র লক্ষ শ্রান্তিহীন স্পন্দনে একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো—হঠাৎ একদিন সেই খবর বেশ একটু প্রবলভাবেই বিজ্ঞাপিত হ'লো। গেলো কয়েক রাত তাঁর ভালো ঘুম হচ্ছে না (কতগুলো গোরু আর ছাগল - একফোঁটা ব্র্যাণ্ডি খেলে কী হয় ?) ; হজমেরও গোলমাল হচ্ছে ; ক'দিনের মধ্যে তাঁর শরীরও যেন একটু রোগা হ'য়ে গেছে। সুশীলের কাছে তিনি একদিন চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের অপার মূঢ়তা ও সেই শাস্ত্রের চূড়ান্ত নিষ্ফলতা নিয়ে তীব্র অভিযোগ জানালেন। তাঁর শরীরের কিছুই উন্নতি হচ্ছে না, দিন-দিন বরং খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে ; কোনো সন্দেহ

নেই, শিগগিরই তিনি মরবেন। শুধু কতগুলো ডাক্তার-ছাগলের হাতে প'ড়েই তিনি অকালে মরতে বাধ্য হচ্ছেন, নয়তো আশি বছর যে বেঁচেছে, সে নব্বুই বছরও বাঁচতে পারে। নব্বুই বছরে, মনে-মনে যম-দেবতার কাছে সে নিবেদন করলো, আমি মরবার জন্য প্রস্তুত হবো, তখন হবে তোমার সুসময়। পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি ষাটে মরতে প্রস্তুত ছিলেন, ষাট বছরে মানুষের বাইবেল-উক্ত পরমায়ু লাভ করবার তাঁর আকাঙ্ক্ষা জন্মালো, সত্তর যখন পেরুলো, মনে-মনে তিনি নিজেকে আশি নম্বর দিয়ে রাখলেন। আশির উপরে—সেটা বড়ো বেশি দেখায়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নব্বুইটাই ঠিক মরবার বয়স।

সুশীল বলতে আরম্ভ করলো, 'কলকাতার বাইরে কোথাও গিয়ে থাকলে হয়তো—'

'ঐ তো!' জগবন্ধু হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'তোদের ডাক্তারদের মুখে ঐ তো এক কথা! আর-কিছুতে যখন কুলোয় না তখন চেঞ্জ! এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেলেই যদি রোগ সারবে, তাহ'লে এতগুলো ডাক্তার ছাগল খেয়ে আছে কী ক'রে? যে-সব গোরু ঠকিয়ে তোর মতো গোরুও পয়সা করছে, ও-সব ছেঁদো কথা তাদের কাছে বলিস।'

তবু সুশীল আর-একবার চেষ্টা করলো, 'রাঁচির বাড়িটা তো খালিই প'ড়ে আছে—'

'জানি, জানি। খালি আছে, খালিই থাকবে। ঐ জঙ্গলে গিয়ে আমি বাস করতে পারবো না। কিছুতেই না।'

'কিন্তু রাঁচির হাওয়াটা—'—

'থাম। আমার সঙ্গে ইয়ারকি!'

কিন্তু সেই রাত্রেই তাঁর হৃৎপিণ্ড তাঁর সঙ্গে আরো বড়ো রকমের একটা ইয়ারকি করলো। সুশীল থেকে আরম্ভ ক'রে ছেলেপিলেদের নোংরা কাপড় কাচবার ঝি পর্যন্ত সবাই জেনে গেলো যে এতদিনে সেই দীর্ঘ-প্রত্যাশিত মুহূর্ত এসেছে; কর্তাবাবু এবার সত্যি-সত্যি মরছেন। বাড়িতে শোকের আবহাওয়া ঘনিয়ে এলো, কিন্তু সেই শোক যেন একটা পরিপূর্ণতা। শহরের সব বড়ো ডাক্তারদের ডাকা হ'লো; উৎকণ্ঠায় ও প্রতীক্ষায় সারা রাত কাটলো। সমস্ত রাত্রি ভ'রে জগবন্ধুর হৃৎপিণ্ড ধ্বনিত হ'লো— উদ্দাম, উদ্ধত, অনিয়মিত। ভোরের দিকে তা আবার শান্ত হ'লো, সুস্থ হ'লো; জগবন্ধু ঘুমিয়ে পড়লেন। ফাঁড়া কেটে গেলো। আরো কয়েক লক্ষ বারের মেয়াদ নিয়ে জগবন্ধুর স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন আরম্ভ হ'লো আবার।

'দেখলে কাণ্ডটা!' অনিদ্রাক্লান্ত স্বরে সুশীল তার স্ত্রীকে বললে, 'কী শক্ত হাড় বুড়োর। মরতে-মরতে বেঁচে উঠলো!'

ব্যাপারটা জগবন্ধুকে রীতিমতো ভয় পাইয়ে দিয়ে গেলো। মৃত্যু এত কাছে, সত্যি-সত্যি এত কাছে! শিগগিরই মরবো, তা একটা তথ্য হিশেবে জানা এক কথা, আর সত্যি-সত্যি মুখের উপর মৃত্যুর ভীষণ নিশ্বাস অনুভব করা সম্পূর্ণ আর। আজ তিনি নেহাৎই বরাতজোরে বেঁচে উঠেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় আক্রমণ হয়তো আর সইবে না। ক্ষমাহীন, নিষ্ঠুর, মৃত্যু আছে সব সময় তাঁর কাছে-কাছে, তাঁর অভ্যন্তরে—তাঁর অদৃশ্য সঙ্গী, অদৃশ্য শত্রু—যে-কোনো মুহূর্তে, এতটুকু ভাববার সময় না-দিয়ে, ঝোপের আড়ালে লুকোনো হিংস্র পশুর মতো লাফিয়ে পড়বে তাঁর উপর। যেমন ক'রে হোক, তাকে ঠেকিয়ে রাখা চাই। চাই-ই। সুশীল বলেছিলো রাঁচির কথা। একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কী। বুনো, বিশ্রী জায়গা, রাঁচি; আর বাড়ি ছেড়ে, তাঁর এই তেতলার ঘর ছেড়ে পৃথিবীর কোথাও গিয়ে তিনি আরাম পাবেন না। কিন্তু আগে বাঁচলে তবে তো আরাম। রাঁচির হাওয়ায় নাকি কী-সব গুণ আছে। উপায় যখন নেই···উপায় যখন নেই। সুশীলকে বলতে হয় রাঁচির বাড়িটা ঠিকঠাক করাবার ব্যবস্থা করতে।

পুবের জানলা দিয়ে সকালবেলার তীব্র রোদ চৌকো হ'য়ে তক্তপোশের পায়াতে এসে ঠেকেছে। ঘরটি নিখুঁতরকম পরিষ্কার; সুরমা ভোর হ'তেই ঘর ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে ক'রে এখন দুটো ফুটিয়ে রাখতে গেছে রান্নাঘরে। সমস্ত বাইরের পৃথিবী আলোয় আলোময়, যেন আলোর চেয়ে সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী, স্বতঃ-উৎসারিত কোনো অজ্ঞাত পদার্থে বিশ্ব উদ্ভাসিত। ঘরের ভিতরেও সেই আশ্চর্য দীপ্তি; কোনো খামখেয়ালি দেবতা যেন মায়া-স্পর্শে সমস্ত তুচ্ছ, পরিচিত জিনিশকে অভাবনীয়ত্বে রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছেন।

সানুর পাশে ব'সে ভবকুমার তাকে টেমপেস্টের ছবি দেখাচ্ছে। কাৎ হ'য়ে শুয়ে, গালের নিচে এক হাত রেখে, বড়ো-বড়ো গম্ভীর চোখ মেলে সানু দেখছে, অন্য হাতের আঙুল দিয়ে ছবির কোনো বিশেষরূপে কৌতূহলোদ্দীপক অংশ নির্দেশ করছে আর আস্তে-আস্তে কথা বলছে।

'প্রস্পারো অমন চ'টে আছ কেন, বাবা?'

'এরিয়েলকে শাসাচ্ছে।'

'কেন এরিয়েলকে শাসাচ্ছে?'

'ওকে খাটিয়ে নিচ্ছে যে।'

'এরিয়েল কী সুন্দর দেখতে - ওকে খাটাচ্ছে কেন?'

'এরিয়েল পরি কিনা—ওকে যা করতে বলবে, তা-ই ও করবে।'

'তা হোক, কিন্তু প্রস্পারো ওকে বকছে কেন?' প্রস্পারোর দীর্ঘ, উড়ন্ত দাড়ি আর জলজ্বলে চোখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে সানু তার মত ব্যক্ত করলো, 'প্রস্পারো ভালো না।' তার কোটরগত চোখ যেন মুহূর্তের আলোর ঝলকে পরিস্ফুট, সজীব হ'য়ে উঠলো। সেই দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে ভবকুমারের সমস্ত শরীরে একটা আনন্দের রোমাঞ্চ খেলে গেলো। সানুর গালেও যেন আজ একটু রং ধরেছে; বেশ স্বাভাবিক-ভাবে কথাবার্তাও বলছে। এ-ক'দিন কেমন যেন নির্জীব হ'য়ে ছিলো; সব সময় চোখ বুজেই থাকতো, প্রতি মুহূর্তে যেন একটা অদৃশ্য ক্ষতমুখ থেকে একটু-একটু ক'রে তার প্রাণ-শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ হঠাৎ—কী হ'লো? ভবকুমার অবাক হ'য়ে ভাবলো, শেষ পর্যন্ত সানু এমনিতেই সেরে উঠবে না তো? কিছুই বলা যায় না, অনেক সময় এ-রকম হয়, শোনা গেছে।

'সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, বাবা!'

'হ্যাঁ, দ্যাখো। জাহাজ ডুবছে, আকাশে পরিরা গান করছে।'

'উঃ, কত বড়ো ঢেউ!'

'প্রকা—ণ্ড!'

'সমুদ্র কেমন, বাবা?'

'ম স্ত। তার শেষ নেই। জল, জল, খালি জল। ঢেউয়ের পর ঢেউ।'

'দ্যাখো, বাবা, এ-ঢেউটা ঠিক একটা হাতির মতো। একটা হাতি শুঁড় তুলে তেড়ে আসছে। কী মজা!' সানু ক্ষীণ একটা আনন্দের শব্দ ক'রে উঠলো। তারপর হঠাৎ বললে, 'বাবা, আমি সমুদ্র দেখবো।'

'দেখবে বইকি, সানু।'

'কবে?'

'তুমি বড়ো হ'য়ে নাও—'

'না, না, বড়ো হ'তে তো এখনো আমার ঢের দেরি। আমি এখনি সমুদ্র দেখবো—এখনি।'

'এ-ছবিটা দ্যাখো, সানু; দ্যাখো, গাছের নিচে শুয়ে এরিয়েল স্বপ্ন দেখছে—'

'না, আমি ছবি দেখবো না, ছবি দেখবো না, আমি সমুদ্র দেখবো।'

'বেশি চেঁচিয়ো না, লক্ষ্মী—'

সানু তার দুর্বল শরীরের পক্ষে যথাসম্ভব চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, 'আমি সমুদ্র দেখবো, আমি সমুদ্র দেখবো।'

সেই যে সানুর মাথায় কী ঢুকলো, তারপর ছেলের মুখে আর-কোনো কথা নেই; থেকে-থেকে খালি ব'লে ওঠে, 'সমুদ্র দেখবো, সমুদ্র দেখবো।' দুপুর পর্যন্ত সে ছটফট করলো, মা-বাবাকে মেরে-খামচে অস্থির ক'রে তুললো, আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো তার চোখ, সমস্ত মুখ রক্তিম। তারপর বিকেলের দিকে আস্তে-আস্তে সে শান্ত হ'য়ে এলো। সুরমা তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সানু তার অস্বাভাবিক-উজ্জ্বল চোখ মেলে চুপচাপ শুয়ে রইলো—একটি কথা বলছে না, অথচ চোখ বুজবে না কিছুতেই। ঘণ্টাখানেক এমনি কাটলো, তারপর হঠাৎ সে অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'মা।'

তার মুখের সঙ্গে প্রায় মুখ লাগিয়ে সুরমা বললে, 'কী সানু, কেমন লাগছে?'

সানু আর-একটু দীর্ঘ ক'রে টেনে আবার বললে, 'মা।'

সুরমা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালো। ভবকুমার কোনো কথা বললো না, শরীরের কোনো ভঙ্গি করলো না; একটু দূরে চেয়ারে যেমন ছিলো, তেমনি ব'সে রইলো। তাহ'লে তা-ই হ'লো! তা-ই তো হবে—এ তো জানা কথাই—তবু একটু আগে, এই একটু আগেই সে আশা করেছিলো—

'মা, মা।' একটু পরে-পরে, পাখির ছানার মতো দুর্বল, ক্ষীণ স্বরে সানু ব'লে উঠতে লাগলো। আর-সব কথা সে যেন ভুলে' গেছে, ঐ একটি কথা দিয়েই যেন সে তার মনের সব আকাঙ্ক্ষা, শরীরের সব যন্ত্রণা, এই অর্থহীন, অসহ্য যন্ত্রণা-ভোগের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ, বাঁচবার জন্য তার ব্যাকুলতা, বড়ো হ'য়ে অপূর্ব সুন্দর একটা বাড়ি বানাবার কল্পনা, কবিতার আর কাঁচা আমের জন্য তার ভালোবাসা—সব প্রকাশ করতে চায়। সুরমা আর ভবকুমার স্তব্ধ; শ্রান্তিহীন, নিষ্ঠুর, মুহূর্তের সঙ্গে মুহূর্ত সংযোজিত হ'য়ে চিরকাল রচনা ক'রে যাচ্ছে।

শেষটায় ভবকুমার চেয়ার ছেড়ে উঠলো। কম্বলের নিচে সানুর পায়ের উপর হাত রাখলো একবার। হিম। নিচের দিক থেকে আক্রমণ আরম্ভ ক'রে মৃত্যু আস্তে-আস্তে উপরের দিকে পথ ক'রে যাচ্ছে। সানুর ছোটো শরীরে মৃত্যু এখন বাসা বেঁধেছে; সানুর মধ্যে মৃত্যু এখন একমাত্র জীবিত শক্তি। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে, এতদিন যা সানু ছিলো তা পরিণত হবে কতগুলো রাসায়নিকের সমাবেশে। যা ছিলো সানুর শরীর তা হবে অগণ্য মৃতাশী জীবাণুর বাসা। এই মৃত পা-টিতে শুরু হয়েছে পরমাণুর মুক্তি-নৃত্য।

সান্নু আর-কোনো কথা বলছে না ; শুধু তার দু'কাঁধ যেন ভিতর থেকে ধাক্কা খেয়ে মাঝে-মাঝে কেঁপে উঠছে। আর তার বড়ো ক'রে খোলা চোখে পাথরের চোখের মতো নিশ্চল দৃষ্টি। ক্রমে-ক্রমে কাঁধের সে-ঝাঁকুনিও থেমে গেলো, হাত দু'খানা কাঠের মতো স্থির হ'য়ে দু'পাশে প'ড়ে আছে। চোখে তার পাতা পড়ছে না, নিষ্পলক দৃষ্টিতে অসহ্য উজ্জ্বলতা। সমস্ত শরীর থেকে তাড়া খেয়ে সান্নুর সবটুকু জীবনীশক্তি যেন তার চোখে এসে আশ্রয় নিয়েছে। একবার তার ঠোঁট ন'ড়ে উঠলো ; তক্ষুনি কেউ যেন আঠা দিয়ে তার দু'ঠোঁট আটকে দিলে। মৃত্যুময় দেহটিতে তখনো জ্বলজ্বল করতে লাগলো জীবন্ত-বিস্ফারিত দু'টি চোখ।

১৯৩১ 'অদৃশ্য শত্রু'

চোর! চোর!

অন্ধকারে চোখ মেলে ললিতা প্রথমটায় কিছুই দেখতে পেলো না। তবে, একটু আগে, ঘুমের মধ্যে একটা শব্দ সে শুনেছে, তা ঠিক। ঠিক তো? তার ঘুম খুব পাৎলা, একটুতেই ভেঙে যায়। আগেকার দিনে—ছেলেবেলায়—সে ভীষণ ঘুমুতো। এমন ঘুমুতো যে ভূমিকম্পে বাড়ি ভেঙে পড়লেও তার ঘুম ভাঙতো না। একবার—সতেরো বছর বয়সে—সে তখন সবে নাম লিখিয়েছে—একটি ছেলে এলো তার কাছে, ভারি সুন্দর দেখতে। কত মিষ্টি কথা যে বললে তার হিশেব নেই। ছেলেমানুষ সে, মিষ্টি কথায় ভুলেছিলো। ছেলেটিকে থাকতে দিয়েছিল রাত্রে। পরদিন যখন তার ঘুম ভাঙলো, ছেলেটি নেই। ললিতার দু'হাত ভরা চুড়ি ছিলো, তাও নেই। কানে দুল ছিলো, তা-ও অদৃশ্য হয়েছে। পাশের ঘরের মালতী বলেছিলো—এখনো ললিতার সে-কথা মনে পড়ে—'এখন আর কাঁদাকাটি ক'রে কী হবে, বল। তোর যেমন বুদ্ধি, তেমনি হবে তো! বলি, রাত্তিরে কখনো কোনো বাবুকে ঘরে রাখতে আছে! ফুর্তি ক'রে টাকা গুনে দিয়ে চ'লে যাও—এর বেশি আবার কার সঙ্গে কী সম্পর্ক! যেমন গিছলি পিরিত করতে, পেলি তো ফল! প্রাণে যে মেরে যায়নি, এই তোর সাত পুরুষের ভাগ্যি। পুরুষমানুষকে কেউ কখনো বিশ্বেস করে, পোড়ারমুখি! আর কী রাক্কুসে ঘুমই বা তোর—কান থেকে দুল খসিয়ে নিলে, কিচ্ছু টের পেলিনে। আফিং-টাফিং খাইয়েছিলো নাকি?…'

পুরুষমানুষকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে! না—তার পর থেকে, সে অন্তত কখনো করেনি। সর্বদা সজাগ, সর্বদা সতর্ক। অতিথির মনোরঞ্জন করতে তাকে হেসে কথা কইতে হয়, গান গাইতে হয়; অলস কটাক্ষ-বিলাসে, উদ্দীপক দেহভঙ্গিতে মোহ-বিস্তার করতে হয়, কিন্তু তার মনের এক কোণে কড়া পাহারা ব'সে থাকে সব সময়। মদের নেশাতেও তা ঝিমিয়ে পড়ে না, ঘুমের মধ্যেও তা ঘুমোয় না। সর্বদা সন্ত্রস্ত, সর্বদা সজাগ। কোথায় খুট ক'রে একটু শব্দ হ'লো, অমনি সে জেগে উঠলো। তার ঘরেই শব্দ একটা হয়েছে - ঠিক তো? ললিতা চোখ খুলে রেখে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ধ্রাম!—উঃ! সঙ্গে-সঙ্গে ললিতা হাত বাড়িয়ে বেড-সুইচ টিপলো।

মশারি তুলে বিছানার বাইরে আসতে-আসতেই তার চোখ পড়লো উল্টো দিকের

দেয়ালের বড়ো আয়নায়। সেখানে দেখলো, ঘরের মাঝখানকার গোল টেবিলের পাশে একটা চেয়ার উল্টে গেছে, আর একটা মনুষ্য-মূর্তি চেয়ারটার পিঠে হাত রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরাতেই লোকটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হ'লো। ঠিক চোখোচোখি—তার বেশি নয়। কারণ লোকটির মুখ কালো একটা মুখোশে ঢাকা; নাকের দু'পাশে দুটো গর্তের ভিতর দিয়ে কালো একজোড়া চোখ ঝকঝক করছে। লোকটির পরনে—ললিতা একদৃষ্টিতে দেখে নিলে—জিনের একটা হাফপ্যাণ্ট, অত্যন্ত নোংরা। গায়ে বেখাপ্পারকম ফর্শা একটা হাত-কাটা শার্ট। খালি পা। মাথার চুল যেন আঠা দিয়ে লেপটে উপর দিকে তুলে দেয়া হয়েছে।

নিজের অজ্ঞান্তে ললিতার বুক থেকে একটা চীৎকার উঠে আসছিলো, সচেতন চেষ্টায় সে সেটা রোধ করলে। পুরুষ চরিয়ে যাকে খেতে হয়, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেলে তার চলে না। নিতান্ত নিঃসহায় তার জীবন, সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর। ঘোর বিপদেও রক্ষা করবার কেউ নেই; অনিষ্ট যে-কেউ করতে পারে। বছরের পর বছর অনেক বিপদে, অনেক দুঃখে, অনেক ক্ষতিতে নিজেকে নিজেই সামলাতে হয়েছে; স্বাধীন আত্ম-রক্ষায় সে অভ্যস্ত। তাই নিস্তব্ধ রাত্রিশেষে একা বন্ধ ঘরে এই আকস্মিক মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে একেবারে দিশেহারা হ'য়ে পড়লো না। ভয়ে তার বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করছিলো; কিন্তু সে জানতো, বাইরের প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ না-রাখতে পারলে এ-অবস্থায় উপায় নেই।

একটু সময় উভয় পক্ষই নিঃশব্দ, নিশ্চল; তারপর হঠাৎ যেন মোহ থেকে জেগে উঠে ললিতা পিছন দিকে এক পা বাড়ালো।

লোকটি শাঁ ক'রে প্যাণ্টের পকেট থেকে ছোটো কালো একটা জিনিশ বের ক'রে ললিতার দিকে উঁচু ক'রে ধরলে।—'কোনো দিকে এক পা নড়েছো কি মরেছো!' গম্ভীর, ভীষণ কণ্ঠস্বর নয়; বরং কাঁপছে যেন। ললিতা একটু অবাকই হ'লো। পিস্তলের নলটা একটা হিংস্র নিষ্পলক চোখের মতো তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে, লোকটার তর্জনী একটু যদি ন'ড়ে ওঠে—একটু টান—ভীষণ শব্দ, অনেক ধোঁয়া, খানিকটা আগুন তার বুকের ভিতরে ঢুকে বেরিয়ে গেলো। ললিতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। খুব আস্তে বললে, 'কী চাও তুমি?'

'কী চাই?' মুখোশ ভেদ ক'রে খানিকটা বিকৃত হাসির শব্দ বেরিয়ে এলো, 'সবাই যা চায়—টাকা।'

'কিন্তু ঘরে তো কিছু নেই।'

কালো মুখোশের ফাঁকে এক জোড়া কালো চোখ হেসে উঠলো যেন।—'বেশ, খুঁজে

দেখা যাক, কিছু আছে কি নেই। তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করতে হচ্ছে—কিছু মনে কোরো না। তুমি কি একটু কষ্ট ক'রে চাবিগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে আসবে?' পিস্তলের ঘোড়ার উপর সে যেন আদরে একবার আঙুল বুলোলো।

ললিতা মনে-মনে হিশেব ক'রে দেখলো যে চীৎকার ক'রে কোনো ফল হবার আশা নেই। চীৎকার ক'রে গলা ভেঙে ফেললেও নিচে ভাঙের ঘুমে অচেতন দরোয়ানজির কানে তা পৌঁছবে না। দোতলার রাসমণি হয়তো ছুটে আসতে পারে, কিন্তু তার আগেই লোকটা হয়তো তর্জনী একটু নাড়বে, আর সঙ্গে-সঙ্গে…। লোকজন ডেকে জড়ো করবার অপেক্ষায় সে থাকবে না, তা ঠিক। ললিতা এক ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে? আড়চোখে সে তাকিয়ে দেখলো, দরজা বন্ধ; খুলতে যে-সময় নেবে, তা পোষাবে না। রাস্তার দিকে ছোটো একটা বারান্দায় যাবার দরজা—সে প্রায়ই সেটা খুলে শোয়, আজ কী মনে ক'রে যেন বন্ধ করেছিলো। ও বারান্দায় পৌঁছতে পারলেও একরকম হ'তো; এ-রাস্তায় গভীর রাতেও দুটো-একটা লোক থাকেই, আর উল্টো দিকের পানের দোকানটা তো প্রায় সারা রাতই খোলা। কিন্তু তাতেই বা কী লাভ হ'তো? সেই নিষ্পলক, হিংস্র দৃষ্টি—তাকে সে কী ক'রে এড়াবে?

'শিগগির, শিগগির—বেশি সময় নেই। ভূতের সঙ্গে আমার মিল এই যে ভোর হবার আগেই আমাকে অদৃশ্য হ'তে হবে।—আর খানিকটা মিল সম্প্রতি চেহারায়—কী বলো?' আবার অস্পষ্ট হাসি শোনা গেলো।

'কিন্তু সত্যি বলছি—কিছু নেই। হয়তো রোজকার খরচের দু'দশ টাকা—তাতে তোমার খাটনিও পোষাবে না।'

'কেন—পুরুষমানুষকে ছাগল বানিয়ে যে মুঠো-মুঠো টাকা বা'র ক'রে নাও, সে-সব কী হ'লো?'

'এটা বোধ হয় জানো যে আজকালকার দিনে সবাই ব্যাঙ্কেই টাকা রাখে?'

'হুঁ।' একটু পরে: 'যাক—যা পাওয়া যায়, তা-ই সই। দু'দশ টাকাও মন্দ নয়। তাছাড়া, গয়না-টয়নাগুলো—তাও কি ব্যাঙ্কে জমা রেখেছো?'

ললিতার বুকের ভিতরটা ধ্বক ক'রে উঠলো। তার আলমারির দেরাজে প্রায় তিরিশ হাজার টাকার অলংকার রয়েছে—সোনা-হিরে-মুক্তোয় গা-ঘেঁষাঘেঁষি, আলোর এক রাজ্য। তার সমস্ত জীবনের উপার্জন, তার জীবনের আলো। ও-গুলো যদি নিয়ে যায়-!

'চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছো কেন? বা'র করো চাবি।'

উপায় নেই, কোনো উপায় নেই। ললিতা নড়তে চাইলো, কিন্তু তার পা দুটো অসম্ভব ভারি হ'য়ে উঠেছে।

'আঃ, সময় নষ্ট কোরো না, বলছি! লক্ষ্মী মেয়ের মতো চাবির গোছাটা আমার হাতে তুলে দেবে, না সেটাও আমাকেই কষ্ট ক'রে খুঁজে বা'র করতে হবে?'

উপায় নেই, উপায় নেই। ললিতা চেষ্টা করলো নড়তে;—কিন্তু তার শরীর পাথরের মতো স্থির। শুধু তার চোখ মশারির হালকা আবরণ ভেদ ক'রে পড়লো গিয়ে তার বিছানায়, প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে, তারপর স্পষ্ট হ'য়ে বালিশের উপর। কালো মুখোশের নিচে কালো দুই চোখ তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করলো।

'আঃ—thank you', বালিশ তুলতেই তার নিচে চাবির গোছা পাওয়া গেলো। 'Thank you', চাবিগুলোকে লোকটা আঙুল দিয়ে একটু আদর করলো।—'এবার তাহ'লে একটু খুঁজে দেখা যাক—কী বলো?' যেন ললিতারই অনুমতির জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

এতক্ষণে ললিতা তার কণ্ঠস্বর ফিরে পেলো। 'তুমি কত টাকা চাও বলো, আমি দিচ্ছি।'

'বা-বাঃ, এখন যে একেবারে দয়ার অবতার, রানি! কী দেবে? বাজার খরচের দু'দশ টাকা?'

'যা তুমি চাও। এক্ষুনি চেক লিখে দিচ্ছি।'

'চেক?...বাঃ, আমি ভাঙাতে যাই, আর এদিকে তুমি ব্যাঙ্কে খবর দিয়ে রাখবে—ঠেলবে হাজতে! না, তোমার এ-দয়া নিতে পারলুম না, দুঃখিত।'

'না—সত্যি। আমি মোটেও খবর দেবো না ব্যাঙ্কে। সত্যি তোমাকে দিয়ে দেবো—ধরো, এক হাজার? কাল ঠিক দশটার সময় তুমি কড়কড়ে হাজার টাকা পেয়ে যাবে।'

লোকটা যেন একটু ইতস্তত করছে। অমনি ললিতা বললে, 'আচ্ছা, দেড় হাজার! হবে ওতে?'

লোকটা মনে-মনে কী-যেন একটু হিশেব করলো, তারপর যেন নিজের মনেই ব'লে উঠলো, 'নাঃ—বেশ্যার কথায় যে বিশ্বাস করে, নরকেও তার জায়গা হয় না।'

'তাহ'লে আমার কথাটা তুমি রাখলে না?'

'বেশি কথা বোলো না—যা বলছি, তা-ই করো।'

'কী করতে হবে, বলো।' এতক্ষণে ললিতা তার স্বাভাবিক আত্মস্থতা ফিরে পেয়েছিলো।

'এই নাও চাবি—ঐ আলমারিটা খোলো তো।'

'দাও।' ললিতা হাত পাতলো। চাবি দিতে গিয়ে লোকটার আঙুল তার হাতে লেগে গেলো।

'বাঃ, বেশ নরম তো তোমার আঙুল।'

'ও-সব প্যাঁচ আমার উপর চলবে না, সুন্দরী। যাও—খোলো আলমারি।'

'যদি না খুলি?'

'আমাকেই খুলতে হবে তাহ'লে।

'যদি বাধা দিই?'

'তাহ'লে এই যে—' উঁচোনো পিস্তলটায় (এতক্ষণের মধ্যে সে একবারও সেটা নামায়নি) সে একবার ঝাঁকুনি দিলে।

'তাহ'লে আমাকে সত্যি মেরে ফেলবে?'

'না, মেরে ফেলবো কেন? ঠ্যাংটা শুধু একটু খোঁড়া ক'রে দেবো, যাতে আমি স্বচ্ছন্দে পালাতে পারি।'

'তারপর বাকি জন্ম আমি খোঁড়া হ'য়ে থাকবো?'

'বোধহয়।'

'না, না, খোঁড়া হ'য়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না। সে বড়ো বিশ্রী। তার চেয়ে বরং আমায় মেরে ফেলো।'

'তা ঠিক জায়গায় লাগলে ম'রেও যেতে পারো।'

'আচ্ছা—তুমি যে আমাকে মেরে ফেলবে, একটু কষ্ট হবে না তোমার?'

'কষ্ট কিসের? তোমার মতো জঘন্য জীবন যত শিগগির শেষ হয়, ততই ভালো।'

'তা হোক, তবু—আচ্ছা, আমার মতো সুন্দর মানুষ কখনো দেখেছো?'

কালো মুখোশের নিচে কালো দুই চোখ মুহূর্তের জন্য ললিতার মুখের উপর নিবদ্ধ হ'য়েই আনত হ'লো।—'তোমার সঙ্গে রসালাপ করতে আমি এখানে আসিনি। যা বলছি করো।'

আস্তে-আস্তে ললিতা আলমারির কাছে গেলো লোকটি ঠিক তার পিছনে। আলমারির দরজায় প্রকাণ্ড, ঝকঝকে আয়না, সেখানে ললিতা নিজের ছায়া দেখে একটু স্তব্ধ না-হ'য়ে পারলো না। অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে বিচার করলেও মানতে হয় যে সে সুন্দরী। অপরিপূর্ণ ঘুমে ঈষৎ ফোলা-ফোলা তার চোখ—সন্ধ্যাবেলা সে যে সুর্মা মেখেছিলো তার কালো আভা এখনো দুঃখের চিহ্নের মতো চোখের কোলে লেগে আছে; একরাশ এলো চুল পিঠে ছড়ানো—কালো, এখনো কালো। কিন্তু আর ক'দিন?

দিনে-দিনে বয়েস বেড়ে চলে—বয়েস তো কারো কথা শোনে না। তার এমন যে নিটোল মজবুত শরীর—তাও একদিন ভেঙে পড়বে। সময় আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু—অদৃশ্য, অপরাজেয়। তার হাত এড়াতে কেউ পারেনি; ললিতা, তুমিও পারবে না। তবু—যে ক'দিন হয়। এখনো হয়তো বছর দশেক মেয়াদ আছে। তার ভাগ্য ভালো; অনেক বাঙালি মেয়ের চাইতেই তার যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হ'লো। জ্বালিয়ে যাও, ললিতা, আর যে-ক'দিন পারো, জ্ব'লে যাও, জ্বালিয়ে যাও। আয়নায় ছায়ার মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটলো।

'চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

ললিতা মুখ ফিরিয়ে সেই কালো মুখোশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'নিজের চেহারা দেখছিলাম। সুন্দর—কী বলো?'

'খোলো!' লোকটির স্বর অধীর আগ্রহে কাঁপছে, 'খোলো!'

'খুলছি।' চাবি লাগিয়ে ললিতা হঠাৎ আবদারের সুরে ব'লে উঠলো, 'তোমার পিস্তলটা নামাও—আমার বড়ো ভয় করছে।'

'আমার কথা-মতো চলো—কিছু ভয় নেই তোমার।'

ললিতা চাবি ঘুরিয়ে আলমারি খুললো। উপরের তাকগুলো সব শাড়িতে ঠাশা। সেখানে হাত রেখে ললিতা বললে, 'তোমার বৌ আছে?

লোকটি হুমকি দিয়ে উঠলো, 'ফাজলেমি!'

ললিতা হতাশভাবে একটু ঘাড় নেড়ে বললে, 'কী মুশকিল! ভালো কথা কইলেও যে চ'টে যায়—'

'থাক, তোমাকে এখন ভালো কথা কইতে হবে না। কী আছে বের করো দিকি।'

'আছে তো এক বোঝা শাড়ি—মরলে পরে সব চিতেয় যাবে আরকি। মেয়েটাও ম'রে গেলো—নইলে অ্যাদ্দিনে কি আর ওর শাড়ি পরবার বয়েস না হ'তো। বলছিলাম কী—ভালো দেখে একখানা বেছে বৌয়ের জন্যে নিয়ে যাও—বৌ খুশি হবে। তা তুমি তো চ'টেই উঠলে। চাও তো আমিই বের ক'রে দিচ্ছি। এই যে, এখানা—' ললিতা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উপরের তাকের তলা থেকে আগুনের রঙের একটা শাড়ি টেনে বের করলে—'পছন্দ হয়? খাঁটি বেনারসি সিল্ক—হাজার টাকা এর দাম।'

'হাজার টাকা?'

'ছিলেন এক জমিদারবাবু—মৈমনসিং জেলায় বাড়ি। বড্ড ভালোবাসতেন আমাকে। তিনি দিয়েছিলেন এখানা। ভদ্দরলোকের দিলটা খুব খোলা ছিলো—তা এমন কপাল, অকালে ম'রে গেলেন। লিভার নাকি প'চে গিয়েছিলো।' ললিতা শাড়ির ভাঁজ খুললো,

মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো খানিকটা—'ভালো জিনিশ—একশো বছরেও কিছু হয় না। নিয়ে যাও না এখানা বৌয়ের জন্য।'

লোকটা হাত দিয়ে শাড়িখানা একটু নেড়ে-চেড়ে বললে, 'হুঁ। ভালো জিনিশ—না? হাজার টাকা দাম। হাজার টাকা দামের আরো শাড়ি আছে তোমার?'

'ক—ত! আরো চাই দু'একখানা?'

'ছাই! বৌ-ফৌ আছে নাকি যে নিয়ে যাবো!'

'ও—তুমি বুঝি বিয়ে করোনি? আহা—কেন গো?'

'তোমার সঙ্গে এখন ঘরোয়া আলাপ করবার সময় আমার নেই। দেরাজগুলো খোলো। গয়না কী আছে দেখি।'

'হ্যাঁ, গয়না।—দেখছি।' আগুনের রঙের শাড়িটা এলোমেলো হ'য়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো। ললিতা নিচু হ'য়ে উপরের দেরাজে চাবি লাগিয়ে বললে, 'পিস্তলটা নামাও না ভাই। বড্ড ভয় করছে আমার।'

'কী ছেলেমানুষের মতো কেবল ভয় করছে! ভয় করছে! আর - ছাখো, আমাকে ভাই-টাই বলবে না।'

'ওমা, কেন? একজনকে ভাই বললে কী দোষ?'

'আছে দোষ।'

'কী বলবো তা'হ'লে?' ললিতা মুখ ফিরিয়ে চপল হাসি-ভরা চোখ তুলে তাকালো. 'প্রভু?' সঙ্গে-সঙ্গে উপযুক্ত থিয়েটারি মুখ-ভঙ্গি ক'রে—'নাথ? প্রাণেশ্বর?'

'ফাজলেমি—না?' লোকটা রাগে যেন গর্জাচ্ছে।

'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ কিন্তু।' ললিতা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

'ছাখো, বাড়াবাড়ি করবে তো মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো। খোলো শিগগির দেরাজ।'

ললিতা এক টানে দেরাজ খুলে ফেললো। লোকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ঐ বাক্সটা দেখি।' তার নির্দেশমতো ললিতা কুমিরের চামড়ার বেশ বড়ো একটা অ্যাটাশে কেস বা'র ক'রে পাশের একটা টিপয়ের উপর রাখলো। তারপর লোকটা কিছু বলবার আগেই সেটা খুলে ফেলে বললে, 'দেখবে'সো।'

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে লোকটা ঝুঁকে তাকালো। খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না। ললিতা তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে, 'বেশ সুন্দর, না?'

'বেশ।' লোকটার গলা দিয়ে স্বর যেন ফুটছে না।

'বেশ! শুধু বেশ! এত সুন্দর জড়োয়া গয়না তুমি দেখেছো কখনো?' লোকটা কোনো কথা বললে না। 'এই সব—' হঠাৎ ললিতার স্বর অত্যন্ত কোমল হ'য়ে এলো, 'স—ব তুমি নিয়ে যাবে?'

'আপত্তি আছে তোমার?'

'আমাকে একেবারে বিধবা ক'রে রেখে যাবে? উঃ, পুরুষের প্রাণ কী নিষ্ঠুর!'

এতক্ষণে লোকটার চোখ অ্যাটাশে কেস থেকে ললিতার দিকে ফিরলো।—'থাক, আর ন্যাকামো করতে হবে না।'

'ন্যাকামো! একে তুমি ন্যাকামো বলো!' ললিতার স্বর আবেগে ভারি হ'য়ে উঠলো, 'বলবেই তো! তুমি নিষ্ঠুর, তোমার হৃদয় নেই; তুমি কী ক'রে বুঝবে এই গয়নাগুলোকে আমি কত ভালোবাসি।'

'ইশ—এত মোহ! এ-কথা কখনো ভাবো, তুমি ম'রে গেলে এ-গয়নাগুলোর কী হবে?'

'ম'রে গেলে কী হবে? যা খুশি তা ই হবে। সে-কথা ভেবে কী লাভ? মেয়েটা যদি থাকতো তাহ'লে কি আর কোনো ভাবনা ছিলো? কী সুন্দর ছিলো দেখতে—মনের সাধ মিটিয়ে ওকে আমি সাজাতে পারতাম। গয়নাগুলোর দিকে যখনই তাকাই, ওর কথাই আমার মনে পড়ে।'

'তোমার মেয়ের কপাল ভালো—তাই সে মরেছে।' লোকটা এক হাতে অ্যাটাশে কেসটা বন্ধ করলে।

'ও কী? ওটা বন্ধ করছো কেন? সত্যিই কি সব নেবে তুমি?

'কত দাম হবে এগুলোর বলো তো? হাজার খানেক—?'

'ওমা, বলে কী!' ললিতা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো, 'উঃ, হেসে আর বাচিনে!'

'চুপ!' লোকটা হিংস্র স্বরে ব'লে উঠলো। 'বলো—এখানে কত টাকার গয়না আছে?'

ললিতা শান্তভাবে বললে, 'তিরিশ হাজারের একটি পয়সা কম না।'

'কত?'

'তিরিশ হাজার।'

'তি-রি-শ হা জা-র!' পরক্ষণেই স্বর বদলে: 'ও—তিরিশ হাজার। বে—শ। আচ্ছা, এবার তোমার দেরাজের অন্যান্য বাক্সগুলো একটু নেড়ে-চেড়ে দেখা যাক।'

'দেখাচ্ছি। কিন্তু—' করুণ মিনতির সুরে ললিতা বললে, 'কিন্তু আমার একটা কথা রাখবে?'

'না, রাখবো না।'

'বেশি কিছু নয়—সামান্য একটা হিরের আংটি; অত জিনিশের মধ্যে টেরও পাবে না তুমি। একজন আমাকে দিয়েছিলো।'

'এ-সবই তো তোমাকে কেউ-না-কেউ দিয়েছিলো?'

'সেইজন্যেই তো ওগুলোর উপর আমার এত মায়া। সমস্ত জীবন ভ'রে কত লোকের ভালোবাসা কুড়িয়ে এত-সব জিনিশ উপহার পেলাম—আর তুমি হঠাৎ এসে এক ফুঁয়ে সব উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছো! আর-সব নাও—কিন্তু ঐ আংটিটা কি দিয়ে যেতে পারো না? ওটা যে দিয়েছিলো, তাকে আমি ভারি ভালোবাতাম।'

'ভালোবাসতাম!' লোকটা হা-হা ক'রে হেসে উঠলো। 'ভালোবাসার কথা তোমার মুখেই মানায়!'

'যেন তোমার মুখেই মানায়! কী জানো তুমি ভালোবাসার? কখনো ভালো-বেসেছো কাউকে?'

'হয়েছে, এখন থামো!'

'না, কক্ষনো বাসোনি। তাহ'লে আমার এ-কথাটা তুমি রাখতেই। ওগো—এত ক'রে বললাম—'

'ওগো-টোগো বোলো না, বলছি।'

'থুড়ি—ভুল হ'য়ে গেছে। আচ্ছা, এত জিনিশের মধ্যে সামান্য একটা আংটি রেখে গেলে এমন-কী ক্ষতি হ'তো তোমার!'

'নাও—এবার ঐ বাক্সটা খোলো তো।'

'কোনটা? ঐটে? ওটা খুলে কী হবে- ওটাতে কিছু নেই।'

'কিছু-নয়টাই দেখা যাক।'

'বেশ।' চন্দনকাঠের একটা বাক্স—চাবিও ছিলো না। টানতেই ডালা উঠে এলো। 'এটার ভিতর সব চিঠিপত্র। প্রেম-পত্র। এগুলো কি তোমার কোনো কাজে লাগবে?' ললিতা বাক্সটা তুলে এনে টিপয়ের উপর রাখলো। 'আঃ—' ভিতরের চিঠিগুলো ঘাঁটতে-ঘাটতে—'এগুলো দেখে কত কথাই যে মনে পড়ে! কত বাবু এলেন—আর গেলেন।'

'সবাই তোমাকে চিঠি লিখতো?'

'ঝুড়ি ঝুড়ি। সব কি আর রাখা যায়? যাদের সঙ্গে খুব বেশি প্রণয় ছিলো, তাদের চিঠিগুলো সব আছে।'

'কেন রেখেছো?'

'এমনি—মাঝে-মাঝে দেখতে বেশ মজা লাগে।' ললিতা বাক্স থেকে একটা খাম বা'র করলো। 'এটা কার?…ও—' চিঠিটা খুলে চোখের সামনে ধরলো ললিতা। লোকটা ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো।

'ওগো, তুমি অত কাছে এসো না। আমার বড্ড ভয় করে।'

'ছী-ছি।' ব'লে লোকটা স'রে গেলো।

'ছী ছি কেন?'

'কী-সব লিখেছে!'

'এ আর কী! আরো কত সব আছে। ভারি রসিক ছিলো ছেলেটা। বড়োলোকের ছেলে, কলেজে পড়তো। দেদার টাকা উড়িয়েছে এখানে। গুণ-যোগ্যতাও ছিলো কিছু। গান গাইতে পারতো-পদ্য লিখতো, কাগজে ছাপা হ'তো সে-সব, আমাকে দেখাতো এনে। একবার আমার নামে মুখে-মুখে ছড়া কেটেছিলো, এখনো মনে আছে—

ওগো ললিতা—
প্রাণের প্রদীপে মোর
তুমি সলিতা।

তুমি সলিতা—ভারি মজার, না?' ললিতা হেসে উঠলো।

'হুঁ, এই হচ্ছে কলেজে-পড়া বড়োলোকের ছেলে।'

'এখন ডিপটি হয়েছে শুনলাম। ওরই আবার এক বন্ধু এসেছিলো কথায় কথা উঠলো—বিয়েও করেছে। বি. এ পাশ বৌ। ভারি মজা লাগে ভাবতে—কত ছেলে যে আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেলো—' মুহূর্তের জন্য ললিতা যেন অনেক দূরে চ'লে গেলো। 'তা ত্যাখো', উপস্থিত সময়ে ফিরে এসে ললিতা বলতে লাগলো, 'এই চিঠিগুলোও তুমি কাজে লাগাতে পারো।'

'কী ক'রে?'

'তা-ও বুঝতে পারছো না? ধরো, এই চিঠিগুলো যদি তোমাকে দিয়ে দিই—ডেপুটি-সাহেব নতুন বিয়ে করেছেন, ব্যাপারটা জানাজানি হোক তিনি তা নিশ্চয়ই চাইবেন না। আর তার জন্য অমন দু-পাঁচশো টাকা কি তোমায় দিয়ে না দেবেন!'

'ছী ছি—আমি বুঝি তা-ই করতে যাবো! এ তো blackmailing।'

'তা ইংরিজিতে ওকে যা-ই বলুক, এ ক'রে তুমি পয়সা কিন্তু পেতে পারো—যদি পয়সাই চাও।'

'যদি চাই! কে না চায়?'

'তাহ'লে তোমাকে যখন টাকা দিতে চাইলাম—নিলে না কেন? আমি ভাবলাম তোমার বুঝি গয়নাগুলো দিয়েই বিশেষ-কোনো দরকার, তাই তুমি ওগুলো নিচ্ছো।'

'দরকার আর কী! ওগুলো ভাঙিয়ে তিরিশ হাজার টাকা ক'রে নিতে কতক্ষণ!'

'ওমা, তুমি ওগুলো বেচতে যাবে নাকি? বলিহারি বুদ্ধি তোমার!'

'ত্যাখো—মুখ সামলে কথা বোলো।'

'তুমি কি মনে করেছো ওগুলো কোথাও নিয়ে বেচতে পারবে? তুমি কি মনে করেছো আমি পুলিশে খবর দেবো না? তুমি কি মনে করেছো যে ও-রকম গয়না সবারই থাকে যে তোমার হাতে তা দেখামাত্র যে-কেউ সন্দেহ করবে না?'

'তুমি কি মনে করেছো তোমার লেকচার শুনতে আমি এখানে এসেছি?'

'শুনলেও ক্ষতি নেই। আমার কাছে তোমার অনেক শেখবার আছে। তোমারই ভালোর জন্য বলছি—তুমি যদি ওর একটি গয়নাও বেচতে যাও, অমনি হাতে-হাতে ধরা পড়বে, আর পত্রপাঠ জেল।'

একটু চুপ ক'রে থেকে লোকটা বললে, 'তা-ই বা মন্দ কী? তবু তো জেলে গেলে খেতে পাবো।'

'কেন, এমনিতে তুমি কি খেতে পাও না?'

'ও-সব কথা দিয়ে তোমার কী দরকার?'

'থাক, থাক,' ললিতা অনুতপ্ত স্বরে বললে, 'তোমার ইচ্ছা না-হ'লে কিছু বোলো না। আহা—যে দিন-কাল পড়েছে—দেশে এমন টানাটানি আর কখনো হয়নি।'

'থাক, তোমাকে আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না। অভাবের তুমি কী জানো? কত জমেছে তোমার ব্যাঙ্কে? লাখ-খানেক?'

'পাগল! অত কী ক'রে হবে? তবে অল্প-স্বল্প কিছু যে নেই, তাও নয়।'

'তুমি তো দিব্যি পাপের পয়সা জমিয়ে যাচ্ছো—এদিকে কত লোক যে ভালো ক'রে দু'বেলা খেতে পাচ্ছে না, সে-খোঁজ রাখো? বলতে পারো, কী অধিকার আছে তোমার একা এত টাকা ভোগ করবার? ম'রে গেলে শ্মশানে নিয়ে যাবার লোকও তো তোমার নেই। কী হবে তখন তোমার এত টাকা দিয়ে?'

'সে-কথা যে আমিও না ভেবেছি, তা নয়। একটা ছেলেকে পুষ্যি রাখবো ভাবছি,

এমন-একটা ছেলে, সংসারে যার কেউ নেই-টেই। সে-রকম কারো খোঁজ দিতে পারো?' একটু পরে ললিতাই আবার বললো, 'খোঁজবার আর দরকার কী। এই তো তুমিই আছো। তুমি—হবে আমার ছেলে?'

'যাওঃ!'

'যাওঃ কেন? হও না।'

'রসিকতা, না?'

ললিতা হেসে উঠলো।—'ওঃ, ছেলেমানুষ! একেবারে ছেলেমানুষ!'

'ছাখো, ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ কোরো না ব'লে দিচ্ছি। তোমার বয়স কত শুনি?'

'ওগো ছেলেমানুষ, এ-ও কি জানো না যে মেয়েমানুষকে কখনো তার বয়স জিগেস করতে নেই?'

'যাও–যাও—তোমার বয়সের বা অন্য-কোনো বৃত্তান্ত জানবার কৌতূহল আমার নেই। আমার যে-বিষয়ে কৌতূহল আছে, তা হচ্ছে তোমার টাকা। শোনো—' (খুব গম্ভীরভাবে)—'তুমি তখন যা বলেছিলে, সত্যি?'

'কী বলেছিলাম?'

'সেই চেক লিখে দেবার কথা? সত্যি আমাকে দিয়ে দেবে টাকাটা? খবর দেবে না পুলিশে?'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি। তিনবার বললাম। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।' ললিতা লোকটার হাতের উপর হাত রাখলো।

ক্ষিপ্রগতিতে হাত সরিয়ে নিয়ে লোকটা বললে, 'তাহ'লে লেখো শিগগির। পাঁচ হাজার টাকা।'

'পাঁ চ হা জা র?—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাঁচ হাজার। শিগগির। তোমার গয়না-টয়না সব রইলো—ও আমি চাইনে। আমার দরকার টাকার। তোমার পাপের বোঝা খানিকটা হালকা ক'রে দিয়ে যাচ্ছি—ভালোই হ'লো তোমার।'

'আমি করবো পাপ, আর তুমি তার পুণ্যফল ভোগ করবে! মন্দ নয় ব্যবস্থা।'

'তোমার হ'য়ে টাকাগুলো মিছিমিছি প'ড়ে আছে, আমার হ'লে সেগুলো কাজে লাগবে। সুতরাং আসলে ও-টাকা আমারই। কোথায় তোমার চেক-বই বা'র করো।'

'ঐ ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজে চেক-বই আর কলম আছে—নিয়ে এসো না।'

'তুমি যেতে পারো না, না ?'

'বড্ড ভয় করছে যে—তোমার পিস্তলটা—'

'কিছু ভয় নেই। আমি তোমার সঙ্গে-সঙ্গে যাবো, কিন্তু তোমাকে ছোঁবোও না।'

'ছোঁবেও না! একেবারে ভীষ্ম—'

'ফের ফাজলেমি!

'আর করবো না—অভ্যাসের দোষ। কিন্তু তোমার পিস্তলটা একটু নামাও না—যদি ধরো কোনোরকমে ছুটে গেলো—'

'কী ঘ্যানরঘ্যানর করছো! এটা সত্যিকারের পিস্তল কিনা যে ছুটে গিয়ে তোমাকে মেরে ফেলবে!'

খানিকক্ষণ ওলোট-পালোট, অস্ফুট দু'একটা চীৎকার। তারপর ললিতা হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ালো। লোকটা মেঝেতেই ব'সে আছে; সেই আগুনের রঙের শাড়িটা দিয়ে তার দু'হাত পিঠ-মোড়া ক'রে বাঁধা। একটু দূরে তার পিস্তল আর মুখোশ প'ড়ে আছে। ভারি কাঁচা মুখ,—আঠারোর বেশি বয়স মনে হয় না। ভালো ক'রে যেন দাড়িগোঁফও ওঠেনি। কালো-কালো চোখ। চুলগুলো এলোমেলো হ'য়ে দু'দিকে ভাগ হ'য়ে পড়েছে। আশঙ্কায়, হতাশায় বিমর্ষ গম্ভীর মুখ। স্থির দৃষ্টিতে মেঝের দিকে সে তাকিয়ে।

ঘরের এক কোণে একটা টেলিফোন ছিলো; ললিতা আস্তে-আস্তে সেখানে গিয়ে মৃদুস্বরে জিগেস করলে, 'এইবার ডাকি তাহ'লে পুলিশ ?'

লোকটা তার কালো-কালো চোখ তুলে একবার ললিতার দিকে তাকালো; কোনো কথা বললে না।

'যদি কিছু মনে না করো—' ললিতা টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালো।

'না, না,' সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা চীৎকার ক'রে উঠলো, 'না, না।' দু' পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে টলতে-টলতে সে উঠে দাঁড়ালো—তার পিঠ একটু বেঁকে গেছে, মাথা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে—মুহূর্তের মধ্যে সে ললিতার কাছে এসে দাঁড়ালো। তার পিছনে মস্ত লম্বা শাড়িটা লাল রঙের প্রকাণ্ড একটা লেজের মতো গড়াচ্ছে।

ললিতার তীব্র চোখ লোকটাকে বিদ্ধ করলো।—'বারণ করছো পুলিশ ডাকতে ?'

লোকটি মাথা নিচু ক'রে চুপ।

'নিজেই তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করবো তাহ'লে? কী হবে তোমার শাস্তি ?' ললিতা ঠোঁটের এক কোণ কামড়ে ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলো।

'তোমার যা খুশি তা-ই করো,' নিষ্প্রাণ স্বরে লোকটি বললে, 'বোকা—আমার মতো বোকা আর হয় না।'

'সে-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই, ভাই.' মিষ্টি হেসে ললিতা বললে, 'পুরুষমানুষ যদি মাঝে-মাঝে বোকাই না-বনবে, তাহ'লে আমাদের চলবে কী ক'রে, বলো।'

লোকটি কথা না-ব'লে ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। 'দুঃখের বিষয়,' তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ললিতা বললে, 'তোমার পক্ষে এখন পালানো শক্ত। জোর যদি করতে যাও, কিছু লাভ হবে না, বরং চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মতো ব'সে থাকো। লাফালাফি করতে গেলে হয়তো হাত-পা ভাঙবে। আচ্ছা,' লোকটিকে চুপ দেখে ললিতা জিগেস করলে, 'তুমি কী ক'রে ঢুকলে এ-ঘরে?'

'পাইপ বেয়ে।'

'পাইপ বেয়ে! মাগো—ভয় করলো না তোমার! যদি প'ড়ে যেতে!'

'যেতাম তো যেতাম। অত ভাবলে কি আর চলে।'

'তাই ব'লে পাইপ বেয়ে এই তেতলার ঘরে - তোমার এত সাহস, অথচ পুলিশকে তোমার ভয়!

'সাহস! সাহসই বটে। অমন দায়ে-পড়া সাহস অনেকেরই হয়।'

'দায়ে-পড়া কেন?'

আমি আর কথা বলতে পারছি না, তুমি যা করবার করো—এই আমি বসলাম।' লোকটি কোনোরকম ক'রে একটা চেয়ারে বসলো।

'তোমার ব'সে খুব আরাম হচ্ছে না বোধহয়', ললিতা বললে, 'তা একটু না-হয় কষ্টই হ'লো। এ-ই তো কষ্ট করবার বয়স।'

লোকটি হঠাৎ উত্তেজিতস্বরে ব'লে উঠলো, 'আমার হাত খোলা থাকলে এ-জন্য তোমাকে চড় বসিয়ে দিতে পারতাম।'

'আর সে-জন্যই তোমার হাত দুটো খোলা রাখলাম না।'

লোকটির উত্তেজনা যেন আর-এক ডিগ্রি চ'ড়ে গেলো: 'ও-কথা এত শুনেছি যে কাউকে এখন বলতে শুনলেই মারতে ইচ্ছে করে।'

ললিতা খাটের এক প্রান্তে আলগোছে পা ঝুলিয়ে ব'সে জিগেস করলে, 'কোন কথা?'

'এই কষ্ট সইবার কথা। চাকরির খোঁজ ক'রে-ক'রে হয়রান—কোথাও কিচ্ছু হয় না। বাড়ি-গাড়ি নিয়ে যারা গ্যাঁট হ'য়ে বসেছে, তাদের কাছে গেলে এই উপদেশ

শুনেছি—"কষ্ট করতে শেখো, ছোকরা, এ-ই তো কষ্ট করবার বয়স।" কষ্ট! কতই যেন জানেন ওঁর কষ্টের! ইচ্ছে করে—' লোকটি হঠাৎ থেমে গেলো।

'থামলে কেন? বলো না, কী ইচ্ছে করে তোমার।'

লোকটি যেমন দপ ক'রে জ্ব'লে উঠেছিলো, তেমনি ফশ ক'রে নিবে গেলো। হতাশভাবে মাথা নেড়ে শুধু বললে, 'না, না।' স্বচ্ছন্দভাবে একটু নড়তে গিয়ে তার হাতে চোট লাগলো।

—'উঃ!'

'খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার, না? হঠাৎ যেন গরমও হচ্ছে।' ললিতা উঠে গিয়ে পাখাটা ছেড়ে দিলে। হাওয়ায় লোকটার দু' একটা চুল উড়ে-উড়ে তার কপালের উপর এসে পড়তে লাগলো।

হঠাৎ ললিতা বললে, 'কী সুন্দর তোমার চুলগুলো! কিন্তু অমন বিশ্রী ক'রে লেপটে উল্টে রেখেছিলে কেন?'

'ছাখো, তুমি যদি—' লোকটি খুব চড়া গলায়-আরম্ভ ক'রেই থেমে গেলো।

'নাঃ, তুমি যেন কেমন! কোনো কথা বলি কি ফোঁশ ক'রে জ্ব'লে ওঠো। মিষ্টি কথা তোমার যেন মুখেই আসে না!'

'তোমার দু'হাত ক'ষে বেঁধে রাখলে দেখতাম, তোমার মুখ দিয়েই কেমন মধু ঝরে!'

'ও, সে-কথা! তা তুমি যখন আমাকে পিস্তল নিয়ে শাসাচ্ছিলে, আমি বলিনি মিষ্টি কথা?'

'বলেছিলে বইকি। মিষ্টি কথা ব'লেই তো আমাকে পথে বসালে।—উঃ, কী ভীষণ বোকা আমি!'

'যদি বলো তোমার হাত ছেড়ে দিই।'

লোকটি সন্দেহ-ভরা চোখে ললিতার দিকে একবার তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো।

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?'

'বিশ্বাস! লজ্জা করে না তোমার ও-কথাটা উচ্চারণ করতে!'

একটু হেসে ললিতা বললে, 'লজ্জা-টজ্জা থাকলে কি আর আমাদের চলে ভাই!'

'সত্যি নেইও।' তীব্র মুখভঙ্গি ক'রে লোকটি বললে।

'তোমার সঙ্গে গল্প করতে কিন্তু মন্দ লাগে না, কিন্তু এমন বিশ্রী তোমার মেজাজ!'

'আর বকতে পারিনে তোমার সঙ্গে।' একটা হাই ছেড়ে লোকটি বললে, 'পুলিশ ডাকতে হয় ডাকো—আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'পুলিশ এসেই তোমার ঘুমের চমৎকার ব্যবস্থা ক'রে দেবে নাকি?'

'ব'সে-ব'সে আর বকর-বকর করতে হবে না তো।'

'কিন্তু থানায় নিয়ে গিয়ে যখন দেবে মার -'

'ইশ, মারবে কেন? ভদ্রলোককে কখনো মারে?'

'চোর আবার কখনো ভদ্দরলোক হয়?'

'ত্যাখো, চোর-চোর বোলো না, বলছি।'

'নিশ্চয়ই বলবো। চোরকে চোর বলবো না! চোর! চোর!'

'আমি চোর নই! আমি চোর নই!' (চীৎকার ক'রে)

'নাঃ, চোর হবে কেন? রাত চারটের সময় পাইপ বেয়ে এমনি একটু শখ ক'রে আমার ঘরে উঠে এসেছিলে। তবু যদি পিস্তলটা সত্যিকারের হ'তো!'

খোঁচা খেয়ে লোকটা এক লাফে উঠে দাঁড়ালো। নানারকম মুখ-বিকৃতি সহকারে হাত দুটো খোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে-করতে বলতে লাগলো, 'তুমি! তুমি চোর! তুমি যা করো তা ও তো চুরি! স্রেফ চুরি!'

ললিতা একটু লাজুক-লাজুক ভাবে বললো, 'আমি মন চুরি করি, আর-কিছু না।'

'উঃ, অসহ্য! অসহ্য!'

'ও-রকম ধেই-ধেই ক'রে লাফাচ্ছো কেন? নিচে রাসমণি শোয়—সে হয়তো জেগে উঠবে।'

ললিতার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজায় ভীষণ জোরে ধাক্কা পড়লো। ভীত মেয়েলি গলায় শোনা গেলো—'দিদিমণি, ও দিদিমণি।' মুহূর্তের মধ্যেই ললিতার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গলো। ত্রস্তভাবে সে একবার এদিক ওদিক তাকালো, তারপর চট ক'রে উঠে এসে লোকটার হাত খুলে দিতে-দিতে অর্ধ-স্ফুট স্বরে বললে, 'যাও,—শিগগির খাটের নিচে ঢোকো গে।'

লোকটা হাত ছাড়া পেয়ে পরম আরামে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। দরজার বাইরে থেকে আবার শোনা গেলো, 'দিদিমণি, ও দিদিমণি।'

'যাও', ললিতা লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে তীব্রস্বরে বললে 'শিগগির যাও!'

লোকটা কোনো কথা না-ব'লে তৎক্ষণাৎ হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচের অন্ধকারে অদৃশ্য হ'লো। স্তূপীকৃত লাল শাড়িটা লাথি মেরে-মেরে ললিতা তার পিছনে পাঠিয়ে দিলে, তারপর একবার মুখের উপর হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা খুলে জিগেস করলে, 'কী হয়েছে, বিন্দি? চ্যাচাচ্ছিস কেন?'

'কী হয়েছে, দিদিমণি?'

'কী হয়েছে?' ললিতা চোখ রগড়াতে-রগড়াতে বললে, 'আমিও তো তোকে সে-কথাই জিগেস করছি। তোর হয়েছে কী?'

বিন্দি ঘরের ভিতরে একবার তাকিয়ে বললে, 'তুমি চোর-চোর ব'লে চ্যাচাচ্ছিলে না গো?'

'চোর! মাথা-খারাপ হয়েছে নাকি তোর? কী যে বকছিস!'

'ওমা, আমি যে স্বকর্ণে শুনলুম গো। শুনে উঠে এনু। তুমি চ্যাচাচ্ছো—চোর, চোর—আর একজন মোটা গলায় বললে, আমি চোর নই, চোর নই—এ যে পষ্ট শুনলুম।'

'তোর মাথা! ছাইভস্ম কী স্বপ্ন দেখেছিস তার ঠিক নেই, এখন মাঝ-রাত্তিরে উঠে জ্বালাতন করছিস আমাকে।'

বিন্দি একটু দ্বিধার স্বরে বললে, 'না, দিদিমণি, স্বপন নয়। আমার বুকটা যে এখনো ধড়াস-ধড়াস করছে গো।'

'যা, যা, আর বকিসনি—শুয়ে থাক গে। ঘুমটা ভাঙালি তো আমার।'

'আমি তোমার ঘুম ভাঙাতে যাবো কেন গো? ভালো মনে ক'রে উঠে এনু। দিনকাল বড়ো খারাপ পড়েছে—'

'নে, হয়েছে, কাল সব শুনবো। এখন ঘুমোতে দে।'

বিন্দি তবু একটু অপেক্ষা করলো।—'তুমি কিচ্ছু শোনোনি, দিদিমণি? কিচ্ছু না?'

'কই, না তো।' তারপর অনাবশ্যকভাবে বললে, 'আমি বিভোর হ'য়ে ঘুমুচ্ছিলাম।'

'যাক—ভাগ্যিশ কিছু নয়, দিদিমণি। একবার ভাবো দিকি—'

'হ্যাঁ, ভেবেছি; তুই এখন যা তো।'

দরজাটা আবার বন্ধ ক'রে ললিতা খাটের কাছে গিয়ে ডাকলো, 'বেরিয়ে এসো।'

গুড়গুড় ক'রে বেরিয়ে এলো লোকটি।—'দেখলে তো কাণ্ডটা!' ললিতা বললে, 'খুব চ্যাচাও আরো—পাড়াসুদ্ধু সব ছুটে আসুক।'

'আমার দোষ হ'লো?' খুব ক্ষীণস্বরে, যেন ভয়ে-ভয়ে লোকটি জবাব দিলে. 'চোর-চোর ব'লে চ্যাঁচালে তো তুমিই।'

ললিতা হেসে উঠলো।—'তোমাকে চটাতে এমন মজা লাগে!' তারপর লোকটির দিকে খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে: 'কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোমাকে। ঠিক যেন সং।' ললিতা হেসে উঠলো আবার।

লোকটি আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন লজ্জায় জড়োসড়ো হ'য়ে পড়লো। ললিতা জিগেস করলে, 'কেন পরেছিলে তুমি ও-সব? পাইপ বেয়ে উঠতে সুবিধে হবে ব'লে?'

লোকটি চুপ ক'রে রইলো।

'বেশ, যেমন এসেছিলে তেমনি এবার পাইপ বেয়ে নেমে যাও। কতক্ষণ আর তোমাকে নিয়ে রাত জেগে ব'সে থাকবো?'

'না, না। পাইপ বেয়ে আমি কিছুতেই নামতে পারবো না।'

'পারবে না? উঠতে পেরেছিলে কী ক'রে?'

'কী ক'রে পেরেছিলাম? তাই তো। নিজেই এখন সে কথা ভাবছি।'

'সে-কথা বললে চলবে কেন? উঠতে যখন পেরেছিলে, নামতেও পারবে। নামতেই হবে তোমাকে।'

'না, না', লোকটির স্বর এবার ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো, 'পারবো না। কিছুতেই পারবো না। আমি ঠিক প'ড়ে ম'রে যাবো। দয়া ক'রে আমাকে সিঁড়ির পথটা একটু দেখিয়ে দাও, আমি এক্ষুনি চ'লে যাচ্ছি।'

'বা রে আবদার! এখন আমি হাঁকডাক ক'রে দরোয়ানকে জাগাতে যাই আরকি। আর দরোয়ান যদি মনে করে, তোমার মতো পোশাক নিয়ে কোনো লোক আমার কাছে আসে, তাহ'লে কি আর আমার মান থাকবে!'

লোকটির মুখে চিন্তার ছায়া পড়লো।—'তাই তো—'

'তাইতো-তাইতো ক'রে আর লাভ কী? পাইপ বেয়েই নামতে হবে তোমাকে!'

লোকটি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ম্লানমুখে বললে, 'নামতে যদি হয়ই তো নামবো। এক্ষুনি?'

'হ্যাঁ, এক্ষুনি।'

'আচ্ছা।' লোকটি অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করলো। 'এক গ্লাশ জল দিতে পারো আমাকে?'

'তা আর পারিনে জল খাবে ?'

'জল খাবো।'

'না অন্য-কিছু ?'

'অন্য-কিছু আবার কী ?'

'এই যেমন, হুইস্কি—'

'না, না, ও-সব কিছু না।'

'না কেন ? হুইস্কি খেয়েছো কখনো ?'

'না।'

'তাহ'লে দ্যাখো না একটু খেয়ে।'

'না, জল।'

ললিতা ঘরের কোণের কুঁজো থেকে এক গ্লাশ জল গড়িয়ে এনে দিলে। লোকটি ঢকঢক ক'রে সবটা জল খেয়ে ফেলে বললে, 'আঃ।' তারপর আস্তে-আস্তে—যে-জানলা দিয়ে সে ঢুকেছিলো, তার দিকে পা বাড়ালো।

'ও কী, চললে ?'

'হ্যাঁ।' একটু পরে : 'তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

হঠাৎ ললিতা ব'লে উঠলো, 'এই—'

লোকটি ফিরে তাকালো।

—'তোমার জিনিশ যে ফেলে যাচ্ছো।'

'কী জিনিশ ?'

'তোমার পিস্তল—আর মুখোশ।'

'ও থাক গে।' ব'লে লোকটি আবার পা বাড়ালো। 'কী হবে আর নিয়ে ?'

'আমারই বা কী হবে রেখে ? কেউ দেখলে যদি জিগেস করে, তখন বলবোই বা কী ?'

'ফেলে দিয়ো।'

'ফেলবোই বা কোথায় ? না, তুমি নিয়েই যাও।' ললিতা জিনিশ দুটো কুড়িয়ে আনলো।

'আচ্ছা দাও, নিয়েই যাচ্ছি।' লোকটি ফিরে ললিতার কাছে এসে সেগুলো নিতে যাবে, এমন সময় এক প্রকাণ্ড হাড়-ভাঙা হাই এসে তাকে বাধা দিলো।—'আঃ, কী যে ঘুম পাচ্ছে!' কথাগুলো জড়িয়ে গেলো তার।

ললিতা তার ঘুমে ঘোলা চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিগেস করলে, 'আচ্ছা, কেন করলে তুমি?'

'কী করলাম?'

'এই যে—'

'কেন? বুঝতে পারো না কেন?'

'টাকার জন্য?'

লোকটি কথা না-ব'লে ললিতার হাত থেকে তার পিস্তল আর মুখোশ নিতে গেলো; কিন্তু সে-দুটো তার হাত ফশকে পড়লো মেঝের উপর।

'বা—বাঃ, এতই ঘুম পেয়েছে তোমার! এই ঘুম নিয়ে তুমি আবার যাচ্ছিলে পাইপ বেয়ে নামতে।—থাক, ও-দুটো আর কুড়োতে হবে না এখন—না-হয় একটু ব'সেই যাও। বোসো না—এখানেই বোসো।'

লোকটি ভয়ে-ভয়ে আলগোছে খাটের উপর বসলো।

মশারিটা চাঁদা ক'রে তুলে ললিতা বসলো তার কাছে।—'এইবার বলো।'

'কী?' (অস্পষ্টস্বরে)

'আচ্ছা, তোমার এমন-কী টাকার দরকার হ'লো?'

'টাকার দরকার সবারই হয়।'

'সবাই কিছু পায়ও। কী করো তুমি?'

লোকটি বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ তুলে মৃদুভাবে একটু সঞ্চালন করলো।

'থাকো কোথায়?'

'মেস্-এ।'

'কী ক'রে চলে?'

'চলে না। সেইজন্যেই—'

'ও। তোমার বাবা—?'

বাঁ হাত একবার শূন্যে ঘোরালো সে।

'মা—'

'আছেন এক মা।'

'ভাই-বোন?'

লোকটি আঙুল দিয়ে শূন্যে ঢালু রেখা আঁকলো।

'অনেক বুঝি?'

'অনেক।'

'কোথায় থাকে তারা?'

'দেশে।'

'সেখানে—?'

'এই, কোনোরকমে।'

'তুমিই বড়ো?'

লোকটি মাথা ঝাঁকালো।

'আর-কেউ নাই তোমাদের?'

লোকটি মাথা নাড়লো।

'হুঁ।' একটু চুপ ক'রে থেকে : 'বলো না।'

'কী?'

'সব বলো।'

'সবই তো বললাম।'

'ঐ যাঃ—আসল কথাটাই তো এতক্ষণ জিগেস করা হয়নি। তোমার নামটি কী?'

'কমল।'

'বাঃ, বেশ নাম, কমল। কমল, কমল।' ললিতা দু'একবার নামটা নিজের মনে পুনরাবৃত্তি করলে।

'ডাকছো কেন?'

ললিতা ছেলেটির এলোমেলো চুলগুলিতে একবার হাত বুলিয়ে আস্তে বললে, 'কমল।'

'উঃ, কী শক্ত ক'রেই বেঁধেছিলে হাত; এখনো টনটন করছে।'

'খুব লেগেছিলো, না? দাও, আমি রগড়ে দিচ্ছি, সেরে যাবে।—না, না, এমনি সুবিধে হবে না। তুমি শোও তো।'

কমল দ্বিরুক্তি না-ক'রে বালিশের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। ললিতা তার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে কব্জি থেকে আরম্ভ ক'রে আস্তে-আস্তে রগড়ে দিতে লাগলো।

'আঃ', গভীর আরামে কমল চোখ বুজলো। তার মুখ সদ্য-মৃত লোকের মতো প্রশান্ত, নিরুদ্বেগ। সেই মুখের দিকে ললিতা তাকিয়ে রইলো—মুগ্ধ দৃষ্টিতে। হঠাৎ

তার মনে হ'লো. বিছানায় যেন সে শুয়ে আছে নিজে, আর পাশে ব'সে আছে তার মা—সারা রাত সে যন্ত্রণায় ছটফট করেছে—'মাগো আর পারিনে, ম'রে গেলাম ; উ', মা, মা-গো !' তারপর ভোরের দিকে নিতান্ত ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তবু ঘুমের মধ্যে টের পেয়েছে, মা-র হাত তার কপালে মুখে, চুলে···সেই তাদের পাড়াগাঁর বাড়ি, খিড়কির পুকুর, উঠোনে ব্রতের আলপনা, মাঘের শীতে রাত থাকতে নাইতে যাওয়া, মাঘমণ্ডলের গান, 'ওঠো ওঠো সূয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়ে'—মা-গো ! ললিতার সারা গা হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠলো, তার চোখ উঠলো ছলছলিয়ে।

ঘুমের মধ্যে কমল পাশ ফিরলো।

১৯৩১ 'নতুন নেশা'

বিরূপাক্ষ দেবের কাহিনী

'আপনার সঙ্গে', ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'আলাপ হ'য়ে খুব খুশি হলুম। আপনার লেখা আমি অনেক পড়েছি; আপনার আমি অনুরাগী। অনেকদিন যাবৎ ইচ্ছে ছিলো আপনার সঙ্গে আলাপ করবার; কোনো সুযোগ পাইনি। আজ দৈবাৎ দেখা হ'য়ে গেলো। সত্যি খুশি হলুম।'

আমি লজ্জিতভাবে মৃদু হাস্য ক'রে অস্ফুট একটা শব্দ করলুম।

'আমার দিক থেকেও একটা পরিচয় দরকার। এটুকু বললেই যথেষ্ট যে আমিও আপনাদের ব্যবসাতেই আছি। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু অবশ্যি নয়।—হ্যাঁ, কী নেবেন, বলুন। এদের এখানে এক-শো বছরের পুরোনো ব্র্যাণ্ডি আছে—তা-ই? বেশ। আমিও একটু লিখে-টিকে থাকি; বিরূপাক্ষ দেব আমার নাম।'

আমি আরো বেশ লজ্জিত হ'য়ে কিছুই বলতে পারলুম না; বোকার মতো টেবল-ক্লথের ওপর নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে লাগলুম।

'আপনার লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই; আমার নাম শোনবার কথা নয় আপনার। আপনার মতো পাঠকের জন্য আমি লিখি না। মৃণালিনী-সাহিত্য-ভবন ব'লে একটা ব্যাপার আছে—সেটা আমারই।'

আমি ভদ্রভাবে বললুম, 'ও।'

'মৃণালিনী-সাহিত্য-ভবনের কোনো বই আপনার চোখে পড়েছে কি? চোখে পড়া অসম্ভব নয়—ট্রেনে স্টিমারে বাস্-এ ট্রামে অনেক জায়গায়তেই সে-সব বই ফেরি করা হয়। এক টাকা ক'রে দাম। মলাটে তিন-রঙা স্ত্রীলোকের ছবি থাকে: ভিতরেও খানকয়েক ছবি—অবশ্যি ফোটোগ্রাফ। এক-একখানা বইয়ের পিছনে যা খরচ হয়, সে-অনুপাতে দাম খুব শস্তা বলতে হবে। এই যে। সোডা? না তো? সোডায় পুরোনো ব্র্যাণ্ডির তারটাই ম'রে যায়। Say when···তবে খরচ পুষিয়ে যায়, তিন হাজার ক'রে এডিশন দিই। একটা সিগারেট নিন।

'হ্যাঁ, সিরিজটা চলে ভালো; প্রত্যেকটা বইয়ের কিছু না হোক বছরে একটা ক'রে এডিশন হয়ই। সবসুদ্ধু এ-অবধি আটান্নখানা বই বেরিয়েছে; পঁয়ত্রিশখানাই তার মধ্যে আমার লেখা। আপনি অবশ্যি একখানারও নাম শোনেননি, কারণ বাইরের মাসিকপত্রে আমি বিজ্ঞাপন দিইনে। আমার তাতে কিছু লাভ নেই। সে-জন্য আমার

নিজেরই একটা কাগজ আছে - প্রণয়িণী তার নাম। বছরে দেড় টাকা ক'রে চাঁদা—ছ'ফর্মা বিজ্ঞাপন থাকে, আর থাকে ছ' থেকে আট ফর্মা পাঠ্য বস্তু অবশ্যি আপনি তাকে পাঠ্য বলবেন না, আমিও বলবো না, কিন্তু দেশে এমন ঢের লোক আছে যাদের কাছে তা অবশ্যপাঠ্য। হাজার দশেক কাটে—শহরে কম, মফস্বলেই বেশি। ছোটো শহরে, পল্লীগ্রামেই আমাদের খুব প্রচার। কাগজটা থেকে যা লাভ হয়, তার উপর বইগুলোর বিজ্ঞাপনও বিনি পয়সায় হ'য়ে যায়।

'প্রণয়িণী যে-শ্রেণীর কাছে যায়, আমার লেখা তারা সবচেয়ে পছন্দ করে। তাদের মতো ক'রেই লিখি আমি। আমি তাদেরই লেখক। মাঝে-মাঝে ক্যাটালগ ছেপে প্রণয়িণীর সব গ্রাহকদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিই; তাতে বইয়ের তালিকা ছাড়া আমার তৈরি কতগুলো ওষুধের বিজ্ঞাপনও থাকে। না, ডাক্তারি আমি পড়িনি; চুল-ওঠা নিবারণ কি স্ত্রী-বশীকরণের ওষুধ তৈরি করতে হ'লে ডাক্তারি জানলে চলে না। ওষুধগুলো থেকে যথেষ্ট লাভ হয়।

'হাসছেন? হ্যাঁ ওষুধগুলো লোক-ঠকানো বইকি; কিন্তু দেখুন, ঠকতেই যারা চায়, তাদের না-ঠকালে তাদের প্রতি বড়ো বেশি অবিচার করা হয়। তাছাড়া, সংসারে চলাফেরা করতে গেলে হয় ঠকতে নয় ঠকাতে হয়: এবং ঠকানোটা যখন খুব বড়ো মাপে করা হয়, তখন সেটাই খুব সম্ভ্রান্ত ব্যাপার হ'য়ে ওঠে। ছিঁচকে চোরের জেল হয়, বড়ো চোর নাইট উপাধি পায়। কায়দা ক'রে করতে পারলে লোক-ঠকানোটা শুধু যে ক্ষমার যোগ্য হয় তা নয়, অত্যন্ত উঁচুদরের একটি গুণের পর্যায়ে পড়ে। এ-গুণ যাদের মধ্যে বেশি পরিমাণে থাকে, নেপথ্যে কি প্রকাশ্যে পৃথিবীকে শাসন করে তারাই।

'বুঝতে পারছেন, আমি আপনার মতো সাহিত্যিক নই; আমি হচ্ছি ব্যবসায়ী। সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার এটুকু মাত্র মিল যে আমি কাগজের উপর কলম ব্যবহার করি। কিন্তু আপনাদের সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আমি বাইরে; আমার জাত খোওয়া গেছে। জেনে-শুনেই আমি এ-পথ নিয়েছি; জাতে ওঠবার চেষ্টাও তাই করিনে। তবু আপনার পরিচয় আজ দাবি করলুম ব'লে আশা করি মনে কিছু করবেন না। আমার দিক থেকে এটুকু সাফাই আছে যে আমি নিজে যা লিখি, নিজে তা পড়তে পারি না। পড়বার যখন ইচ্ছে হয় ভালো সাহিত্যই পড়ি; আপনাদের লেখাই পড়ি। কিন্তু তাতে কী। কতগুলো সাংসারিক সুখ-সুবিধে পেয়েছি—তার দাম কম নয়। পনেরো বছর এ-কাজে আছি; এতদিনে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান পাওয়া যাচ্ছে। বালিগঞ্জে আমার বাড়ি তৈরি হয়েছে: আজই সে বাড়িতে উঠে গেলুম। একটা সিট্রোঁএ ছিলো,

সেটা বদলে সম্প্রতি একটা নতুন কাডিয়াক কিনেছি। নানা জায়গা থেকে আমার কাছে লোক আসে, সকলেই আমার সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলে। মন্দ কী। এই বা মন্দ কী। সবার জীবনে সব হয় না; যেটুকু হ'লো তা-ই নিয়ে খুশি থাকাই হচ্ছে বিচক্ষণতা। ব্রাউনিঙের বিশপ ব্লুগ্রামের কথা মনে ক'রে দেখুন; এক-একটি ছোটো কেবিন নিয়ে আমাদের জীবন—তাতে কত জিনিশই তো তুলতে ইচ্ছে করে—এক সেট বালজাক, একটা পিআনো হয়তো, কিন্তু জায়গায় কুলোয় না। যার পক্ষে যেটুকু সবচেয়ে বেশি দরকার, যেটকু না-হ'লেই নয়, তা ই রেখে বাকিটা দিতে হয় ফেলে। বিশপ ব্লগ্রাম তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আবর্জনা ফেলে দিয়ে কেবিনটি শুধু আরামের উপযোগী ক'রে নিয়েছিলেন। আমিও তা ই করেছি। আমি আজ কলকাতার ধনী-মানীদের একজন; শুধু এই স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেক জিনিশই স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে হযেছে আমাকে সে-জন্যে আপশোষ করিনে। যা চেয়েছিলুম পেয়েছি; আমি আজ সুখী।

'দেখুন, ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা; সেখানে অন্য কোনো কথা ওঠে না। বাজারে যা চলে, লোকে যা চায়, তা-ই দিতে হয়। সব ক্ষেত্রেই এ-নিয়ম চলে; শুধু বইয়ের ব্যাপারেই তার অন্যথা হবে কেন? আর্টের কথা ছেড়ে দিন, নিছক ব্যবসার দিক থেকে জিনিশটাকে দেখুন। বেশির ভাগ লোক যদি বাজে বটতলাই চায়, বাজে বটতলাই দিতে হবে। আপনি এই সমস্ত জিনিশটাকেই দারুণ অবজ্ঞার চোখে দেখেন দেখতেই পারেন। আমিও মনে-প্রাণে একে অবজ্ঞা করি, ঘৃণা করি। কিন্তু তবু টাকা এতেই আসছে; এবং টাকা দরকারি। আমার বইগুলোর নাম হচ্ছে সতীর অভিশাপ, লাজাঞ্জলি, শেষ রাতে বিয়ে—এমনি সব। আর নাম মনে নেই, একসঙ্গে তিনটের বেশি নাম আমি কখনোই মনে আনতে পারিনে। দুটো গল্প আছে: এক, দুর্জয় সতীকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে দুর্বৃত্তের চরম দুর্দশা; আর--অত্যন্ত পবিত্র প্রেমের গল্প, মাঝখানে একটু মনোমালিন্য, শেষ পাতায় উলুধ্বনি। এই দুটো গল্পেরই রকমফের ক'রে পঁয়ত্রিশখানা বই। একখানা বই শেষ করতে আমার সাত দিনের বেশি লাগে না; মনে-মনে সব ছক-কাটা আছে; পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ অনায়াসে, তরতর ক'রে লিখে গেলেই হয়, মাঝে-মাঝে একটু করুণ রসের প্যাঁচ লাগিয়ে কান্না বের করা—আর দুর্বৃত্তের পাপ-মন বা প্রেমের নির্জলা নিষ্কামতার বর্ণনাচ্ছলে বেশ একটু রসালো ঝাঁঝালো মশলা মিশিয়ে দেয়া—আমেরিকানরা যাকে বলে পেপ। ব্যস, হ'য়ে গেলো। যেমন স্বচ্ছন্দে লিখি, তেমনি সহজে বই কাটে। নিজেই প্রকাশ করি; কাজে-কাজেই বেশ মোটা মার্জিন থাকে। ব্যবসাটা বেশ ভালোই চলছে আমার।

'আপনি হয়তো বলবেন, টাকাই সব নয়—not by bread alone। হ্যাঁ, আমারও সেই মত—not by bread alone। আরো অনেক জিনিশ মানুষের দরকার—রুটির উপর মাখন, মাখনের উপর জ্যাম, আরামের উপকরণ বিলাসের আয়োজন। কায়ক্লেশে দু'বেলা দু'টি খেয়ে যে বেঁচে-থাকা, তাকেই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি। কেবল শুকনো রুটি চিবোনো আমার আর পছন্দ হয় না; রুটির উপর বেশ মোটা এক পরদা মাখন চাই। আর সেই মাখনটুকুর জন্যেই—আপনার গ্লাশ যে খালি হ'য়ে গেছে—আর-একটু নিন।

'জানি না, টাকার উপর কতটা মূল্য আপনি আরোপ করেন। এমন লোক আছেন, জানি, অর্থের প্রাচুর্য যাঁদের লুব্ধ করে না। আপনি হয়তো বলবেন যে যত বেশি টাকা তত বেশি সুখ, এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। স্বীকার করি, সে-কথা ঠিক। কিন্তু টাকা জিনিশটাকে আমি কখনো অবহেলা করতে পারিনি, কারণ ছেলেবেলায় আমি খুব গরিব ছিলাম। কত কষ্টে যে লেখাপড়া শিখেছিলাম বললে উপন্যাস মনে হবে। ছেলেবেলা থেকেই একটা সুখ আমার ছিলো—স্বাধীনতা। তার মানে, এমন-কেউ ছিলো না যার উপর আমি নির্ভর করতে পারতুম। ইশকুল থেকে নিজের ব্যবস্থা নিজে ক'রে আসছি—আজ পর্যন্ত। আপনার বয়েস কম, হয়তো তেমন-কোনো অভাবেও পড়তে হয়নি: সে সব দিনের বৃত্তান্ত ব'লে আপনাকে ক্লান্ত করবো না।

'ইশকুলে যখন পড়ি, তখন থেকেই আমার একটু লেখবার ঝোঁক। সে-সময়ে মনে দুরাশা ছিলো, লেখক হবো। আমার এক বন্ধু ছিলো, আমার মতোই গরিব। একসঙ্গে পড়তুম আমরা। সে-ছেলেটি কবিতা-টবিতা লিখতো—বোধহয় খুব খারাপ লিখতো না। আমরা দু'জনে মিলে কত যে স্বপ্ন দেখতুম—বহু দুঃখে, বহু অভাবেও স্বপ্ন মরতো না। আমাদের দু'জনের ছিলো অবিচ্ছেদ্য বন্ধুতা—এক স্রোতে দু'জনের জীবন কাটতো। ওর জন্যে আমি কী যে না করতে পারতুম জানি না, এত ভালো-বাসতুম ওকে। দু'জনে যখন বি-এ. পড়ি, ক্লাশের ছেলেরা মিলে চাঁদা ক'রে ওর একটি কবিতার বই বা'র করে। সে সময়ে সাহিত্য-জগতে সে-বই নিয়ে একটু আলোচনা হয়েছিলো। অনেকদিন আগেকার কথা—আপনি তখন বোধহয় শিশু। সে-বই আপনার চোখ পড়েছে কি? বইখানার নাম ছিলো 'রক্ত-মেঘে সূর্যাস্ত'—তখনকার পক্ষে একটু অতি-আধুনিক নাম—কী বলেন?'

আমি বললুম, 'ও—পার্বতীকুমার বিশ্বাসের লেখা তো? ও-বই অনেকদিন আগে আমি একবার পড়েছিলুম—খুব ভালো লেগেছিলো। এখনো অনেক লাইন

আমার মনে আছে। পরে ও-বই একখানা সংগ্রহ করবার চেষ্টা ক'রে পাইনি। এখন আর পাওয়া যায় না—না, কী ?'

'আপনি পড়েছিলেন বইখানা ? ভালো লেগেছিলো ? সত্যি ? বড়ো খুশি হলাম শুনে। এখনো দু'একজন ওকে মনে রেখেছে, তাহ'লে। আমার বন্ধু ব'লে বলছি না ; সত্যি আমি বিশ্বাস করতাম, এখনো করি, যথার্থ কবিত্বশক্তি ওর ছিলো : আশা করেছিলাম, ও অসাধারণ কিছু করতে পারবে। কিন্তু এমন হ'লো, ও কিছুই করতে পারলো না।'

'উনি আর-কিছু লেখেননি ?'

'লিখলেও আর-কিছু প্রকাশিত হয়নি। আমি যদ্দুর জানি, সে-বইখানা বেরোবার পর ও আর বিশেষ-কিছু লেখেওনি। ওর সেই প্রথম বই আড়াই-শো কপি ছাপা হয় ; তার মধ্যে দেড়-শোর উপরে যায় বিতরণে, সব সুদ্ধু আঠারো কি উনিশখানা বিক্রি হয়, আর বাকি বইগুলো কী হয়েছে, কেউ জানে না। সম্ভবত, বইয়ের দোকানিরা বাজে কাগজের সঙ্গে সের-দরে বেচে দিয়েছে। ও-বই আর দ্বিতীয়বার ছাপা হয়নি।

'যা হোক ক'রে পার্বতী আর আমি তো কলেজ থেকে বেরোলোম ; আশা হ'লো এবার হয়তো একটা সংস্থান হবে। আমার নিজের জন্য ততটা ভাবনা ছিলো না, যতটা ছিলো ওর জন্য। আমি বুঝেছিলাম, ওর চেয়ে আমি অনেক স্থূল প্রকৃতির মানুষ, আমার সাহায্যে ও যদি নিজেকে বিকশিত করবার সুযোগ পায়, আমার পক্ষে সেটাই উচ্চতম কাজ। মনস্থ করলুম, যেমন ক'রে পারি, ওকে আর কষ্ট করতে দেবো না ; যা-কিছু কষ্ট আমাকেই যেন করতে হয়।

'কবিতা লিখে আমাদের দেশে রোজগার হয় না ; পার্বতীর পক্ষে অর্থোপার্জনের একমাত্র পথ ছিলো চাকরি আর চাকরি মানেই কেরানিগিরি। পার্বতীর কলম কোনো সওদাগরি আপিশের মোটা খাতার উপর নিযুক্ত হচ্ছে, এ চিন্তা আমার পক্ষে বিষের মতো হ'য়ে উঠলো। পার্বতী লিখুক, কবিতা লিখুক--আমি ওর ভার নেবো। কিন্তু আমিই বা কী করতে পারি। সে-সময়ে চাকরির বাজার এখনকার মতো অসম্ভব ছিলো না ; চেষ্টা করলে একটা-কিছু হয়তো জুটে যেতো। কিন্তু ছেলেবেলায় বহু কষ্টে যে-স্বাধীনতা বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম ; অভাবে, লাঞ্ছনায়, দুর্দশায় যে-স্বাধীনতা ছিলো আমার নিত্য সঙ্গী, এত সহজে তা খোয়াতে ইচ্ছা করলো না। গরিবের আত্ম-সম্মানবোধ বড়ো তীক্ষ্ণ, পাকা ফোড়ার ব্যথার মতো, একটু ছুঁলেই অসহ্য

হ'য়ে ওঠে। ভাবলুম, আমাদের কতটুকুই বা দরকার—অন্য-কোনো উপায়ে চালিয়ে নিতে পারবো।

'লেখবার দিকে আমার যা-একটু ঝোঁক ছিলো, সেটা ঝালিয়ে নিতে লেগে গেলুম। ঠিক করলাম, উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হবো। খাবার পয়সা থেকে বাঁচিয়ে তেল কিনে, রাতের পর রাত জেগে, অনেক কাটাকুটি, ছেঁড়াছেঁড়ি ক'রে—বিরাট গর্ভ-যন্ত্রণার পর জন্ম নিলো আমার প্রথম উপন্যাস। চারদিন রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করবার পর একজন প্রকাশক পাওয়া গেলো --একশো টাকায় তিনি কপিরাইট কিনে নিলেন। মনে অসীম ফুর্তি হ'লো। উৎসাহের বেগে আর-একটা লিখতে ব'সে গেলাম। প্রথম বইখানা বেরুলো ; প্রকাশক বললেন, মন্দ কাটছে না। বলতে কী, সে-বইটা নিয়ে একটু সাড়াই পড়েছিলো দেশে ; অনেক কাগজে প্রশংসা এবং নিন্দে বেরুলো ; নামটা পৌঁছলো সকলের কানেই। একলাফে স্বর্গে উঠে গেলুম। প্রাণপণ ক'রে দ্বিতীয় বইখানা শেষ করলাম। সেখানা, তখনকার দিনের যাঁরা সর্বপ্রধান প্রকাশক তাঁরাই নিলেন। টাকাও বেশ ভালো পেলাম। ভাবলাম, এবার বুঝি কপাল ফিরলো।···এই যে, সিগারেট।

'তখনকার দিনে প্রকাশকের সংখ্যা আজকালকার চেয়ে অনেক কম ছিলো ; একটার পর একটা বই লিখে যাওয়া যদি বা যেতো, সেগুলো পাত্রস্থ করা সহজ হ'তো না। কোনো-একজন প্রকাশকের সঙ্গে পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে নিতে না-পারলে চলতো না। টাকার জন্য আমাকে অবিশ্রান্ত লিখতেই হচ্ছে, সব সময় লিখতে হচ্ছে ; সব সময় যে ভালো লাগতো তা নয় ; তবু এই ব'লে নিজেকে সান্ত্বনা দিতুম যে অনেক কাজের চেয়েই এটা ভালো। দ্বিতীয় বই বেরোবার মাস তিনেক পরে আর-একটা শেষ করলুম. এটা আয়তনেও বড়ো, লিখেওছিলুম খুব মন দিয়ে ; আমার এখনো মনে হয় ও-বইটা একেবারেই বাজে হয়নি, পড়লে আপনারও বোধহয় ভালোই লাগতো।'

'কী হ'লো সে-বইয়ের ?'

'কী হ'লো, শুনুন। সে-বই নিয়ে গেলুম আমাদের সেই প্রধান প্রকাশকের কাছে। অনেক আশা নিয়েই গেলুম। ভদ্রলোক মুখে খুব ভদ্র—যেতেই আধ-হাত লম্বা নমস্কার করলেন। আমি বললুম, "আর-একটা বই লিখেছি।"

' "বেশ।" ভদ্রলোক আর-কিছু বললেন না।

'আমি পরিষ্কার ক'রে বলতে বাধ্য হ'লাম, "বইখানা আপনারা নেবেন মনে ক রে—"

'"এখন আর আমাদের কোনো বইয়ের দরকার নেই।" ব'লেই ভদ্রলোক মুখের সামনে একটা খবরের কাগজ মেলে ধরলেন।

'মনটা একেবারে মুষড়ে গেলো—চুপচাপ খানিকক্ষণ ব'সে রইলাম। কী করা যায়। কী বলা যায়। মনে-মনে খানিকক্ষণ আবৃত্তি করলাম -"আমার বড্ড টাকার দরকার, এখন নিলে বড়ো উপকার হ'তো।" কিন্তু কিছুতেই, কিছুতেই সে-কথা মুখ দিয়ে বের করতে পারলাম না। অথচ দরকার, নিদারুণ, মর্মান্তিক দরকার। বলবো? আর-একবার ব'লে দেখবো? হয়তো শেষ পর্যন্ত ব'লেও ফেলতাম, যদি না ঠিক সেই সময়ে ভদ্রলোক খবরের কাগজের আড়াল থেকে পুনরায় আধ-হাত লম্বা নমস্কার করতেন। এর পর আর থাকা যায় না; আমাকে উঠতেই হ'লো। রাস্তায় যখন বেরোলাম, আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

'বাড়ি এসেই মনস্থির ক'রে ফেললুম। না, এ-ভাবে আর চলবে না। সেই উপন্যাস অপ্রকাশিত রইলো, এখনো বোধহয় তার পাণ্ডুলিপি আমার কোনো-এক বাক্সয় প'ড়ে আছে। পনেরো দিনে আর-একখানা উপন্যাস তৈরি হ'লো; তার নাম প্রেমের পূর্ণিমা। আঃ, ব্র্যাণ্ডিটা বেশ।

'এক অন্ধকূপ গলির মধ্যে এক প্রেস খুঁজে বের করলুম। প্রেসের কর্তা ছেঁড়া গেঞ্জি আর আট হাত ধুতি প'রে থাকেন-- ইনকম-ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য। তাঁর প্রেস থেকে প্রকাশ্যে ধর্মগ্রন্থ বেরুতো—গীতার বাংলা তর্জমা, উপনিষদের ব্যাখ্যা এই সব। কিন্তু আরো যে-সব ছাপা হ'তো, যৌনতত্ত্ব, কামশাস্ত্র, শিক্ষিতা পতিতার জীবন-কাহিনী, সেগুলোই শাঁসালো, সেগুলোই আসল। আমার মতো একজন দরিদ্র নবীন লেখককেই খুঁজছিলেন তিনি, তাঁর সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই আমার জ'মে উঠলো।

'মাসখানেকের মধ্যেই তিনি বের করলেন আমার প্রেমের পূর্ণিমা। পরের মাসেই আর-একখানা লিখতে হ'লো, তার দশদিন পর আর-একখানা যে-সচ্ছলতাটা হ'লো, আমার জীবনে তা স্বপ্ন। কিন্তু অল্পে সুখ নেই। এই আকস্মিক সচ্ছলতায় বিচলিত না-হ'য়ে মাথা ঠিক রেখে একটু-একটু ক'রে এগোতে লাগলাম আমি। কপাল যখন ফেরে, কেউ আটকাতে পারে না। পাঁচ বছর পরে নিজেই প্রেস কিনলুম। মৃণালিনী সাহিত্য-ভবনের সূত্রপাত হ'লো, তারপর বেরুলো প্রণয়িণী। আরো পাঁচ বছর গেলো। মনে হ'লো, টাকার অঙ্কটা আরো দ্রুতবেগে বাড়া উচিত। মা-লক্ষ্মী পরামর্শ দিলেন--বার করলুম কতগুলো ওষুধ। আর আজ বালিগঞ্জে আমার নিজের বাড়ি, মোটর হাঁকিয়ে আমি কলকাতার রাস্তায় চলি। এখনো বুড়ো হইনি; এখনো হয়তো জীবনের কুড়ি বছর আছে, এবং সে-সময়ের মধ্যে উন্নতির আরো অনেক

উপরের ধাপে উঠতে পারবো, আশা করি। কিন্তু যদি আজও ম'রে যাই, তবু এটুকু সান্ত্বনা আমার থাকবে যে এক জীবনের পক্ষে কিছু কম করিনি। এই বা মন্দ কী - কী বলেন ?'

বিরূপাক্ষবাবু চুপ করলেন। একটু পরে আমি জিগেস করলাম, 'কিন্তু আপনার সেই বন্ধু—পার্বতীবাবু, তাঁর কী হ'লো ?'

বিরূপাক্ষবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। 'আজ জানতে পারলুম পার্বতী মারা গেছে। আজ আমার বড়ো দুঃখের দিন।'

এর পর বিরূপাক্ষবাবু খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন তাঁর দু আঙুলে চেপে-ধরা সিগারেটের মুখ থেকে নীল সুতোর মতো এঁকে-বেঁকে ধোঁয়া উঠতে লাগলো। আমিও আর-কোনো কথা বললুম না।

ফুটপাথ ঘেঁষে বিরূপাক্ষবাবুর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো ; তাঁকে বেরিয়ে আসতে দেখে ড্রাইভর সেলাম ক'রে দরজা খুলে দিলে।

'বড়ো আনন্দ পেলুম আপনার সঙ্গে কথা ব'লে, সত্যি বড়ো আনন্দ পেলুম', গাড়িতে উঠতে-উঠতে ভদ্রলোক বলতে লাগলেন। 'দয়া ক'রে একদিন আসবেন কি ? ভয় নেই—আমার কাগজের জন্য লেখা চাইবো না। গল্প-টল্প করা যাবে। আসবেন—কেমন ?' গাড়ি স্টার্ট দিলো। 'এই যে আমার ঠিকানা।' বিরূপাক্ষবাবু তাড়াতাড়ি আমার হাতে একখানা কার্ড গুঁজে দিলেন। 'আচ্ছা—গুড-নাইট।'

'গুড-নাইট।'

গাড়ি চৌরঙ্গির যান-স্রোতের মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

কার্ডখানায় লেখা দেখলুম, 'পার্বতীকুমার বিশ্বাস, পি ১৮৫ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ।'

১৯৩২ 'শ্বেত পত্র'

প্রেমের বিচিত্র গতি

ইলা তার ঘরে অস্থিরভাবে পাইচারি করছে, এমন সময় দরজার বাইরে শোভন এসে দাঁড়ালো। দু' জনের সম্বন্ধে শুধু একটি তথ্য জানা দরকার, ইলার বয়েস কুড়ি : আর শোভনের ষোলো।

ইলা (রুক্ষস্বরে)। কে ওখানে ?

শোভন। আমি।

ইলা। ও—শোভন ? (মৃদুভাবে) এসো। (শোভন ঘরে ঢুকলো)। বোসো। (শোভন বসলো) শুনেছো, শোভন, তোমাদের অমলবাবুর কাণ্ড ?

শোভন। কী কাণ্ড ?

ইলা। শোনোনি ? (তিক্তস্বরে) তাঁর যে বিয়ে !

শোভন। তাহ'লে তো আপনারও বিয়ে !

ইলা (হঠাৎ থেমে গিয়ে শোভনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে)। জ্যাখো, শোভন, আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, তুমি দিন-দিন বড্ড বেশি ফাজিল হ'য়ে উঠছো—

শোভন। I'm sorry.

ইলা (চট ক'রে শোভনের কাঁধে মৃদু টোকা দিয়ে)। Well, so'm I. কিছু মনে কোরো না—আজ আমার মাথার ঠিক নেই।

শোভন। তা-ই দেখছি।

ইলা। শোনো তোমাদের অমলবাবু বিয়ে করছেন পামেলা মিত্তিরকে—ভাবতে পারো ? পামেলা—হাঃ হাঃ ! (শুষ্কভাবে, ইলা হাসলো) পামেলার চেহারা তোমার কেমন লাগে, শোভন ?

শোভন। বি-চ্ছি-রি !

ইলা। আঃ—শোভন, তোমার চোখ আছে। পামেলা ওর মুখটা ঠিক মাগুর মাছের মতো, তা-ই নয় ?

শোভন (একটু ভেবে)। অনেকটা।

ইলা। অনেকটা নয়, শোভন একেবারে ঠিক মাগুর মাছের মতো। তুমি ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখো।

শোভন। দেখবো।

ইলা। সেই মাগুর-মুখো মেয়েকে কিনা—শোভন, আমার সিগ্রেট এনেছো?

শোভন। এনেছি। (পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বা'র ক'রে ইলার হাতে দিলো।)

ইলা (এক টানে উপরের পাৎলা কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে ভিতরের বাক্সটাকে এমন জোরে ঠেলা দিলে যে রাংতায় জড়ানো সমস্ত মোড়কটা মেঝেয় প'ড়ে গেলো)। Damn!

শোভন। এই যে। (মেঝে থেকে মোড়কটা তুলে দিলে।)

ইলা। 'কিউ। (একটা সিগারেট মুখে দিয়ে) খাবে একটা?

শোভন। না।

ইলা। একটা খাও না। থাক না খেলে, ছেলেমানুষ আছো। (মোড়কটা ছুঁড়ে ড্রেসিং টেবিলের উপর ফেললো: তারপর হাতের কাছে একটা টিপয় থেকে লাইটর তুলে সিগারেট ধরালো।) আমি যা কিছুতেই বুঝতে পারিনে, শোভন, তা হচ্ছে এই যে সেই মাগুর-মুখো মেয়েকে কী ক'রে—উঃ, অমলের কী taste! ঠিকই হয়েছে, পামেলার সঙ্গেই মানাবে ওকে। তোমার কি মনে হয়, শোভন, ধঁ ও যদি এসে আমার পায়ে ধ'রেও পড়তো, জিভ দিয়ে আমার জুতোর ডগা চেটেও কান্নাকাটি করতো, তবু আমি ওকে বিয়ে করতাম, স্বপ্নেও কখনো ওকে বিয়ে করবার কথা ভাবতাম?

শোভন। আপনি ও-রকম ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? এক জায়গায় বসুন না।

ইলা। ওর সঙ্গে তোমার দেখা হ'লে ওকে বোলো, শোভন, যে ঐ রকম যার taste, তার সঙ্গে কখনো যে মেলামেশা করেছিলো সে-কথা ভাবতে ইলার আজ লজ্জা হয়, নিজের জন্য দুঃখ হয়—

শোভন। বলবো।

ইলা। না, না—নিজের জন্য দুঃখ হয়, ও-কথা বোলো না। বরং বোলো—থাক, কিছুই বলতে হবে না। ওর সঙ্গে দেখা হ'লে আমার কথা কিছুই বলবে না। বুঝলে, শোভন?

শোভন। বুঝলাম।

ইলা। আর ও যদি কিছু বলতে আসে, যদি আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে আসে, শোভন—ঠাশ ক'রে ওর গালে এক চড় বসিয়ে দেবে। পারবে, শোভন?

শোভন। খুব পারবো।

ইলা। না, না—লক্ষ্মী ছেলে, তুমি কিছু বোলো না; চুপ ক'রে থেকো। Scene

ক'রে কোনো লাভ নেই। ওর যা ইচ্ছে তা-ই করুক, ওর সঙ্গে এখন আর আমার সম্পর্ক কী? (একটু চুপ ক'রে থেকে, সিগারেটটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) ও মরুক, ও চুলোয় যাক, উচ্ছন্নে যাক—আমার তাতে কী? তবু, তবু, তবু, শোভন, হ্যাঁ—তুমি তো জানো, শোভন, আমি ওকে ভালোবাসতাম,- বলতে পারো, কেন ও আমাকে বিয়ে করলো না? হ্যাঁ—আমি করতাম বইকি, আমি তো প্রস্তুত হ'য়েই ছিলাম। ও যদি বলে, তাহ'লে এখনো, এক্ষুনি—শোভন, তুমি হাসছো?

শোভন। না, না - হাসবো কেন।

ইলা। ওকে আমি এমন ভালোবাসতাম যে ভালোবাসার জন্য আমি মরতে পারতাম। বুঝলে, শোভন, মরতে পারতাম। কিন্তু এখন—এখন আমার আর বেঁচে লাভ কী? বলতে পারো, শোভন, কেন, কিসের জন্য বাঁচবো? এখন মনে হচ্ছে, যদি আগেই ম'রে যেতাম…কিন্তু এমন যে হবে, কে ভাবতে পেরেছিলো? না, এখন আর আমার বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই।' শোভন : আমি আত্মহত্যা করবো।

শোভন। করবেনই ·

ইলা। তোমাকে আমি বলছি, শোভন, আর-কাউকে তুমি বোলো না। কাল—এ-সময়ে আমি ম'রে গিয়েছি।

শোভন। কী ক'রে মরবেন?

ইলা। বিষ খেয়ে – না, গুলি ক'রে বাবার পিস্তলটা লুকিয়ে আমাকে এনে দিতে পারবে না, শোভন?

শোভন। ছুঁড়তে পারবেন?

ইলা। তাই তো, জীবনে কখনো তো ছুঁড়িনি। যদি ফশকে যায়- কী ভয়ানক! শব্দ হবে, সব জানাজানি হ'য়ে যাবে, কেলেঙ্কারি হবে - অথচ মরবো না। তখন যে লজ্জায় মরতে হবে আমাকে। না, বিষ খেয়েই মরবো—আফিং, স্ট্রিকনিন, পট্যাশিয়ম সিয়ানাইড—

শোভন। কোথায় পাবেন?

ইলা। তুমি এনে দেবে।

শোভন। আমি কোথায় পাবো?

ইলা। তাই তো, তাই তো, এ তো বড়ো মুশকিল। পৃথিবীতে এত রকমের এত বিষ আছে—আর একজন মানুষকে মারবার মতো একটুখানি বিষ কি পাওয়া যাবে না?—কী করা যায়? শোভন, বলো তো কী করা যায়?

শোভন। না-হয় না-ই মরলেন।

ইলা (একটু চুপ ক'রে থেকে) হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো। না—আমি মরবো না, আমি বাঁচবো। আমি বাঁচবো। আমি ওকে দেখিয়ে দেবো, ও কিছুই নয়। আমি ওকে তুচ্ছ জ্ঞান করি, আমি ওকে ঘৃণা করি—না, ঘৃণাও করিনে। ও বুঝতে পারবে, আমি কখনো ওকে এতটুকু ভালোবাসতাম না (হঠাৎ থেমে গিয়ে, অদ্ভুত ভাঙা-ভাঙা গলায়) কিন্তু বাসতাম যে, শোভন।

শোভন। আপনি এখানে এসে বসুন; আর একটা সিগারেট খান।

ইলা (শোভনের পাশে ব'সে তার হাতের উপর হাত রেখে)। তুমি ভারি ভালো ছেলে, শোভন; আশা করি যে-মেয়েকে একবার ভালোবাসবে, তারই সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

[এক বছর পরে]

শোভন (টেলিফোন তুলে নিয়ে)। হ্যালো।

ইলা (টেলিফোনের ভিতর)। তুমি, শোভন?

শোভন। হ্যাঁ, আমি।

ইলা। শোনো, শোভন, আমার তো—আমি ইলা—

শোভন। বুঝতে পেরেছি—বলুন।

ইলা। আমার তো যাওয়া ঠিক হ'লো। কাল কলকাতা ছাড়ছি, তিনদিন পর ভারতবর্ষ।

শোভন। আমাদের দুর্ভাগ্য।

ইলা। না, না ও-কথা বোলো না। তোমাদের ছেড়ে যেতে আমারও কম কষ্ট হচ্ছে না।

শোভন। কেন যাচ্ছেন?

ইলা। এমনি—বেড়াতে।

শোভন। এ-দেশটা আপনার আর ভালো লাগছে না?

ইলা। সে-জন্য নয়; অনেক দূরে কোথাও যেতে হবে—তাই।

শোভন। সে কী! বিলেতে একেবারে থেকেই যাবেন?

ইলা। তা হ'তে পারে। একেবারে হঠাৎ যাওয়া ঠিক হ'য়ে গেলো—সবার সঙ্গে দেখা করবারও সময় হ'লো না—

শোভন। রণজিৎবাবুর বিয়ে হ'য়ে যাবার পরেই—

ইলা। ও-কথা বোলো না, শোভন, বোলো না।

শোভন। আমি বলছি না—সবাই বলছে।

ইলা। কে বলছে?

শোভন। সবাই।

ইলা। কী-সব লোক! কী-সব লোক! ও, শোভন, সেইজন্যেই তো, সেইজন্যেই তো এ-দেশ ছাড়তে হচ্ছে আমাকে।

শোভন। ভালো করছেন। দেশটা বড়ো গরম।

ইলা (একটু পরে)। আ, শোভন, একটা কথা তোমাকে জিগেস করি: ওর সঙ্গে—রণজিতের সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়েছে?

শোভন। হয়েছে। সেদিন ওঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম—নেমন্তন্ন ছিলো।

ইলা। কেমন দেখলে ওকে? বেশ সুখে আছে?

শোভন তা-ই তো মনে হ'লো।

ইলা (একটু পরে)। শুনে সুখী হ'লাম।

শোভন। সত্যি?

ইলা। হ্যাঁ—শোভন, সত্যি। ও সুখে থাক, এর বেশি আমি আর কিছু চাইনে। ও সুখে থাক--আমি চ'লে যাচ্ছি। এখন সত্যি মনে হচ্ছে আমি আর ফিরবো না—না, আর ফিরবো না। আর হয়তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না, শোভন; আমাকে মনে রেখো।

শোভন। আমার সঙ্গে হবে। সামনের বছর, আই এস-সি পাশ ক'রেই আমি বিলেত যাবো। ফেরবার সময় আপনাকে নিয়ে আসবো সঙ্গে ক'রে। যদি আসতে না চান, জোর ক'রে ধ'রে আনবো।

ইলা (একটু হেসে)। শোভন, শোভন, যত লোকের সঙ্গে আমি মিশেছি, তার মধ্যে তুমিই আমাকে একটু ভালোবেসেছো।

শোভন। আমার প্ল্যান কী, শুনবেন? বিলেত থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ ক'রে ফিরে এলেই এখানে আমার চাকরি ঠিক আছে। তখন—তখন আমি আপনাকে বিয়ে করবো।

ইলা। তুমি বড্ড বাড় বেড়েছো, শোভন।…

[আরো চার বছর পরে]

শোভন। হ্যালো।

ইলা। তুমি শোভন?

শোভন। হ্যাঁ।

ইলা। আমি ইলা।

শোভন। ও, ইলা, ইলা। So glad. So kind of you to have rung me up—

ইলা। Not at all.

শোভন। ফিরে এসে প্রথম তোমার কথাই আমার মনে পড়ছিলো। কেমন আছো?

ইলা। আজই মোটে খবর পেলাম যে তুমি ফিরেছো। আর-একবার ডেকেছিলাম—তুমি ছিলে না। শোনো : আমাদের এখানে কি আসবে না একবার?

শোভন। নিশ্চয়ই—একবার কেন, সহস্রবার। তুমি না-বললেও যেতাম।

ইলা। আ, শোভন, লণ্ডনে প্রথম কয়েকটা মাস কী চমৎকার কেটেছিলো। মনে পড়ে?

শোভন। আমি ভেবেছিলাম, চিরকাল না-হ'লেও আরো কিছুদিন তুমি থাকবে ওখানে।

ইলা। আমার কি আর অনিচ্ছা ছিলো? কিন্তু কী করবো বলো, মা-র হঠাৎ অসুখ হ'য়ে পড়লো—লণ্ডন ছাড়বার দিন তোমার সঙ্গে কিন্তু দেখা হ'লো না; আমি আশা করেছিলাম—

শোভন। আমিও চেষ্টা কম করিনি, কিন্তু এমন ফতগুলো—

ইলা। থাক, ও-সব কথা এখন থাক। তোমার মনে আছে, শোভন, আমার যাবার আগের দিন তুমি আমাকে টেলিফোনে কী বলেছিলে?

শোভন। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, আর তুমি আমাকে ধমক দিয়েছিলে। (হেসে) আঃ ইলা, ইলা, ছেলেবেলায় লোকে কী-ই বা না বলে!

ইলা। তাহ'লে কবে আসছো?

শোভন। আজ বিকেলে?

ইলা। হ্যাঁ, আজ বিকেলেই এসো।

[একটু চুপচাপ]

ইলা। কতদিন পর আজ আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে! তিন বছর—না,

তারও বেশি? শেষ আমাদের দেখা হয়েছিলো—কোথায়? দাঁড়াও, মনে করি—সোহোর সেই চিনে রেস্তোরাঁয়—না?

শোভন। আ, সেই চিনে রেস্তোরাঁ! What a funny place! কী funny ইংরিজি বলতো লোকটা! কিন্তু, যা-ই বলো, খাবারগুলো দিতো চমৎকার। পরে কতদিন মার্জরিকে নিয়ে ওখানে গিয়েছি।

ইলা। কা'কে নিয়ে?

শোভন। মার্জরিকে।

ইলা। মার্জরি কে?

শোভন। আমার স্ত্রী।

ইলা (রুদ্ধস্বরে)। কী বললে?

শোভন। আমার স্ত্রী: তোমাকে গোপনে বলছি, ইলা, আর-কাউকে কথাটা বোলো না। এখনো কাউকে জানাইনি। আইডিয়াটা হচ্ছে, মার্জরি এখানে চ'লে এলে···

১৯৩২ 'প্রেমের বিচিত্র গতি'

তুলসী-গন্ধ

ঘুম আর জাগরণের মাঝখানে অনেকগুলো অজ্ঞাত পদক্ষেপ, অনেক অবচেতন মুহূর্ত, ঘুম আর জাগরণের মাঝখানে স্বপ্নের সেতু, যে-স্বপ্ন শেষের দিকে বাস্তবের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে যায়। মিহিরকুমার সোমের পক্ষে, শীতের সেই সকালবেলায়, সেই স্বপ্ন গ'ড়ে উঠতে লাগলো সংগীতের ধ্বনিতে; ঘুমের সমুদ্রে ঢেউয়ের মতো এক-একটা সুরময় শব্দের ওঠা-পড়া; তারপর সেই ঢেউ এসে লাগলো তার চেতন মনে; স্বপ্নের সেতু জাগরণের প্রান্তে এসে ঠেকলো। ঢেউয়ের পর ঢেউ, পৃথিবীর সর্বত্র প্রতি মুহূর্তে বিক্ষিপ্ত, প্রতি মুহূর্তে ছড়িয়ে-যাওয়া শব্দের আশ্চর্য সমাবেশ, সুর, সুরময় শব্দ। ঢেউয়ের পর ঢেউ, অর্গ্যানের মৃদু, নরম স্বর ঘরের আবহাওয়াকে আদর ক'রে চলেছে। জেগে ওঠার অনেকটা পরে মিহির বুঝতে পারলো যে সে জেগে উঠেছে। অর্গ্যানের স্বর আরো স্পষ্ট হ'লো; এতক্ষণে যেন সংগীত হ'লো সম্পূর্ণ সরব। তবু, মিহিরের মনের উপর তা আদরের মতো, বিছানার যে-অংশ থেকে তার স্ত্রী একটু আগে উঠে গেছে, তার উষ্ণতার মতো। একটুও নড়াচড়া না-ক'রে মিহির সে-উষ্ণতা অনুভব করতে পারছিলো। যেন কমলা তার শরীরের সারবস্তু ওখানে ফেলে রেখে গেছে। চোখ না-খুলেও মিহির স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো, কমলার বালিশটা যেখানে গর্ত হ'যে গেছে। যেখানে কমলা সমস্ত রাত ভ'রে তার মাথা রেখেছিলো; তার ছড়ানো, কালো চুল একটা ইশারার মতো, আহ্বানের মতো। সেই চুল নিয়ে আদর করেছিলো সে, একটা গোছা তুলে জড়িয়েছিলো তার আঙুলে। এ-কথা মনে করতেই এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে মিহিরের মন যেন সোনালি-উষ্ণ হ'য়ে উঠলো, দক্ষিণপক্ক সোনালি আঙুলের মতো সোনালি—তার অন্তর্নিহিত রস, তার উত্তাপ, তার প্রাণ কমলার সত্তার সচেতনতা, কমলার উপর তার পরিপূর্ণ অধিকারের অনুভব। সোনালি আঙুর থেকে নিষ্কাষিত সোনালিতর মদের মতো মিহিরের আত্মায় প্রবহমান এই চিন্তা; কমলা তার, তার সমস্ত কালো চুল, তার সমস্ত উষ্ণ কোমল শরীর নিয়ে কমলা তার। এই চিন্তা একটা দীপ্তি, যা তারই ভিতর থেকে উত্থিত হ'য়ে তাকে আচ্ছন্ন করেছে; সেই দীপ্তিতে স্নাত, নিশ্চল, সে শুয়ে রইলো, পক্ক-সোনালি। ঘুমের মোহ সে তার মন থেকে কেটে যেতে দিলো না; তার স্বেচ্ছাবৃত তন্দ্রায়, সদ্য-পরিত্যক্ত স্বপ্নে অর্গ্যানের সুর-স্বর ঝ'রে পড়ছে। সে শুনতে লাগলো, বরং

তার একটা অংশ শুনতে লাগলো, অন্য অংশ দিয়ে সে যতক্ষণ নিজের মধ্যে অনুভব করছে কমলাকে ; নিজের মধ্যে, নিজের চারদিকে পরিব্যাপ্ত কমলার ঐশ্চর্যময় চেতনা, সেই চেতনার বিলাস। আর শান্তি তার মনের মধ্যে গভীর। কমলায় আচ্ছন্ন সে ভুলে' গেলো. এখনো কত জিনিশপত্র খোলা বাকি রয়েছে, কত মাল আনাতে হবে ইষ্টিশান থেকে, তারপর সেগুলো গুছোনো—নতুন জায়গায় নতুন বাড়িতে এসে প্রথমটায় কত যে হাঙ্গামা, দুশ্চিন্তা, গেলো কয়েক দিন ধ'রে তাকে যা অবিশ্রান্ত পীড়া দিয়েছে, এই সময়ে, ঘুম আর জাগরণের ক্ষণিক রামধনু-সঙ্গমে, তা সে বিস্মৃত হ'য়ে রইলো। অর্গ্যান বেজে চলেছে, ধ্বনির পর ধ্বনি, সাতটা শব্দের অফুরন্ত লীলা। কী বলছে সে. এই অশরীরী সুর, শূন্য বায়ুমণ্ডলে এই গীত-উৎসারী রন্ধ্রের পর্যায় ? সে জানে না, জানতে চায় না। সে শুধু স্তব্ধ হ'য়ে থাকবে, আর তার চৈতন্যের উপর দিয়ে ব'য়ে চলবে এই শব্দের স্রোত। সে চোখ খুলবে না—না, অযত্নে বাঁধা শিথিল খোঁপার নিচে কমলার শাদা ঘাড় দেখবার জন্যেও না, না তার পিঠের নরম বাঁকা রেখা, না তার শাড়ির এলায়িত আঁচলের স্মৃতিঘন অবিন্যস্ততা। বোজা চোখে মিহির বুঝতে পারলো, রোদে ঘর ভ'রে যাচ্ছে। এতক্ষণে তার ঘুমের আবেশও একবারে ছুটে গিয়েছিলো, কিন্তু তবু সে উঠবে না।

হঠাৎ অর্গ্যান থেমে গেলো। যেন একটা আলো নিবে গেলো কিংবা প্রেক্ষাগৃহের রহস্য-নিবিড় অন্ধকারে জ্ব'লে উঠলো অতি স্পষ্ট, অতি সাংসারিক, নেহাৎই প্রয়োজনীয় আলো, রঙ্গমঞ্চের নাট্যের পর দেখতে-দেখতে চোখের সামনে নেমে আসছে বিচিত্র বিজ্ঞাপন-অঙ্কিত পরদা। স্বপ্নের আধো-অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল দিনের আলোয় মিহির চোখ মেললো। সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখোচোখি হ'য়ে গেলো কমলার সঙ্গে, যে ঠিক সেই মুহূর্তেই মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে ছিলো তার স্বামীর দিকে, তার ঘুম এখনো ভাঙলো কিনা, দেখবার জন্য।

'ঘুম ভাঙলো এতক্ষণে ?'

স্ত্রীর চোখে তাকিয়ে মিহির একটু হাসলো. কোনো কথা বললো না। আর, কমলার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ তার জন্য ভালোবাসা একটা ঢেউয়ের মতো মিহিরের হৃৎপিণ্ডের উপর আছাড় খেয়ে পড়লো, একটা অন্ধ শক্তি, যার চাপে, তার মনে হ'লো, সে চূর্ণ হ'য়ে যাবে।

'ওঠো না,' মৃদুস্বরে কমলা বললে, 'বেলা যে বাড়ছে, খেয়াল আছে ? শেষটায় আপিশের তাড়ায় আর নাকে-মুখে পথ দেখবে না।'

মিহির লেপের নিচে থেকে একটা হাত বাড়িয়ে বললে, 'এখানে এসো।'

অর্গ্যানের ধার থেকে উঠে কমলা আস্তে-আস্তে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। মিহির এক হাত দিয়ে তাকে নিজের বুকের উপর টেনে এনে তার মুখে নিবিড় চুম্বন করলো। আঙুলের ডগাগুলো দিয়ে তার মসৃণ ঘাড়ের উপর আঁচড় কাটতে-কাটতে বললে, 'থাকো, থাকো এখানে।'

এলায়িত, শান্ত, একটু সময় কমলা চুপ ক'রে রইলো, তারপর বললে, 'ছাড়ো এখন, চায়ের ব্যবস্থা করি।'

দিন আরম্ভ হ'য়ে গেলো, কাজের উৎকণ্ঠায়, বিরক্তিতে, অশান্তিতে ভরা দিন : প'ড়ে রইলো স্বপ্ন, মিলিয়ে গেলো তন্দ্রার অন্তর্লীন প্রেত-সংগীত। তার কাচারি-ঘরের কথা মনে প'ড়ে মিহিরের যেন ঈষৎ ন্যক্কারের উদ্রেক হ'লো - সেই দলিল আর ধুলোর গন্ধ, উড়নোন্মুখ সবুজ পাখির মতো গাউন-পরা ক্ষীণদেহ উকিলের দল, আর কোলাহল, সেই বিরামহীন কোলাহল। যেন এক বিশাল পতঙ্গবাহিনীর মতো তার মস্তিষ্কের ভিতর খেয়ে যাচ্ছে। আর বাড়ি ফেরবার সময় সেই ক্লান্তি, যেন সে একটা বিষ-বাষ্পের ভিতর দিয়ে হাঁটছে – সে ঠিক সে-ই আছে কিনা, বুঝতে পারছে না। সেই ক্লান্তির খানিকটা মিহিরের মধ্যে তখনই যেন সঞ্চারিত হ'লো, সেই সদ্য-নিদ্রোত্থিত শীতের-রোদে-উজ্জ্বল সকালবেলায়।

বিছানা থেকে উঠে সে পুবের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বাইরে তাকিয়ে দেখলো এক নতুন শহর. প্রাদেশিক শহরের শান্তি আর মন্থরতা যেন সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। দূরে দেখা যাচ্ছে গাছের ঘন সারি, রাস্তা দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি চ'লে গেলো, ছোটো এক মুসলমান ছেলে লোহার গোল চাকার পিছন-পিছন দৌড়চ্ছে। হেঁটে যারা যাচ্ছে, তাদের তাড়া নেই ; এই সাধারণ মন্থরতার মধ্যে অদ্ভুতরকম দ্রুত মনে হচ্ছে ছেলেটাকে। যতটা খারাপ হবে সে ভেবেছিলো, ততটা নয়। অন্তত সকালবেলার এই আলোয, গাঢ়-নীল আকাশের নিচে ততটা খারাপ লাগলো না।

কিন্তু তার মত বদলে গেলো, চায়ে ব'সে যখন সে খবরের কাগজ পেলো না। এখানে যে বিকেলে খবরের কাগজ আসে, এই ব্যাপারে সে এখনো অভ্যস্ত হ য়ে উঠতে পারেনি। বিকেলবেলা খবরের কাগজ! এমন আজগুবি কাণ্ড কে কবে শুনেছে! তার নতুন কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে মিহির একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর মন্তব্য করলো।

'তা আর কী হয়েছে,' কমলা বললে। 'কাগজটার ভাঁজ না-খুলে পরদিন সকালের জন্য রেখে দিলেই তো হয়।'

মিহির নিজের মনে গর্জাতে লাগলো, 'এ-রকম জায়গায় ভদ্রলোক কী ক'রে বাস

করতে পারে ! আমি আগেই জানতাম। বদলির খবর যেদিন এলো, সেদিনই তো বলেছিলাম ’

‘কী আর করবে। তোমার আপত্তি সরকার তো শুনবে না।’

‘আর তুমি বলেছিলে, “বেশ হবে, চলো। ঢাকা বেশ জায়গা।”—বেশ !’

‘আমার তো ভালোই লাগে। সত্যি।’

‘পৃথিবীতে কার যে কী ভালো লাগে, বোঝা মুশকিল।’ যেন একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে তাদের মনান্তর হ’য়ে গেছে, এইভাবে মিহির চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলো। তার মুখ লক্ষ্য ক’রে কমলা মনে-মনে হাসলো। অদ্ভুত, তার স্বামীর এই একগুঁয়েমি, যে-কোনো বিষয়ে এতটুকু মতদ্বৈধ সহ্য করতে না-পারা, তার এই আশা করা যে যে কোনো বিষয়ে অন্য সবাই ঠিক তার মতো ক’রেই ভাববে। তাকে তোয়াজ করবার জন্য সে বললে, ‘ছেলেবেলায় এখানেই ছিলুম কিনা, অনেকদিন পর পুরোনো জায়গায় এলে ভালো লাগে না ?’

মিহির অন্যমনস্কভাবে বললে, ‘হুঁ।’

বরাবর কমলার মনে এ-ইচ্ছা ছিলো, আর একবার ঢাকায় আসবার, একবার অন্তত। মনে মনে সে জানতোও যে এই ইচ্ছা তার পরিপূর্ণ হবে। আর তা-ই তো হ’লো, দুপুরবেলাকার ঘুমন্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে নিজের মনে সে বললে, তা-ই তো হ’লো। তার মুর্শিদাবাদ সিল্কের নকশা-আঁকা শাড়ি আর রঙিন ছাতা নিয়ে প্রাদেশিক শহরের দুপুরবেলাকার শান্ত রাস্তায় সে সুন্দর এক ছবি : রাস্তা দিয়ে আর যে-দু’চার জন লোক যাচ্ছিলো, তাকে ভালো ক’রে দেখবার জন্য একটু থমকে দাঁড়াচ্ছিলো। কিন্তু ও সব কিছুই তার চোখে পড়ছিলো না, সে শুধু ভাবছিলো, এ কী অদ্ভুত যে সে এখানে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে, ফিরে এসেছে ; আকাশ যেমন তার সমস্ত নীলিমা দিয়ে সূর্যের আলো পান করছে, কমলার মন তেমনি সমস্ত তন্তু দিয়ে, প্রতি তন্তুর প্রতিটি সূক্ষ্ম অণু দিয়ে শুধু শোষণ করছে এই চিন্তা। সে একবার ভাবলো না কোথায় যাচ্ছে, আর কেনই বা যাচ্ছে। কিন্তু যেন আগে থেকে কারো সঙ্গে সব ঠিক হ’য়ে আছে, স্বামী আপিশে চ’লে যাবার খানিক পরে সে-ও বেরিয়ে পড়েছে। কিছুই এসে যাবে না, স্বামীর অনেক আগেই সে ফিরতে পারবে। একটা পুরোনো মডেলের ফোর্ড গাড়ি প্রচুর শব্দ করতে-করতে চ’লে গেলো, ধুলোয় চারদিক প্রায় অন্ধকার ক’রে দিয়ে। চারটে চাকার ঘূর্ণনের ফলে এত ধুলো যে উৎপন্ন হ’তে পারে, চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তাও কমলার মনের সুর কেটে দিলো না ; এই ধুলো, এর গন্ধও তার পরিচিত, একে তার প্রত্যাবর্তনের একটা অংশ ব’লে সে

অনুভব করলো। এখানকার উপর তার অধিকারের এটা একটা স্বীকৃতি। পথ সংক্ষেপ করবার জন্য রাস্তা ছেড়ে সে যখন মাঠে নামলো নিজেকে তার আশ্চর্যরকম সুখী মনে হ'তে লাগলো, যে-সময়ে সে স্কুলে পড়তো, প্রায় সেই সময়কার মতো। সত্যি বলতে, হঠাৎ তার মনে হ'লো, সত্যি বলতে সে ভুলে' গিয়েছিলে, সুখ কাকে বলে। সে বেঁচে ছিলো, এ-পর্যন্ত; আরামে, স্বাচ্ছন্দ্যে, তার স্বামীর, অন্য-সবার এবং কখনো-কখনো তার নিজেরও মতে সুখে বেঁচে ছিলো। কিন্তু একটা উপলব্ধি হয়েছিলো তার; সেটা এই যে আসলে সুখ কি দুঃখ ব'লে কিছু নেই: আছে শুধু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজের বিরোধ কি সামঞ্জস্য, দিন থেকে দিন নিজের মধ্যে নিজের আচ্ছাদন কি উন্মীলন। সুখ আর দুঃখ, নিজের মনে-মনে সে প্রায়ই বলতো, হচ্ছে ইশকুল-পড়ুয়া অবস্থার কুসংস্কার। সেই কুসংস্কারের মোহে আজ আবার সে পড়েছে। তার মনে হ'তে লাগলো, নিজের থেকে আলাদা যেন কিছু আছে, যাকে কতদিন সে খুঁজেছে, খুঁজে পায়নি, কাছে এসেও বুঝতে পারেনি। উঁচু-নিচু মাঠের মধ্যে লঘু তার পদক্ষেপ, সহজ তার গতি-ভঙ্গি; শূন্য মাঠ আর অজস্র আকাশের মাঝখানে একটি রঙিন পালকের মতো উজ্জ্বল, অনায়াস-বিহারী তার শরীর।

যে-জায়গায় সে যাবে, তা কাছে এসে পড়লো। হঠাৎ তাকিয়ে সে পাড়াটাকে চিনতে পারলো না: পাড়ার ঠিক প্রান্তবর্তী প্রকাণ্ড একটা বটগাছ ছিলো, সেখানটা এখন খাঁ-খাঁ করছে। মনের মধ্যে সে একটা আঘাত পেলো, কিন্তু এ-রকম না-হ'য়ে উপায় নেই। প্রগতি থামতে পাবে না। ত্যাখো না, বাড়িতে-বাড়িতে পাড়াটা ছেয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত নগরোপকণ্ঠ—যেখান থেকে সাপ্তাহিক পত্রে নারীর অধিকার সম্বন্ধে চিঠি যায়, যেখানে সরস্বতী পুজো ও নববর্ষে ছোটো-ছোটো মেয়েদের নৃত্যাভিনয় হয়, যেখানকার ছেলেরা দস্তুরমতো এইচ. জি. ওয়েলসের বই পড়ে। পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটি-মুন্সেফের উপনিবেশ: নিখুঁতরকম ভদ্রোচিত, অতিরিক্তমাত্রায় সাজানো-গুছোনো, পালিশ-করা। আশ্চর্য নয়, বটগাছকে যে ওখানে টিঁকতে দেবে না, কে জানে কত দীর্ঘ বছর ধ'রে যা আস্তে-আস্তে মাটির গভীর অন্ধকারের মধ্যে মূল বিস্তার ক'রে আকাশের নিচে অগণ্য পাতায় বিকশিত তার ঝিরঝিরে প্রাণ ছড়িয়ে দিয়েছিলো।

এখন আর এখানে, কমলা মনে মনে ভাবলে, গভীর রাত্রে শকুন-শিশুর ডাকে গা-ছমছম করবে না, জানলা দিয়ে তাকালে দেখা যাবে না জমাট-কালো সেই অন্ধকার, বর্ষার দিনে জল দাঁড়াবে না মাঠে। এই পাড়ার উপর পড়েছে সভ্যতার লৌহ-মুষ্টি, শকুন-পরিবারকে অন্য বাড়ি খুঁজতে হয়েছে, গজিয়ে উঠেছে কয়েক গজ পর-পর লোহার থাম, বিদ্যুদ্বহ যুগ্ম-তারকে ধারণ ক'রে। অবাক হবার কিছু নেই; এ-রকম

যে হবে, তা আশাই করা যায়। তবু, দু'পাশে জানলায়-রঙিন-পরদা-খাটানো বাড়ির সারির ম ঝখানে পাকা শড়ক দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে কমলা একবার সে-সময়ের কথা মনে না-ক'রে পারলো না, যখন বর্ষার দিনে সেই বড়ো রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে জল-কাদা ভেঙে কত কষ্টে এসে বাড়ি পৌঁছুতে হ'তো—নির্জন প্রান্তরের মধ্যে দু'চারখানা মাত্র বাড়ির অন্যতম সেই বাড়ি। চৈত্রমাসে কাঁচা রাস্তায় ধুলো উড়তো, বটের শুকনো ঝরা পাতার রাশিতে সমস্ত রাস্তা যেতো গেরুয়া হ'য়ে। বৃষ্টির জল যেখানেই একটু জমতো, হলদে-সবুজ রঙের স্ফীতদেহ ব্যাঙের দল স্ফীততর কণ্ঠনালী প্রদর্শন ক'রে উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনি করতো : মাঠ দিয়ে হাঁটতে গেলেই কাপড়ে বিঁধে যেতো অগুনতি চোরকাঁটা ; শ্রাবণের সকালবেলায় ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে বর্ষাপ্রকৃতি যেন আলোর ভিক্ষায় তার নীল হাতের অঙ্গুলি বাড়িয়ে ধরতো। আর রাত্রিতে—কী নির্জনতা, কী অন্ধকার! রহস্যে আর ভয়ে ভরা বটগাছের কী বিশাল আবছায়া-মূর্তি। একদিন এই সমস্ত জায়গাটা ছিলো বন ; শহর থেকে দুঃসাহসী ইশকুলের ছেলেরা এখানে বেড়াতে এসে সন্ধে হবার আগেই বাড়ি ফিরে যেতো। সেই সময় থেকে—আরো কত, কত আগে থেকে!—সেই বটগাছ রাজত্ব করেছে এখানে ; পাখিতে পতঙ্গে পল্লবে লতায় বিচিত্র প্রাণময় এক জগৎ, আকাশের দিকে বিশাল ডালপালা মেলে দিয়ে সূর্যকে সে পান করেছে. আর বৃষ্টিকে, সূর্যের শক্তিকে সে প্রেরণ করেছে তার দেহের অন্ধকারে লীন লক্ষ-লক্ষ তন্তুতে, বৃষ্টির উজ্জীবনকে সে প্রস্ফুটিত করেছে নতুন, সবুজ পাতার ঐশ্বর্যে। সেই সমস্ত প্রাণ, প্রাণের ক্লান্তিহীন, ক্ষান্তিহীন লীলা হঠাৎ একদিন শেষ হ'য়ে গেলো। এই বনদেবতার পতনের সঙ্গে-সঙ্গে কী ভীষণ আর্তনাদ হয়তো উত্থিত হয়েছিলো! কমলা যেন নিজের মধ্যে সেই কান্না শুনতে পেলো—আকাশ-ফাটানো সেই মৃত্যু-চীৎকার।—কিন্তু প্রতিবাদ করা বৃথা , মন খারাপ করা বৃথা : এ-রকম যে হ'তেই হবে। প্রজাসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, নতুন জায়গা চাই। মানুষ এলো তার সভ্যতার যন্ত্রপাতি নিয়ে। দেখা গেলো, এতখানি জায়গা জুড়ে এই যে গাছটা রয়েছে, সেটা বাহুল্য। যে-শক্তি রাস্তার ধারে বসিয়েছে জলের কল, ইলেকট্রিক আলোর থাম, তারই একটা প্রশাখা উপড়ে ফেললো গাছটাকে। সেই শক্তিকে বাধা দেবে কে? তার আশ্রয়ের বাইরে কমলার নিজেরও যে এক মুহূর্ত চলে না। না, প্রতিবাদ করা বৃথা।

পাড়াটা একেবারে চুপচাপ ; বাড়িগুলোর দরজা বন্ধ ; সমস্ত আবহাওয়ায় মধ্যাহ্ন-আহার-পরবর্তী বুর্জোয়া বিশ্রাম। কমলার সময়ে বেশির ভাগ বাড়িই ছিলো না, পাড়াটার চেহারা একেবারে বদলে গেছে। তার চোখে, তবু, কিছুই নতুন ঠেকছিলো না ; বরং, নতুন যা-কিছু তার কিছুই তার চোখ গ্রহণ করছিলো না ; বরং, শুধু চোখই

গ্রহণ করছিলো। তার মনের মধ্যে সারাক্ষণ যে-ছবি ছিলো, তা সেই সময়কার, শীতের দিনে যখন এখানকার রাস্তা শাদা ধুলোয় ছেয়ে যেতো। যেন সেদিনের কোনো স্মরণচিহ্ন, কোনো অভিজ্ঞান সে বহন করছিলো তার নিজের মধ্যে, এই জায়গার আত্মা তা চিনতে পেরেছে। যেন বয়ঃক্রম-অনুসারে বর্তমানে উপস্থিত থেকেও, তারই ভিতর থেকে উৎসারিত অতীতের এক অনুভব তাকে আচ্ছন্ন করেছে; তারই ভিতর দিয়ে সে হাঁটছে। হঠাৎ একটা বাড়ি তার চোখে পড়লো—সেটা পুরোনো। এ-বাড়ির লোকের সঙ্গে তার অল্প জানাশোনা ছিলো। কী অদ্ভুত হয়, সে যদি এখন ঢুকে পড়ে। বিধবা ভদ্রমহিলা প্রথমে তাকে চিনতে পারবেন না, তারপর চিনতে যখন পারবেন—সেই কঠিন, মধ্যবিত্ত ভদ্রতা, লোহার জামা-পরা সৌজন্য, অতিরিক্ত মাত্রায় ভদ্র আলাপ, সবসুদ্ধ তার প্রতি এমন মনোযোগ দেখানো, যাতে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, সে যত শিগগির চ'লে যায়, ততই ভালো।—কমলা ও-সব ভালো ক'রেই জানে, তার বাড়িতে কেউ এলে সে-ও ঐরকমই করে। এরই মধ্যে তার প্রতিবেশীরা সচেতন হ'য়ে উঠেছে, কাল একজন এসেছিলেন। ঘরদোরের নিরাসবাব অবস্থার জন্য সে প্রচুরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো—পরে নিজেই অবাক হ'য়ে ভেবেছিলো, ওটা করতে গেলো কেন? কারণ, সত্যি বলতে, যেমন ছিলো, তাকেই আসবাবের বাড়াবাড়ি বলা যেতে পারে। তাদের যে আরো অনেক জিনিশপত্র আছে, প্রতিবেশীকে পরোক্ষে তা জানিয়ে দেয়া ছাড়া এ আর কী? সে যাক, পারিপার্শ্বিককে একেবারে ছাড়িয়ে ওঠবার আশা কিছুতেই করা যায় না। তাছাড়া, একজনের কাছ থেকে লোকে যেমন আশা করে, তেমনি করতে হয়। মহিলাটি বলেছিলেন, 'ঢাকায় বড়ো মশা।' সে বলেছিলো, 'হ্যাঁ, তা-ই দেখছি।' 'মশারি খাটিয়ে শুলে মশা লাগে না।' 'মশারির ফাঁক দিয়েও অনেক সময় এসে ঢোকে', এ-কথার উত্তরে সে বলেছিলো। আশ্চর্য, সে হো-হো ক'রে হেসে ওঠেনি। এতে যে হাস্যকর কিছু আছে, তাও মনে হয়নি তার। এ-সব ব্যাপারে হেসে উঠলে তার চলে না; একজনের কাছে যা আশা করা হয়, তা-ই সে করে।

একটা বাড়ির সামনে ছোটো বাগানে অজস্র গাঁদা ফুল আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, এক কোণে ফুটে রয়েছে প্রকাণ্ড সূর্যমুখী। কিন্তু গতি মন্থর ক'রে এনেও সে থামলো না; আবার চলতে লাগলো। ইটের দেয়ালে-ঘেরা খড়ের ছাউনি-দেয়া সেই ঘর দেখা যাচ্ছে; দূর থেকে তা প্রায় আগেকার মতোই দেখালো কোনোকালেই ঘরটা খুব ঝকঝকে ফিটফাট ছিলো না। তার কাছে আসতে কমলার পদক্ষেপ স্বতঃই মন্থর হ'য়ে এলো, তার শরীরের স-লীল লঘুতা গেলো হারিয়ে। এতক্ষণ সে নিজেই

আসছিলো ; এখন একটা ইচ্ছা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যে-ইচ্ছা তার নয়। দেয়ালের ঠিক বাইরে এসে সে দাঁড়ালো। ইঁটগুলো এখানে-ওখানে খ'সে পড়েছে। স্বচ্ছন্দ মধ্যবিত্ততার মধ্যে এই জীর্ণ গৃহ একটা অশোভনতা, ঔদ্ধত্য। এতদিন যে এটাকে টিঁকতে দেয়া হয়েছে, তা-ই আশ্চর্য। দেয়ালের গায়ে কাঠের দরজটা হাঁ-করা খোলা। তার ফাঁক দিয়ে সে তাকালো ; উঠোন আগাছায় ছেয়ে গেছে ; একটা লাল গোরু আর কয়েকটা ছাগল চ'রে বেড়াচ্ছে সেখানে। এক পাশে ঘরের ছায়ায় একটা কুকুর সামনের দু'পা সোজা বাড়িয়ে দিয়ে তার ফাঁকে মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছে। কমলা তাকালো, তাকিয়ে রইলো। সে যে বিশেষ-কিছু ভাবছিলো, তা নয় ; তখনকার মতো তার মন যেন একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেছে। আস্তে-আস্তে দরজা পার হ'য়ে সে ঢুকলো ভিতরে। তার পায়ের শব্দে কুকুরটা চমকে চোখ মেললো, তার দিকে ট্যারচা চোখে একটু তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একবার গা-ঝাড়া দিয়ে কযেক পা হেঁটে একটু দূরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। উদাসীন গোরুটা সশব্দে ঘাস ছিঁড়ছে দাঁত দিয়ে ; তার লেজের প্রান্তদেশের ঝুঁটি অলসভাবে অল্প-অল্প নড়ছে। ঘরের বারান্দা ছাগলের পরিত্যাগে ও বিবিধ আবর্জনায় নোংরা : তীব্র দুর্গন্ধ যেন কমলার মস্তিষ্কে হঠাৎ এক বাড়ি মারলো। স্পষ্টত, বহুদিন এ-বাড়িতে কেউ বাস করেনি, এ-বাড়ি বহুদিনের পরিত্যক্ত। ঘরে ঢোকবার দুটো দরজাতেই বন্ধ তালা অক্ষুণ্ণ, এ-পর্যন্ত কোনো চোর বাড়িটাকে তার নৈশ ব্যবসার উপযোগী বিবেচনা করেনি। কমলা ঘরটার চারদিকে একবার ঘুরে দেখলো। পিছনের দিকে একটা পেয়ারা গাছ ছিলো, এখন একেবারে শুকিয়ে-যাওয়া, এখানে-ওখানে তার দু'টি-একটি ক'রে পাতা ছড়ানো। বাইরের দরজার দিকে দেয়ালের কাছে তুলসীমঞ্চের কাছে সে একটু দাঁড়ালো। সে-জায়গাটা রীতিমতো তুলসীর জঙ্গল হ'য়ে গেছে, পেকে লাল হ'য়ে এসেছে মঞ্জরীগুলো। বর্ষার দিনে এই মঞ্চ বেয়ে উঠতো একটা অপরাজিতার লতা, ফুটতো গভীর-নীল ছোটো-ছোটো ফুল—তার চোখের মতো। তার চোখের মতো। সে নিজে কখনো বুঝতে পারেনি, তার চোখ সত্যি-সত্যি নীল কিনা। এখন কয়েকটা ফুল ফুটে থাকতে দেখলে খুশি হ'তো সে। নিচু হ'য়ে একটা তুলসীর পাতা ছিঁড়ে সে তার আঙুলের মধ্যে চটকালো, গন্ধ ভেসে এলো তার নাকে। তার সামনের হাওয়াটাকে সে কয়েকবার শুঁকলো, তুলসীর গন্ধ লেগে রইলো তার ঘ্রাণে। আর এই, এ-ই হচ্ছে সব, যা সে এখানে থেকে নিয়ে যাবে ; এরই জন্য সে এসেছিলো।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে সে দেখলো, একটা লোক কতগুলো জিনিস নিয়ে সাইকেল ক'রে তার দিকে আসছে। তার মনে হ'লো, লোকটা তার চেনা। সে কাছে আসতে

কমলা তাকে ইশারা ক'রে ডাকলো। লোকটা সসম্ভ্রমে সাইকেল থেকে নেমে মাথার একটা অনির্দিষ্ট ভঙ্গি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

'তোমার ঐ দোকান?' কমলা জিগেস করলে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ', লোকটা তার সাধ্যমতো পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণ করলো। কমলা ঠিকই ধরেছিলো, লোকটা পাড়ার পুরোনো মুদি। কিন্তু তার মুখে এমন কোনো ভাবই ফুটলো না যে সে কমলাকে আগে দেখেছে।

'শোনো; এই বাড়ি - এতে কেউ থাকে না আজকাল?'

'আজ্ঞে এ-বাড়ি তো অনেকদিন খালি প'ড়ে আছে।'

'কোথায় গেলো—ছিলো যারা? একজন ছোকরামতো বাবু আর তাঁর মা—'

'হ্যাঁ, মা-ঠাকরুন বড়ো ভালো লোক ছিলেন—সব সওদা নিতেন আমার কাছ থেকে।' মুদির আস্তে-আস্তে সাহস বাড়ছিলো, চ্যাপ্টা কপালের নিচে তার ছোটো-ছোটো চোখ উঠছিলো উজ্জ্বল হ'য়ে। 'এখানে তাঁরা যখন এসে বাড়ি করলেন, আমি সবে দোকান খুলেছি। সেই থেকে মা-ঠাকরুন—'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তা এ-বাড়ি তাঁরা কবে ছেড়ে গেছেন, জানো?'

'এই—' মুদির চ্যাপ্টা কপালে কয়েকটা রেখা পড়লো, 'আজ্ঞে সে তো অনেকদিন।'

'কতদিন?'

'দু' বছর হবে', একটু ভেবে মুদি জবাব দিলে, 'কি কিছু বেশিও হ'তে পারে।'

'কোথায় গেছেন জানো?'

'ঠিক জানিনে।'

কমলা চুপ ক'রে রইলো।

মুদি বলতে লাগলো, 'যাবার আগের দিন মা-ঠাকরুনের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপর তাঁরা কেউ এখানে আসেননি আর?'

'আজ্ঞে না। মা-ঠাকরুনকে আমি জিগেস করেছিলাম; তিনি বললেন, "আর বোধ হয় আমরা ফিরবো না।" '

'হুঁ। আর বাড়িটা?'

'বাড়িটা সেই থেকে খালিই প'ড়ে আছে। এমন সুন্দর জায়গা, কী ছিরি ক'রে ফেলে রেখেছেন। পাড়ার পাঁচজন বলাবলি করেন। এখানে নতুন একটা বাড়ি তুললে—'

'আচ্ছা—'

মুদি মাঝপথে তার কথা থামিয়ে মাথার আর-একটা অনির্দিষ্ট ভঙ্গি ক'রে সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিলো, কমলা পিছন ফিরে ডাকলো, 'এই, শোনো

'আজ্ঞে ?'

'এই নাও,' কমলা তার হাতব্যাগ থেকে একটা টাকা বা'র করলে।

মুদির মুখ হাসিতে ভ'রে গেলো। 'আজ্ঞে আপনি এ-পাড়ায় নতুন এলেন নাকি ?' সাইকেলের উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে সে জিগেস করলো। কিন্তু কমলা ততক্ষণে উল্টো দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে।

তুলসীর গন্ধ তার সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগলো, যে পাতাটা সে আঙুলের মধ্যে চটকেছিলো। একবার সে তার চোখের সামনে তার হাত মেলে ধরলো ; বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে হলদে দাগ লেগে রয়েছে। তার দু'আঙুলে অল্প একটু দাগ—এ ই সব। এ-রকম যে হবে সে জানতো। সে জানতো, তবু এই সমস্ত পথ হেঁটে এসেছিলো সে। যতক্ষণ আসছিলো, সে কিছু ভাবেনি, ভাবতে পারেনি। কিন্তু সেই তুলসী যেন তাকে একটু-একটু ক'রে জাগিয়ে তুলছিলো মোহ থেকে, যে-মোহ এতক্ষণ তাকে ঘিরে ছিলো। এতক্ষণে সে যেন তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে সচেতন হ'লো : অনুভব করলো এই মধ্যবিত্ত পাড়ার দূর, বিচ্ছিন্ন বৈপরীত্য, আর তার বুকের মধ্যে সেই পরিত্যক্ত গৃহের তীব্র, তিক্ত শূন্যতা। তিক্ত, যেন তার হৃৎপিণ্ড তিক্ত আর কঠিন হ'য়ে গেছে। শুধু একবার তাকে দেখতে ! যাতে চোখে জল এসে না পড়ে, কমলা শক্ত ক'রে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো ; তার নিজেরই অজান্তে তার পদক্ষেপ হ'য়ে উঠলো দ্রুত থেকে দ্রুততর । শুধু একবার তাকে দেখতে ! কিন্তু সময় ক্লান্তিহীন, সময় ব'য়ে চলে, ধুলো ছিটিয়ে যায়, আর যা ধুলো নয় তাকে ধুলো বানিয়ে যায়। কিন্তু এখনো নয়, কমলা প্রায় সশব্দে ব'লে উঠলো, এখনো নয়। ধুলো যখন ছিটিয়ে দেয়া হবে, ঠিক তারই আগে শুধু আর-একবার তাকে দেখতে ! এই ইচ্ছা কমলার মধ্যে ব্যাধির মতো হ'য়ে উঠলো, তার মাংসের মধ্যে অদৃশ্য এক ক্ষতের মতো। তার গালের উপর এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু অনুভব করলো সে। রুমালের জন্য ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকালো, কিন্তু হঠাৎ তার সমস্ত দৃষ্টি এলো ঝাপসা হ'য়ে, শীতের উজ্জ্বল আকাশ বিবর্ণ হ'যে গেলো। সে একটুও অপেক্ষা করলো না, হেঁটে চললো। চোখের জল আপনিই থেমে গেলো, সযত্নে চোখের কোণ আর গাল মুছে ফেললো রুমাল দিয়ে ।

কী ক'রে কোন পথে সে বাড়ি ফিরে এলো, কমলা নিজেই টের পেলো না। ঘরে ঢুকে দেখলো, তার স্বামী খাটের উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে টানছে চুরুট আর পড়ছে

কাগজের মলাটের ইংরিজি নভেল। মিহির বই থেকে চোখ সরিয়ে কমলার দিকে একটু তাকিয়ে রইলো। এটা তার একটা অভ্যাসের মধ্যে, কমলাকে কোনো কথা বলবার আগে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকা। যেন দৃষ্টি দিয়ে তার শরীরকে চাটছে, কমলার হঠাৎ মনে হ'লো। ঠিক এই মুহূর্তে তার দিকে অমন ক'রে তাকাবার জন্য মিহির বাড়িতে না-ও তো থাকতে পারতো। 'এত শিগগিরই ফিরে এলে?' সে জিগেস না-ক'রে পারলো না।

'হ্যাঁ, একটা মামলার শুনানি আজ হঠাৎ অ্যাডজারনড হ'য়ে গেলো—শিগগিরই চ'লে আসতে পারলাম। বাঁচলাম। শুয়ে থাকতে কী আরামই লাগছে।' আরামের বিলাসিতায় মিহির একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে কাৎ হ'য়ে শুলো। 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'এই একটু ঘুরে এলাম।'

'তোমার মুখ বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে কিন্তু।'

'যা ধুলো রাস্তায়।'

পাশের ঘর থেকে কাপড় বদলে একটু পরে কমলা এসে বললে, 'তিনটে বাজে। চা খাবে নাকি এখনই?'

'মন্দ কী।' তারপর, 'চলো না', একটু চুপ ক'রে থেকে মিহির বললে, 'আজ একটা ফিল্ম দেখে আসি।'

'না, আমি আজ না গেলাম।'

'কেন? বেশ তো - একটা দিন হঠাৎ একটু ছুটি পাওয়া গেছে—'

'আমার তো আর ছুটির অভাব নেই।'

'সারাটা দুপুর,' মিহিরের চোখে অত্যন্ত সস্নেহ, প্রায় করুণ দৃষ্টি ফুটে উঠলো, 'তোমার পক্ষে একা-একা কাটানো সত্যি বিশ্রী। না?'

'তা আর কী, আমাদের জন্যেই তো বাংলা মাসিকপত্র'।

'চলো আজ সিনেমাতেই যাওয়া যাক। আমাদের কাচারির সামনে মণিকা থিয়েটরে জ্যানেট গেনর দিয়েছে, দেখলাম। অনেকদিন এ-সব দেখনে; আজ ইচ্ছে করছে।'

'বেশ তো, যাও না তুমি।'

'তুমিও চলো।'

'আমার ইচ্ছে করছে না।'

'না, না, সে কী হয়। তুমি না-গেলে যে ভালোই লাগবে না আমার।'

'কিন্তু আমার যে গেলেই ভালো লাগবে না।'

'গেলেই, দেখবে, ভালো লাগবে।' ব্যাপারটার যেন মীমাংসা হ'য়ে গেছে, এইভাবে মিহির বললে, 'তাহ'লে চায়ের ব্যবস্থা করো।'

চায়ের ব্যবস্থা কমলা করলো। তাকে চা ঢেলে দিয়ে নিজেও নিলো। নীরব চা-সেবন। মিহিরের মেজাজ খুব ভালো ছিলো, সে দাঁত বা'র ক'রে অবিশ্রান্ত হাসতে লাগলো, যেন একটা প্রকাণ্ড ঠাট্টা তাকে অবিশ্রান্ত শুড়শুড়ি দিচ্ছে। কমলা আত্ম-বিস্মৃত, স্তব্ধ, যেন সে সত্যি-সত্যি ওখানে নেই।

'ওঃ-হো,' রুটির টুকরোয় কামড় দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে মিহির ব'লে উঠলো, 'স্টেশন থেকে জিনিশ-পত্রগুলো আজও তো আনানো হ'লো না।'

কমলার কানে যে ও-কথা ঢুকেছে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলো না। 'বসবার ঘরটাই এখনো পর্যন্ত অগোছাল হ'য়ে প'ড়ে রইলো - অথচ নতুন এসেছি ব'লে কেউ-না-কেউ যে দেখা করতে না আসছে, এমন তো নয়। নাঃ, এরই মধ্যে একদিন সময় ক'রে নিয়ে ঘরদোর সাজিয়ে-গুছিয়ে ফেলতে হবে। কী বলো? আজ দুপুরেই তো চাকরটাকে নিয়ে তুমি খানিকটা করিয়ে রাখতে পারতে।' মিহির রুটিতে আর-এক কামড় দিলো।

'আচ্ছা ত্যাখো, বড়ো আয়নাটা শোবার ঘরে না-রেখে বসবার ঘরে রাখলে কেমন হয়? আর আজ আমার হঠাৎ মনে হ'লো, অ্যান্টিম্যাকাসারগুলো পুরোনো হ'য়ে যাচ্ছে—বদলানো দরকার। কলকাতায় থাকতে মনে হ'লেই ভালো হ'তো; এখানে কি ভালো ক্রেটোন কাপড় পাওয়া যাবে? কী, চুপ ক'রে আছো কেন?'

'চুপ ক'রেও কি থাকতে নেই?'

'কিন্তু কাজের কথা বলছি যে, অত্যন্ত দরকারি কথা শোনো: বড়ো আয়নাটা বসবার ঘরে নিয়ে রাখলে—'

'কাল হবে ও-সব কথা। আজ থাক।'

এতক্ষণে মিহির যেন তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলো। 'কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি।'

'কিছু হয়নি? তাহ'লে তুমি ও-রকম চুপ ক'রে আছো কেন? তোমার মন-খারাপ হয়েছে?'

'যদি হ'য়েই থাকে, ধরো? মাঝে-মাঝে কি মানুষের মন-খারাপ হয় না?'

'আমি তো সম্প্রতি তার কোনো কারণ দেখছি না,' মিহির মন্তব্য করলো, বেশ একটু ঝাঁঝ দিয়েই। তার মুখ গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিলো। একেবারে শিশুর মতো, অন্যের সম্বন্ধে তার এই অসহিষ্ণুতা। তার আশে-পাশে যা-কিছু, সব সময় ঠিক তারই মনের মতো হ'তে হবে; এক চুল এদিক-ওদিক হ'লে সে সহ্য করতে পারে না। এ এক কঠিন অন্ধতা, প্রবৃত্তিগত একমুখিতা, যা এমন-কোনো জিনিশকে কিছুতেই গ্রহণ করবে না, যার সঙ্গে তার নিজের কিছুমাত্র গরমিল হয়। গ্রহণ না করুক, তাকে স্বীকারও করবে না; ভাণ করবে—বোধহয় বিশ্বাসও করবে যে তাদের অস্তিত্বই নেই। 'আমি হচ্ছি গিয়ে চরমপন্থী,' নিজের সম্বন্ধে সে বলতে ভালোবাসতো, 'হয় আমি ঘৃণা করি, নয় ভালোবাসি।' সত্যি বলতে, অবশ্য, ঘৃণাতেই সে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলো। যত লোকের সঙ্গে তার দেখা হ'তো, তাদের প্রায় প্রত্যেককেই সে শেষ পর্যন্ত ঘৃণা করতো, তাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে এমন-কোনো জিনিশ সে পেতোই যা তার ভালো লাগতো না, এবং সেই একটুখানি ভালো-না-লাগাই তার চরমপন্থী মনে ঘনীভূত হ'য়ে উঠতো ঘৃণায়। এবং সেটা তীব্র, স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করতো তার সেই মুহূর্তের প্রিয় বন্ধুর কাছে, অন্যের অভাবে কমলার কাছে। 'I hate him,' কি 'That loathesome man!' কি 'He's simply detestable'! বিশেষণ যত বেশি কড়া হ'তো, তার মুখ দাঁত-বের-করা হাসিতে ঠিক সেই অনুপাতেই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো। কোনো সন্দেহ নেই, মিহির চরমপন্থী লোক। আর ভালোবাসা – হ্যাঁ, ভালোবাসা। তার মানে কমলা। কমলাকে সে ভালোবাসে; প্রবলভাবে, উচ্চ-সরবে ভালোবাসে। কথায়-কথায় তার ঘোষণা। কোনো বাড়িতে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণে গেলে এটা সে বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দেয় যে সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। সকলকে দেখাবার, সকলের দেখে মুগ্ধ হবার জন্য সেটা যেমন ক'রে পারে সর্বত্র জাহির ক'রে বেড়ায়। অতি পবিত্র, অতি সুন্দর ভালোবাসা। তার গৌরব, তার জীবনের পরম সম্পদ।

চায়ের শেষাংশ সম্পন্ন হ'লো নীরবে। চাকর এসে পেয়ালাগুলো সরিয়ে নিলে, চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে মিহির চুরুট ধরালো। 'তাহ'লে সিনেমায় যাবে না?'

'তুমি যাও না,' কমলা বললে।

'কিন্তু তোমাকে ছাড়া যে—'

'আঃ, থাক!' কমলা ব'লে ফেললো।

'থাক মানে?'

কমলা স্থির দৃষ্টিতে তাকালো তার স্বামীর মুখে। ক্ষীণ হাসিতে তার ঠোঁট একটু বেঁকে গেলো। মৃদুস্বরে সে বললে, 'তুমি যাও, জ্যানেট গেনরকে দেখে এসো গে। আমার ভালো লাগছে না।'

'বাজে কথা,' মিহির তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে। 'ভালো না-লাগবার তোমার হয়েছে কী।'

কমলার চোখে হঠাৎ লুকোনো আগুন ঝলসে গেলো।—'না, ভালো না-লাগা, মন-খারাপ হওয়া, চুপ ক'রে থাকা ইত্যাদি সবই তোমার একচেটে ব্যাপার।'

কেউ তাকে ঠাট্টা করছে, এমন সন্দেহও মিহিরের পক্ষে বিষের মতো। সে কালো হ'য়ে গিয়ে বললে, 'এ-সব মেয়েলি ঢং দেখলে আমার গা জ্ব'লে যায়।'

'তা যাতে বেশিক্ষণ আর দেখতে না হয় সেইজন্যই তো আমি তোমাকে বলছি সিনেমায় যেতে।'

'আমার সঙ্গ তোমার আর ভালো লাগছে না, মনে হচ্ছে।' রাগে মিহির তার শাদা, বড়ো-বড়ো দাঁত প্রদর্শন করলো।

'কখনো-কখনো একা থাকবার অধিকার সকলেরই আছে।'

'অতএব তুমি যাতে একা থাকতে পারো, আমাকে দু' ঘণ্টা সিনেমায় গিয়ে ব'সে থাকতে হবে!'

'তোমার ইচ্ছে,' ব'লে কমলা উঠে দাঁড়ালো। সে বেরোবার জন্য দরজার কাছে যেতেই মিহির ডাকলো, 'কোথায় যাচ্ছো?'

'এখানেই সারাদিন ব'সে থাকতে হবে—না, কী?'

'হঠাৎ একেবারে বাদশাজাদি হ'য়ে উঠলে যে? ব্যাপার কী?'

'তুমি কি কখনোই চুপ ক'রে থাকতে পারো না?'

'না। আমি জানবো—আমাকে জানতেই হবে, তোমার কী হয়েছে।' সশব্দে চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে মিহির উঠে দাঁড়ালো। 'তুমি আমার কাছ থেকে কী লুকোচ্ছো, তা আমাকে বলবে।' মিহির কয়েক পা হেঁটে এসে কমলার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

কমলার শরীরের প্রত্যেক স্নায়ু শক্ত আর টান হ'য়ে উঠলো। যেন অন্য-কারো কণ্ঠস্বরে সে বললে, 'কিন্তু তা তোমার না-জানাই ভালো।'

'বলো, বলো,' মিহির প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো। 'আমাকে জানতেই হবে।'

'শোনো তবে,' অত্যন্ত শান্তভাবে, মিহিরের চোখের উপর চোখ রেখে কমলা বললে, 'আমি একজনকে ভালোবাসতাম—আজ তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।' ব'লেই মিহিরকে এক মুহূর্ত সময় না-দিয়ে কমলা সে-ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের শোবার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিলে।

মিনিট দুই পরেই প্রচণ্ড ধাক্কা পড়তে লাগলো দরজায়। 'কমলা, লক্ষ্মী, একটু দরজাটা খোলো, একটিবার খোলো।' ধাক্কার শব্দ আর মিহিরের চীৎকার ধ্বনিত হ'লো সমস্ত বাড়িতে। চাকর-বাকররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো।

'খোলো, দরজা খোলো—কমলা, কমলা!'

খানিক পরে মিহির কমলার গলা শুনতে পেলো, 'একটু দাঁড়াও।' মিহির চুপ ক'রে অপেক্ষা করলো।

'দরজা খোলা আছে, এসো।'

মিহির ঘরে ঢুকে দেখলো, কমলা খাটের উপর ব'সে আছে। সে অত্যন্ত নরম সুরে আরম্ভ করলে, 'সত্যি—তুমি যা বলেছো?'

'হ্যাঁ।'

'কে সে?' মিহিরের কণ্ঠস্বরে তীব্র যন্ত্রণা।

কমলা চুপ ক'রে রইলো।

'কে সে? কোথায় থাকে সে?'

'যদি বলি,' কমলা বললে, 'যদি বলি, তাহ'লে তুমি কী করবে?'

'আমাকে কী করতে হবে, তা আমি জানি। তুমি শুধু আমাকে বলো,' খপ ক'রে মিহির কমলার মণিবন্ধ জোরে চেপে ধরলো। 'বলো শিগগির।' মিহির আরো জোরে চাপ দিলো, আরো জোরে। কষ্টে কমলার চোখে জল এলো।

আর হঠাৎ ভাঙা-ভাঙা গলায় সে ব'লে উঠলো, 'সে কোথায় আমি কী ক'রে বলবো। সে কোথায়, আমি কি তা জানি!'

'তার মানে?' কমলার মণিবন্ধের উপর মিহিরের হাতের মুঠি শ্লথ হ'য়ে এলো। 'তুমি যা বলছিলে তা কি সত্য নয়?'

'সত্য নয়!' কথাটা যেন কমলার গলা চিরে বেরিয়ে এলো।

'তাহ'লে বলো—বলো সে কে? সে কোথায়?'

একটানে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কমলা ব'লে উঠলো, 'বোকা! বোকা! সে ম'রে গেছে--সে ম'রে গেছে, তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। কখনো আর দেখা হবে না।' বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে কমলা কান্নায় ভেঙে পড়লো। কান্না থামাবার জন্য সে দাঁতের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে দিলো; তুলসীপাতার ক্ষীণ গন্ধ তখনও সেখানে লেগে আছে।

১৯৩১ 'মিসেস গুপ্ত'

ঘরেতে ভ্রমর এলো

এসে বললে, 'ওগো, জগুবাবুর বাজারে নাকি গঙ্গার ইলিশ উঠেছে বড়ো-বড়ো। যাও না, একটা নিয়ে এসো গে। আর কী ইলিশ মাছের দিন তো ফুরিয়েই এলো।'

ঠিক গুঞ্জন নয়, আত্মার উপর এ ঝরে না স্বর্গের শিশিরের মতো। এর সুরে-সুরে আশ্বিনের নীল সকালবেলা বিহ্বল হ'য়ে ওঠে না।

মাথা তুলে বললাম, 'প্রিয়ে, চেয়ে ঢাখো, তোমার চোখের মতো আকাশ আজ নীল। শাদা মেঘগুলো ভেসে চলেছে—আমার মনের উপর দিয়ে তোমার স্বপ্নের মতো। আর এই যে রোদ উঠলো সোনায় সোনা হয়ে-- ভাবছি, এ কি তোমারই প্রেম সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো?'

এখানেই থামতুম না না, আমি নিশ্চয় জানি আরো কিছু বলতুম, কিছু হঠাৎ ভ্রমরের একখানা হাত আমার মুখের উপর এসে পড়লো। সে হাতে নানারকম মশলার একটা মিশেল গন্ধে হঠাৎ রান্নাঘর ভিড় ক'রে এলো আমার মগজের মধ্যে।—'থামো! ভালো লাগে না '

ভ্রমরের হাতখানা মুখের উপর থেকে সরিয়ে নিজের হাতের মধ্যে নিযে বললুম, 'প্রিয়ে, একবার তাকাও। জানলা দিয়ে তোমার ঐ চোখ দু'টিকে ভ্রমরের মতো বাইরে পাঠিয়ে দাও। স্বর্গ আজ উন্মোচিত। উর্বশীর ঝলোমলো আঁচল দুলছে হাওয়ায়। এমন সকালবেলা কি কাটাতেই হবে রান্নাঘরে, ইলিশ মাছ নিয়ে?'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভ্রমর মুচকি হাসলো। এ-কথা মানতেই হবে যে তার প্রকৃতিতে সহিষ্ণুতা আছে। আমার সম্বন্ধে, অন্তত। আমার এ-সব কথাবার্তা সে সহ্য করে হাসিমুখে, যেমন আমরা সহ্য করি শিশুর প্রগল্‌ভতা। তাতে আছে একটু করুণা, আছে স্নেহ। প্রতিবাদ করবার দরকার নেই-কেননা শোনবার দরকার নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ভ্রমরের জন্য।

ভ্রমর তার আধ-ময়লা শাড়ির স্খলিত আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে বললে: 'নাও, ওঠো। ন'টা তো বাজলো ব'লে—তাড়াহুড়ো লাগবে একটু পরেই।'

'তাড়াহুড়ো? কিসের?'

ভ্রমর আমার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষপাত ক'রে ঠোঁট বাঁকালো।

'পাগল! আজ ইশকুলে যাবো নাকি ভেবেছো!'

'না, তা কি আর যাবে! রোজই তো একবার বলো ও-কথা। তারপর ঘড়ির কাঁটা যেই দশটার কাছে আসে—তোয়ালে কই? সাবান কই। ভাত কই? জুতো কই? পান কই? একটা হুলুস্থুল বেধে যায়। সময় থাকতে একটু আস্তে-ধীরে নেয়ে-খেয়ে নিলে কী হয়? আমি একা কত দিক সামলাতে পারি! আমাকে জব্দ করতে খুব ভালো লাগে তোমার, না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলুম। হায়রে, এক দিন স্কুল কামাই করবার ক্ষমতা যে আমার আছে, আমার স্ত্রী পর্যন্ত তা বিশ্বাস করে না। উচ্ছন্নে যাবার আর দেরি কত?

'যাও না একটু বাজারে,' ভ্রমর বলতে লাগলো, 'দু'মিনিটেরই তো ব্যাপার। ছোটো দেখে একটা চ্যাপটা-মতো মাছ এনো—বুঝলে? বরফ-চাপা মাছ খেয়ে-খেয়ে অসুখ নাকি তোমারই করে। টাটকা মাছ নিজে গিয়ে আনবে না তো কী হবে।'

তাই তো! কী হবে? কী ক'রে টাটকা মাছ সংগ্রহ হ'তে পারে, এ-সমস্যাও জীবনে কিছু কম নয়। উঠে দাঁড়ালুম।

আমাকে কলমটা দেরাজে ভ'রে রাখতে দেখে ভ্রমর বললে: 'লিখছিলে নাকি?'

তাড়াতাড়ি খাতাটা চাপা দিয়ে বললুম: 'ও কিছু না।'

'দেখি না দেখি না একটু।' ('খোকা, একটা লজঞ্চুশ নেবে?' আমি যে বাজারে যেতে রাজি হয়েছি, তার পুরস্কারস্বরূপ দস্তুরমতো আমার লেখা সম্বন্ধে একটু উৎসাহী হওয়া যায়।) ভ্রমর তাড়াতাড়ি কাগজটা টেনে নিলে। একটা সনেটের প্রথম চার লাইন লিখেছিলুম—কবে, কত দিনে এবং কেমন ক'রে বাকি দশ লাইন লিখবো সেটা এখন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর করছে।

কিন্তু সত্যি আমার লেখার উপর ভ্রমরের যাকে বলে সিম্প্যাথি আছে। খুব বেশি। লেখাপড়া সে বেশিদূর করেনি, কিন্তু তার সহজ বুদ্ধির গুণে সে বুঝেছে যে মাঝে-মাঝে মাসিকপত্রে আমার যে দুটো-একটা কবিতা বেরোয় তা ভয়ংকররকম ভালো। সে আমার টেবিল রোজ দু'বেলা এমন নিখুঁতভাবে গুছিয়ে রাখে যে আমার সেই ছেলেবেলাকার কথা মনে প'ড়ে যায়, যখন লেখাপড়া ব্যাপারটা ছিলো টেবিল গুছোবার উপলক্ষ্য। আমি যদি কখনো রাত জেগে লিখি কি পড়ি সে আমার শুতে আসবার জন্য আবদার করে না। ঘরে আলো জ্বলে ব'লে তার যে ঘুমোবার অসুবিধে হয় এমন কথাও তার মুখে শুনিনি কখনো। হয়তো সত্যিও হয় না। তবু, নালিশ করবার এমন একটা সংগত উপলক্ষ্য পেয়েও যে চুপ ক'রে থাকে, তাকেই তো মহৎ বলে। আপনারা—যারা এখনো

বিয়ে করেননি, আপনাদের চুপে-চুপে বলছি যে বিয়ে যদি করতেই হয় তো ভ্রমরের মতো মেয়ে।

ভ্রমর কাগজটা সযত্নে চাপা দিয়ে ব'লে উঠলো, 'বাঃ!' ('বাঃ, খোকা, বাঃ! চকোলেট?')

আমি গায়ে একটা পাঞ্জাবি চড়াতে-চড়াতে বললুম, 'কোথায়, দাও পয়সা।'

ভ্রমর আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, 'সত্যি, কী চমৎকার পদ্য তুমি লেখো। এত ভালো আর কোনো পদ্যই আমার লাগে না।'

হঠাৎ আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠলুম।

'কী হ'লো?'

'না, কিছু না। দাও পয়সা। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। একটা ছোটো এবং চ্যাপটা-মতো ইলিশ আনতেই হবে।'

ইশকুলে যাবো না ব'লে যে শাসিয়েছিলুম সেটা অবশ্য নেহাৎই ফাঁকা বুলি। না-গেলে দুটো টাকা লোকশান। বছরে বারো দিন স-মাইনে ছুটি মেলে, তা খরচ ক'রে ফেলেছিলুম জানুয়ারি মাসের মধ্যেই। শীতকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হ'তো; কান্না পেতো দশটার সময় স্নান করবার কথা ভাবলে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখিনি। সমস্ত বর্ষাটা স্কুল করেছি—ভিজেছি গড়পড়তা সপ্তাহে দু'দিন। ইনফ্লুয়েঞ্জায় চারদিন প'ড়ে ছিলুম, ভাগ্যিশ তার মধ্যে একটা রবিবার ছিলো, দুটো টাকা বাঁচলো তবু। জীবনটা শর্দি-আতঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলো, ভ্রমর মাঝে-মাঝে রাত্তিরে শোবার সময় পায়ে গরম সর্ষের তেল মালিশ ক'রে দিতো ব'লে বেঁচে ছিলুম। জয় হোক ভ্রমরের।

মাঝে-মাঝে খামকা তবু কামাই করি। নেহাৎই গায়ের ঝালে। কাটো না বাপু—মাইনেই তো কাটবে। এর বেশি আর কী? যাবো না, কিছুতেই যাবো না; কী করতে পারো? খাটের উপর (বিয়ের) চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে কর্তাদের মুণ্ড-চর্বণ করেছি। সময় কাটাবার পরম উপাদেয় উপায়, মানতেই হবে। কিন্তু গেলো মাসখানেক ধ'রে রোজ হাজিরা দিচ্ছি। পুজোর মাসে খরচ আছে। এক টাকা কম মানে এক টাকা কম। আজও, ভ্রমরের চমৎকার রান্নার ইলিশ মাছ খেয়ে ভ্রমরের সাজা চমৎকার

পান চিবোতে-চিবোতে ছাতাটি (বিয়ের) মাথার উপর খুলে বেরিয়ে পড়লুম। আর কী—আর তো দু'দিন মোটে, পুজোর ছুটি তো এসেই পড়লো।

এই লেখার স্টাইলের সৌন্দর্য ইত্যাদি লক্ষ্য ক'রে কোনো বুদ্ধিমান পাঠক হয়তো ভেবে অবাক হচ্ছেন যে আমি স্কুলমাষ্টারি করছি। কিন্তু আমি নিজে অবাক হয়েছিলুম চাকরিটা পেয়ে। আশা করিনি, সত্যি বলতে। অমৃতবাজারে দু'দিন বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিলো ; বাংলা দেশের বিভিন্ন শহর ও মহকুমা, গঞ্জ ও গ্রাম থেকে সাতাশিটা দরখাস্ত পড়েছিলো—সংখ্যাটা ঠিক মনে আছে। তার মধ্যে আমি কোথায়? আমার অবশ্যি আছে পয়লা নম্বরের ডিগ্রি ; কিন্তু সেটাকে ভালো ক'রে দাঁড় করাতে পারি এমন সুপারিশের জোর ছিলো না। অন্য অনেকের সেটা ছিলো খুব ভারি ওজনেই। তাছাড়া, এ-পর্যন্ত আমার যা-কিছু 'অভিজ্ঞতা' সবই জীবনের ব্যাপারে, ছেলে-পড়ানোর দফাটা ফর্দর মধ্যে ছিলো না। ভরসা করবো কী ব'লে? তবু যে চাকরিটা আমারই কাছে এলো শেষ পর্যন্ত, তা বলতে হয় নেহাৎই কপালের জোরে—মানে ভ্রমরের কপালের জোরে, যে তখন পিতৃগৃহে পিয়সের সাবান, ওটিন, গানের ওস্তাদ, শরৎবাবুর নভেল, মাসে দুটো ফিল্ম, এই সবের সাহায্যে আমার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। চাকরি খুঁজতে-খুঁজতে মরীয়া হ'য়ে গিয়ে হঠাৎ বিয়ে ক'রে ফেলেছিলুম। বাংলাদেশে স্ত্রী খুঁজতে হয় না, স্ত্রী হয়। আমার এক পিসিমা বলেছিলেন আমি নেহাৎ অপয়া, আমার নিজের কপালে কিছু হবে না, ভাগ্যের মুখ ফেরাবার জন্যই আমার এখন বিয়ে করা দরকার। অবাক হ'য়ে গিয়েছিলুম তাঁর দূরদৃষ্টিতে। যা-ই হোক, সংসার-সমুদ্রে ভেসে থাকবার মতো একটা অবলম্বন যে পাওয়া গেছে, এ-জন্যই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। টাকা? পৃথিবীতে সকলেরই যে টাকা হ'তে পারে না, এ-কথা ভ্রমরও বোঝে—এবং আমাকে বোঝায়। আর কাজের কথাই যদি বলো, সংসারে কোন কাজটা করতেই বা আনন্দ হয়। থর্ড ক্লাশে একজন থর্ড ক্লাশ জীবিত বাঙালি কবির ছুঁতে-ঘেন্না-করে এমন পদ্য পড়াতে-পড়াতে—আমি যে মোটের উপর বেশ ভালোই আছি এই কথাটা মন্ত্রের মতো জপ করতে থাকি। কিন্তু তাতেও বাধা পড়ে। পাশেই বাচ্চাদের একটা ক্লাশ বসে, মাঝখানে পাৎলা কাঠের একটা পার্টিশন মাত্র। আট-দশ বছরের ছেলেরা প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যের দৃষ্টান্ত নয়—গোলমাল হয়। আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আমারই কানে ডুবে যায়—তাতে যা-হোক একটু শান্তি পাই মনে।

যে-আমি একদিন কবি হবার স্বপ্ন দেখেছিলুম, বাংলাভাষার নিকৃষ্টতম রচনার কতগুলো নমুনা পড়িয়ে এখন দিনযাপন করি। ইশকুলে, শুনতে পাই আমার নাম হয়েছে। এককালে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চা করেছিলুম, আমার হাতের খ্যাতিরেখা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু ভাবতে পারিনি, সে-খ্যাতির মানে যে এই !

প্রতি মুহূর্তে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে, ভ্রমর বিধবা হবে ভেবে অতি কষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করি। কলেজে যখন পড়তুম, নিজের ভবিষ্যৎকে দেখেছিলুম দুরাশায় উজ্জ্বল, দুঃসাহসের দিগন্তে ঝলোমলো। আজ সে-দিগন্ত ছোটো হ'তে-হ'তে এসে ঠেকেছে এই ইশকুলের দেয়ালে, ভ্রমরের আধ-ময়লা শাড়ির আঁচলের সীমায়। এর নাম জীবন।

অনেকদিন ভেবেছি চাকরি ছেড়ে দেবো, আর ভাবতে ভালো লাগে না। একদিন স'য়ে যাবে, একদিন আর গায়ে কিছু লাগবে না। এ-ই আশা। হ্যাঁ, এ-ই আশা— কিন্তু এ-ই তো দুঃখ, এ-ই তো সবচেয়ে বড়ো দুঃখ যে একদিন কিছুই আর গায়ে লাগবে না।

বছরখানেক কাজ করছি, এরই মধ্যে শিথিল হ'য়ে এসেছে স্বভাব। মানুষের মন সহজে মরে না। প্রথমটায় অনেক-কিছু ভেবেছিলুম—ছেলেদের মনে সাহিত্য-রস সঞ্চার করবো—এমনি কত। পাগলামি! চিড়িয়াখানার শিম্পাজির ঘরে ব'সে রবীন্দ্রনাথ পড়া। মাথায় থাকুন রবীন্দ্রনাথ। মাথায় থাক সাহিত্য-রস। আমার মাইনে পাওয়া দিয়ে কথা।

কর্তারা তা চান না, তাছাড়া। তাঁরা চান যে-কোনো রকমে আমি কোর্স শেষ করবো। কাজের ওজন বোঝেন তাঁরা। কোর্স শেষ ক'রে চলি। ঘোড়দৌড়। আবার কী—ঐ যথেষ্ট। যে-সব জিনিশ পড়াতে হয় তার জন্য আধ মিনিট অতিরিক্ত সময় খরচ করাও আত্মার অপমান। এমনও নয় যে আধ মিনিট অতিরিক্ত সময় পাই। বছরে চারটে পরীক্ষা; প্রতিবার আড়াইশোর মতো খাতা দেখতে হয়। প্রথম বারই কষ্ট হয়েছিলো। তারপরেই শিখে গেলুম। ছেলেটির নাম পড়ি, (চেহারা মনে রাখা মানুষের অসাধ্য), এখানে-ওখানে পড়ি দু'একটা লাইন, নম্বর বসিয়ে যাই। জল।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, অনুমানে ভুল হয়নি—কী-রকম একটা প্রবৃত্তি জ'ন্মে যায়। এরই নাম অভিজ্ঞতা।

আশ্বিনের সোনালি রোদের ভিতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এ-সব কথা ভাবছিলুম। ভ্রমরের কথা ভাবছিলুম। আমার চার-লাইন-লেখা সনেটের কথা ভাবছিলুম। ভালো হয়নি। কেনই বা লিখতে যাওয়া? কেন? নিজেকে নিজেরই কাছে প্রতিষ্ঠা করতে—সংসারের মুখে, ইশকুলের মুখে, পৃথিবীর জীবনের মুখে। প্রাণ কি সহজে মরে। মাঝে-মাঝে বিদ্রোহ ক'রে ব'লে উঠতে চায়, 'এখনো আমি আছি।' তা ছাড়া আর কী?

কিন্তু একদিন আমার লেখা আসতো। একদিন সত্যি আমি কবি ছিলুম। সে কবে—কোন জন্মে, কোন জগতে, অতীতের কোন অস্পষ্টতায়। সেদিন, যার চোখের দিকে তাকিয়ে সুরে-সুরে আমার সমস্ত হৃদয় উচ্ছল হ'য়ে উঠেছিলো, তারই দৃষ্টি কি ছড়িয়ে পড়েছে আজ এই আশ্বিনের আকাশে?

খুব আস্তে-আস্তে, অনেকক্ষণ ধ'রে নাম ডাকলুম। অনেক নাম, বেশ খানিকটা সময় নিলো। তবু, যথেষ্ট সময় যেন নিলো না। ছেলেদের মনও চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, ছুটি কাছে। তারা উশখুশ করছে, কথা বলছে ফিশফিশ ক'রে। দু'একজন দু'একটা অবান্তর কথা জিগেস করছে, সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছি। বুঝতে পারছি তাদের ইচ্ছা আমি এই ঘণ্টাটা কাটিয়ে দিই গল্প ক'রে। এ-ইচ্ছা তাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। কিন্তু না - তাদের মানুষ ব'লে স্বীকার করলে চলবে না। তারা সুবিধে নিতে আরম্ভ করবে। এরা ছেলেমানুষ, এরা বর্বর। এরা ধমক বোঝে, কান-মলা বোঝে; ভদ্রতা বোঝে না, প্রীতি বোঝে না। শিশুকাল থেকে এইভাবেই বোঝানো হয়েছে তাদের। ফিরে ফিরতি, আমিও ভোল বদলাতে বাধ্য হয়েছি এদের কাছে এসে। দোষ দেবো কার? বিষাক্ত চক্রের আরম্ভ কোথায়?

প্রথমটায় বেশ একটু কষ্ট হয়েছিলো এদের পোষ মানাতে। বয়েস আমার অল্প। দেখতে, গতানুগতিক স্কুলমাষ্টারমূর্তির তুলনায়, নেহাৎ কাঁচা। মুখের হাসিখুশি ভাবটা সামলাতে পারতুম না কিছুতেই। ছেলেরা বাঁদরামি করতো। টানলুম মুখোশ। কী ভয়ানক গম্ভীর, চোখের পলক পড়ে না। যেন সব সময় চ'টে আছি। সামান্য অছিলায় দেখতে-একটু-ছেলেমানুষ গোছের কয়েকটা ছেলে বেছে-বেছে শাস্তি বিতরণ

করলুম। ফল পেলুম আশ্চর্য। ছেলেরা মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস পায় না। সেই মুখোশ এখন আর খসাতে পারিনে, ইচ্ছে করলেও পারিনে। ওটা মুখের উপর ব'সে গেছে। ক্লাশে ঢুকলেই কী-রকম গুড়গুড় ক'রে নেমে আসে, নিজেই টের পাইনে। একদিন হয়তো সেটাই কায়েমি হ'য়ে বসবে মুখের উপর। তা তো হবেই—ভেবে কী লাভ।

না, গল্প করলে চলবে না। আমাকে পড়াতেই হবে আশুবাবুর ন্যক্কারজনক জীবন-চরিত। ছেলেরা ভাবুক আমার ভিতরটা কোনোখানে এতটুকু কাঁচা নয়। গলা-খাঁকারি দিয়ে বই খুললুম। একবার চোখ গেলো বাইরে। শহরের ছাদের ঢেউয়ের উপর দিয়ে খানিকটা আকাশ যেন উত্তাপে আলস্যে দীপ্তিতে মূর্ছিত। আমি করছি কী? সোনালি-নীল স্বপ্নের মতো এই দিন আমাকে কাটাতে হবে আশুবাবুর জীবনচরিত পড়িয়ে? কিন্তু কোর্স শেষ না-করলে চলবে কেন? ডিউটি।

চোখ ফিরিয়ে এনে নিবদ্ধ করলুম বইয়ের পৃষ্ঠায়। আরম্ভ করলুম। সমস্ত ঘরের স্তব্ধতার মধ্যে আমার একঘেয়ে, একটানা কণ্ঠস্বর। আশ্চর্য—ওরা কেউ আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলে না কেন?

আর হঠাৎ, ঘরের মধ্যে আর-একটা শব্দ। তাকিয়ে দেখলুম, মস্ত বড়ো কুচকুচে কালো একটা ভ্রমর পিছন দিককার জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। মেলে দিয়েছে পাখা, অন্ধের মতো ছোটো-ছোটো চক্র এঁকে ঘুরছে ছেলেদের মাথার উপর। গুঞ্জনে ভ'রে গেলো ঘর, ভ'রে গেলো আকাশ, ভ'রে গেলো বিশ্ব। কোনোখানে আর-কিছু নেই, এই গুঞ্জনে চিরকাল বাণীময়। আমার চোখের সামনে ক্লাশঘরের দেয়ালগুলো দূরে সরতে-সরতে দিগন্তে মিলিয়ে গেলো, হারিয়ে গেলো ছেলেদের মুখ—তারপর রাত্রি, ঘরে নীলাভ লঘু অন্ধকার, বাইরে আকাশ ভ'রে জ্যোছনা। জানলার ধারে সে ব'সে। একটা পেয়ারা গাছের পাতার ভিতর দিয়ে ছায়ার জালি-কাটা জ্যোছনা এসে পড়েছে তার চুলে, তার ঠোঁটে, টেরচা হ'য়ে তার বুকের উপর। রক্ত কল্লোলিত সমুদ্রের জোয়ারের মতো; হৃৎপিণ্ড আছাড় খেয়ে মরছে মাংসের দেয়ালে।

'এত দেরি করলে কেন?'

কথা বলতে আমার যেন ভয় করছিলো। তার চুলের আর ঠোঁটের আর শিথিল বাহুর দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলুম।

বিদ্যুৎময় স্তব্ধতা। সে মাথা নিচু করলো, যেন সে-ও সাহস পাচ্ছে না আমার চোখের দিকে তাকাতে, পাছে ভয়ংকর রহস্যময় আগুন জ্ব'লে ওঠে দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টির

ঘর্ষণে। তার সিঁথির অস্পষ্ট রেখা জ্যোছনায় আভাময় হ'য়ে উঠলো, যেন অন্ধকারের বুক-চেরা অন্তহীন ছায়াপথ।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?' হাওয়ায় নিশ্বাসের স্বর ভেসে এলো, 'কোথায় ছিলে? আমার যে কী কষ্ট হয় তা কি বুঝতে পারো না? তোমাকে ছেড়ে আমি কী ক'রে বাঁচবো?'

রুদ্ধ স্বর বেজে চললো, নরম, অর্ধস্ফুট, রাত্রির হৃদয়ের কোনো মর্মরের মতো। তারপর তা স্ফীত হ'য়ে উঠতে লাগলো, একটা সংহত ধ্বনি, কথাহীন একটা গুঞ্জন - আমার কানের কাছে এই ভ্রমরের উচ্চ সানন্দ গুঞ্জনের মতো। ভ্রমরটা ঠিক আমার মাথার উপর চঞ্চল পাখা নাড়তে-নাড়তে উল্টোদিকের জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

—'ইম্পর্ট্যাণ্ট প্যাসেজগুলো একটু দাগ দিয়ে দেবেন, স্যর?'

১৯৩১ 'ঘরেতে ভ্রমর এলো'

রাধারানির নিজের বাড়ি

রাধারানির যখন বিয়ে হ'লো তার বয়েস তেরো। তাব স্বামী গিরিজাপ্রসন্ন কলকাতায় এক সওদাগরি হৌসে পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকরি করতো। লেখাপড়া তার বেশিদূর করা হয়নি—কি সে বেশিদূর করেনি; আঠারো বছর বয়েসেই এক বিলিতি কোম্পানিতে ঢুকে গিয়েছিলো পঁয়তাল্লিশ টাকায়; এখন তেইশ বছরে তার মাইনে যখন পঁচাত্তর হ'লো, সে করলো বিয়ে। তার মা-বাবা বললেন, এইবার বিয়ে কর, কবে ম'রে যাই ঠিক কী—ইত্যাদি, যে সব কথা হিন্দু বাপ-মা বয়প্রাপ্ত ছেলেকে ব'লে থাকেন। গিরিজা তাঁদের প্রস্তাবে আপত্তি করবার কিছু দেখলো না; কেন সে বিয়ে করবে না, তার কোনো কারণ দেখতে পেলো না। আর সে-কথাই যদি ওঠে, কেন সে বিয়ে করবে, তারও কোনো কারণ সে অবশ্য পায়নি। খোঁজেও নি। কারণ নিয়ে সে বড়ো একটা মাথা ঘামাতো না। তার নিজের, বলতে গেলে, কোনো মতামতই ছিলো না। কোনো মতামত গ'ড়ে তোলবার সময়ই ছিলো না তার জীবনে। অত্যন্ত অস্পষ্ট গোছের মানুষ, নিজের মনে সে কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারতো না; তার ছিলো না কোনো ভাবনার বালাই। সে চুপচাপ থাকতো, যেমন দিন কাটে কাটুক, যতক্ষণ না কেউ তাকে ব'লে দিতো কী করতে হবে। তখন অবশ্য সেই কাজের যথাসাধ্য দ্রুত সম্পাদনের জন্য সে সচেষ্ট হ'তো। সে বেশি কথা বলতো না, কোনো ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাতো না; কিন্তু তার আলস্য ছিলো না কাজে। তার মৃদু, নীরব ধরনে সে নিখুঁত কাজ ক'রে যেতে পারতো; সেই ধরনের লোক, চলতি ভাষায় যাকে বলে করিৎকর্মা। কেরানি-জীবনের চাইতে ভালো তার পক্ষে কিছু হ'তে পারতো না, সে তা ভালোবাসতো। কখনো কিছু ভাববার দরকার হয় না, বেশি কথা বলতে হয় না, ঘাড় গুঁজে কলম চালিয়ে গেলেই হ'লো। হ্যাঁ, সে তা ভালোবাসতো—আপিশে তার দীর্ঘ আট-দশ ঘণ্টা; সব সময়, সে-ই উপস্থিত সবার আগে; সাহেবরা আসবার প্রায় আধ ঘণ্টা আগে এসে ডাক খুলেছে, সাহেবের জন্য ঠিক ক'রে রেখেছে কাগজপত্র। আর, সব সময় তার দাড়ি কামানো, জামা-কাপড় সাফ। চেহারা আর পোশাক সম্বন্ধে একটু যত্ন নিতো সে, নিজের তৃপ্তির জন্য নয়, সেটা আপিশের কেতা ব'লে। বড়ো সাহেব তাকে পছন্দ করতেন। ছোটো সাহেব তাকে পছন্দ করতেন।

আপিশের অন্যান্য কেরানিরা মুখে তার সঙ্গে খুব ভাব ক'রে আড়ালে শাপান্ত করতো ; 'দেখবে,' তারা বলাবলি করতো, 'এ ছোকরা ধাঁ-ধাঁ ক'রে আমাদের ছাড়িয়ে যাবে।' আর হ'লোও তা-ই ; এই ক'বছরের মধ্যেই সে লাফিয়ে চ'ড়ে বসলো পঁচাত্তর টাকার উচ্চ ডালে, যেখানে তার চাইতে বয়সে পনেরো বছরের বড়ো কোনো-কোনো কেরানি এখনো পৌঁছতে পারেনি। আর এই শেষ নয়, আরো আছে। লোকে বলতো, তার কপালটা ভালো, কিন্তু সে নিজে যেন তা জানতো না। কিছুই যেন জানতো না, কোনো বিষয়েই সে সচেতন নয়। তার চোখের দৃষ্টি শূন্য, আত্ম-বিস্মৃত, সব সময়েই সে যেন ঘুমোচ্ছে, কখনো সম্পূর্ণরূপে জেগে নেই। কিন্তু তার বাপ-মা জানতেন যে তার কপাল ভালো সেইজন্য মুখে তাঁরা বলতেন ছেলেটা কিছু করতে পারছে না, 'কিছুই হচ্ছে না তোর।' কারণ অদৃষ্টের দেবতাকে কখনো জানতে দিতে নেই যে আমরা জেনেছি তাঁর প্রসাদ আছে আমাদের উপর। সবচেয়ে ভালো সব সময় নালিশ করা, —সবচেয়ে নিরাপদ।

সুতরাং তাঁরা বললেন, 'ছেলের বিয়ে দিয়ে দেখি -বৌয়ের ভাগ্যে যদি কপাল ফেরে।'

এখন, রাধারানি, যদিও তার বয়েস মোটে তেরো, সে মোটামুটি জানতো বিয়ে ব্যাপারটা কী। সে এতদিন কাটিয়েছে তার মা-বাবার সঙ্গে সুদূর মফস্বলের কোনো অতি ছোটো সহরে, যার নাম মাঝে-মাঝে দেখা যায় স্ত্রীহরণ কি বালিকাবধূর আত্মহত্যার সম্পর্কে বাংলা খবর-কাগজে। স্থানীয় মেয়ে-ইশকুলে সে কিছুদিন যাতায়াত করেছিলো, কিন্তু লেখাপড়ায় মন ছিলো না তার। বইয়ের চেহারা তার পছন্দ হ'তো না। আর, ছেলেবেলা থেকেই সে জানতো সে একটু বড়ো হ'য়ে উঠতে-না-উঠতে বাপ-মা তার বিয়ে দিয়ে দিবেন—সুযোগ পাওয়ামাত্র। তাই তার সব চিন্তা গিয়ে পড়েছিলো বিয়ের উপর। বিয়ে! বিয়ের কথা ভাবতে তার কোনোরকম আনন্দ হ'তো না, একটুও দুঃখ হ'তো না : সে শুধু তা মেনে নিয়েছিলো মনে-মনে—মেনে নিয়ে চুপ ক'রে ছিলো। আর তবু, তার মধ্যে ছিলো অনেকখানি শক্তি, উৎসাহ, যা চালনা করতে পারলে সে খুশি হ'তো। কিন্তু তা সে জানতো না, তখন পর্যন্ত জানতো না। তার মধ্যে বিশেষ-রকমের একটা একগুঁয়েমি ছিলো, যা তার মা-র মনে হ'তো 'অলক্ষুনে,' আর যা নির্মূল করতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু তার ফলে রাধারানির মন আরো যেন বিকৃত হ'য়ে উঠতো, টক মিশলে দুধ যেমন ছানা হ'য়ে যায়। তার মধ্যে ছিলো কঠিন, কঠিন ইচ্ছা ; ইচ্ছার শক্তি। সে যদি চায় পাখি পুষতে, সে বরং মরবে, তবু তার পাখিকে ছেড়ে দেবে না ; সে যদি চায় নিজের হাতে মুড়িঘণ্ট রাঁধতে, সে বরং আগুনে পুড়বে,

তবু উনুনের ধার থেকে নড়বে না। আর যদি সে-মুড়িঘণ্ট পুড়ে গিয়ে থাকে, খাবার অযোগ্য হ'য়ে থাকে, যার-যার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে খেয়ে ওঠা ছাড়া উপায় নেই। কর্তৃত্ব করবার ঝোঁকটা ছেলেবেলা থেকেই তার মধ্যে প্রবল। সংসারে, সংসারের জীবনে নিজের ইচ্ছাকে খাটানোতেই তার সার্থকতা।

কিন্তু বাপের বাড়ি, সে জানতো, তার বাড়ি নয় : অস্পষ্টভাবে সে অনুভব করতো, এখানে তার ইচ্ছা চলবে না—এটা ঠিক তার জীবন নয়, জীবনের ভূমিকা মাত্র। এখন পর্যন্ত নবিশি। মেয়েদের যতদিন বিয়ে না হয়, সেটা একটা শূন্যতা, ততদিন তার জীবন ভালো ক'রে আরম্ভই হয় না। এটা আমলে আনবার নয়, বিয়ে হবার সঙ্গে-সঙ্গেই একে যেতে হয় ভুলে'। বিয়ে হবার আগে পর্যন্ত সে কী করেছে আর না করেছে, সেটাতে যেন কিছু এসে যায় না। বিয়ে যেদিন হবে, সেদিন থেকেই যেন সে ঠিক হ'তে আরম্ভ করবে।

হ'লো বিয়ে। প্রথম তিন বছর কাটলো শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে দেশে, বরিশালের এক গ্রামে। গিরিজা মাঝে-মাঝে আসতো, ছুটি-ছাটায়। কিন্তু রাধারানির পক্ষে সে তখন পর্যন্ত বাস্তব হ'য়ে ওঠেনি। তার অধিকাংশটা জড়িয়ে ছিলো দেশের বিস্তৃত বাড়িতে, বৃহৎ যৌথ পরিবারের নানা দায়িত্বে, নানা কর্মসমাপনে, প্রীতি-সাধনে। সে-সব খুব ভালো লাগতো তার ; ও-সব ব্যাপার খুব ভালোবাসতো সে। শ্বশুর-শাশুড়ি বৌ পেয়ে মহা খুশি হয়েছিলেন ; এতটুকু মেয়ে গৃহস্থালিতে এমন নিপুণ হবে, তা তাঁরা আশা করতে পারেননি। রাধারানিকে কিছু বলতে হয়নি, কিছু শেখাতে হয়নি ; যেন এরই জন্যে সে তৈরি হ'যে ছিলো, পেয়ে বেঁচে গেলো। সংসারের আওতায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে সহজে, স্বচ্ছন্দে—মাছ যেমন জলে।

তবু তার মনে গুমরে মরছিলো সেই অতৃপ্তি—নিজের ইচ্ছাকে সে খাটাতে পারছে না। যেমন সে তার বাপের বাড়ির ছিলো না, তেমনি, এ-বাড়িরও সে নয় : এ-সব তার নয়, সে এ-সবের অংশ নয়। যতই সে উৎসাহ নিয়ে কাজ করুক, শেষ পর্যন্ত সে চাইতো সব তার নিজের হোক, তার নিজের। তারই হাতে সব—সে তৈরি করবে, গ'ড়ে তুলবে, সাজাবে নিজের হাতে। সব-কিছুর মধ্যে সে। বাড়িটা তাকে দিয়ে ভরা। কিন্তু এখানে—এত মিশে গিয়েও সে যেন ঠিক মিশে যেতে পারেনি, একটু আলগোছ ভাব, মনের অনেক নিচে একটু গোপন উদাসীনতা। তাহ'লেও, এত কাজের, এত দায়িত্বের মধ্যে তার চাপা শক্তি খেলে বেড়াতে পারছিলো। সেটা কম নয়।

তিন বছর পর স্ত্রীর ভাগ্য ফললো ; গিরিজার মাইনে বাড়লো আরো দশ টাকা।

পুজোর ছুটিতে সে যখন এলো, তার মা বললেন, 'কতকাল আর মেসের ভাত খাবি, এইবার ছোটোখাটো একটা বাড়ি নে, বৌকে নিয়ে যা।'

গিরিজা কলকাতায় ফিরে এসে তা-ই করলো। যদি তার মা না বলতেন, তাহ'লে আরো কিছুকাল বোধহয় এ-কথা তার মনে হ'তো না। কিন্তু তার মা বলেছেন ব'লে মনে-মনে খুশি হ'লো সে।

এলো রাধারানি কলকাতায়। ভবানীপুরের এক গলির মধ্যে পুরোনো এক দোতলা বাড়ি, অনেক তার শরিক। তাদের ভাগে পড়েছে একটা বড়ো ঘর, একটা ছোটো, আর একটা বারান্দা—রান্না-খাওয়ার পাট সেখানেই সারতে হবে। নিচে জলের কল, তার উপর সকলের দখল সমান। তা-ই নিয়ে সকালবেলাটায় একটা মারামারি বাধে। রান্নার জন্য উপরে জল টেনে আনতে হয় বালতি ক'রে। বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে একটা ইঁট-বেরিয়ে-পড়া উঁচু দেয়াল—ঈশ্বর শুধু জানেন কেন ওটা সেখানে আছে। জানলা দিয়ে একটু তাকাবার উপায় নেই, দেয়ালে হোঁচট খেয়ে ফিরে আসে চোখ। ঘরে যে-জানলা দুটো আছে, তা দিয়ে দুপুরবেলায় এক ফালি রোদ কী ক'রে যেন এসে ঢোকে, মিলিয়ে যায় দেখতে-না-দেখতে। তবু ভালো, ছাতে যাবার সিঁড়ি আছে, সন্ধেবেলাটায় নিশ্বাস ফেলা যায়। ভাড়া আঠারো টাকা।

খুশি হবার মতো বাড়ি নয়, রাধারানিও মুখে অনেক আপত্তি জানালো। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে সে উল্লসিত। তার বাড়ি। তার নিজের! ভাবতেই রাধারানির শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। ওঃ, কী ক'রে সে সাজাবে এই বাড়ি, ক'রে তুলবে সুন্দর, গ'ড়ে তুলবে দিনে-দিনে তার সংসার. তার নিজের সংসার। এ-বাড়ি তাকে দিয়ে ভরা; তার ইচ্ছা এখানে চরম। সেই জীর্ণ রুদ্ধশ্বাস বাড়ির সঙ্গে রাধারানি কান-মাথা ডুবিয়ে প্রেমে প'ড়ে গেলো। এ যে তারই প্রতিকৃতি; তারই মনের ছায়া এর খোপে-খাপে, আনাচে-কানাচে। অন্তত, তা-ই হবে।

গিরিজা নিজের বুদ্ধি খরচ ক'রে সামান্য ও সাধারণ কিছু আসবাব কিনেছিলো; রাধারানির সেগুলো পছন্দ হ'লো না। বললে, 'ঐ চেয়ারটা কেন কিনেছো—হাঁটু-ভাঙা দ-এর মতো দেখতে?'

গিরিজা একটু কেশে বললে, 'শস্তায় পেলুম—'

'শস্তা!' রাধারানির কণ্ঠস্বরে ঐ শব্দটার প্রতি অবজ্ঞা ফুটে উঠলো, 'কে বলেছিলো তোমাকে এখন ওটা কিনতে? পাশ ফেরবার জায়গা নেই—তার মধ্যে এক বিদঘুটে চেয়ার এনে হাজির। দেবো একদিন ওটাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে।'

গিরিজা চুপ ক'রে রইলো।

'আর—ঐ তক্তপোশ দিয়ে কী হবে? ব'য়ে গেছে বাক্সে কেরোসিন-কাঠে শুয়ে হাড়ে ব্যথা করতে। খটখটে মেঝে—মেঝেতে শুলে কেউ নিউমোনিয়ায় মরবে না। জায়গা নেই এক ফোঁটা, তার মধ্যে এই পাঁচ সিকে দামের তক্তপোশ জায়গা জুড়ে থাক, কেউ যেন আর চলাফেরা করতে না পারে। মাথা খারাপ নাকি?'

গিরিজা ক্ষীণস্বরে আরম্ভ করলো, 'আমি ভেবেছিলাম—'

'থাক, তুমি যা ভেবেছিলে, তা আর বোলো না। একদিন যখন ঘুঁটে থাকবে না, এটা ভেঙে উনুন ধরাবো। তবে আমার শান্তি হবে।'

তক্তপোশটা বদলি হ'লো পাশের ছোটো ঘরটায়, যেখানে থাকতো রাধারানির দুই ছোটো-ছোটো দেওর—নবীন আর যতীন। তারা এসেছিলো বৌদির সঙ্গে কলকাতায়, ইশকুলে পড়বে ব'লে। তারা আপত্তি করলে, 'ধরে না, বৌদি, তক্তপোশটা ভালো ক'রে।'

রাধারানি বললে, 'ফাজলেমি রাখ। গায়ে লাগলো না তক্তপোশটা—না? কেন, মন্দ কী এমন? বেশ তো শুবি দু'জনে জানলার দিকে মাথা দিয়ে—হাওয়া আসবে।'

তারা বললে, 'আর যে জায়গাই রইলো না।'

'ঘরের মধ্যে কি যুদ্ধ করবি নাকি? দস্যিপনা করতে হয় তো বাইরে রাস্তা রয়েছে, সরকারি পার্ক রয়েছে। ঘুমোবার সময় ঘরে এসে শুবি চুপচাপ।'

চেয়ারটা কিন্তু রাধারানির ঘরেই র'য়ে গেলো; জিনিশটা, যা ই হোক, একটা চেয়ার; আর চেয়ার ফেলে দেবার জিনিশ নয়। ওটা রইলো এক কোণে, একটু মুখ-চোরা, লাজুকভাবে—তবু নিজেকে যথাসম্ভব ভালো দেখাবার জন্য সচেষ্ট। গোপন গর্ব নিয়ে রাধারানি মাঝে-মাঝে ওটার দিকে তাকায়। জিনিশটা আসবাবনির্মাতার আর্টের খুব একটা ভালো নিদর্শন ঠিক নয়; একটু হাঁটু-ভাঙা দ-য়ের মতো চেহারাই বটে—শাদাশিধে, বার্নিশ-ছাড়া এক টুকরো কাঠ, হাতল নেই, পিঠটা ঠিক সম-কোণে, বসলেই উঠতে ইচ্ছে করে। তবু—ক্রমে-ক্রমে যে-সব জিনিশ রাধারানির ঘরে জ'মে উঠতে থাকবে—এটা তারই সূচনা; সে-সব জিনিশ, বলতে গেলে, এই চেয়ারটাই আনছে ডেকে। সুতরাং ওটা থাকতে পারে।

আর—কিছুদিন পর্যন্ত রাধারানির নেই মুহূর্তের বিশ্রাম, তার ফরমায়েশ খাটতে-খাটতে নবীন আর যতীন হাঁপিয়ে পড়লো—আর গিরিজাও, আপিশ ক'রে যেটুকু সময় তার হাতে থাকতো। আনো পা-পোষ, মাদুর, দেয়ালে ঝোলাবার জাপানি পরদা, টুকিটাকি এটা আর ওটা, অত্যন্ত পরিমিত আয়ের মধ্যে যেটুকু সম্ভব—দাও ঝাঁট, ঢালো

জল. ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ঘ'ষে-ঘ'ষে পালিশ ক'রে তোলো মেঝে। তাদের চাকর-বাকর ছিলো না, নিজেদেরই জল ব'য়ে আনতে হ'তো নিচে থেকে বালতি ক'রে, লম্বা ঝাঁটা দিয়ে সাফ করতে হ'তো সীলিঙের ময়লা ; আর রাধারানি মেঝের উপর হাঁটু ভেঙে ব'সে এমন উৎসাহ আর আনন্দ নিয়ে মেঝে ঘষতো যা দেখে মন ভালো হ'য়ে যাবার কথা।

মোটের উপর, ফল হ'লো আশ্চর্য ; এটুকু বাড়ির মধ্যে জ'মে উঠলো যতটা সম্ভব আরাম আর সৌন্দর্য। ছাতে যাবার সিঁড়ির গোড়ায় একটু ফাঁকা জায়গা ; সেখানে রাধারানি বসালো ফুলের টব, রান্নার বারান্দাটা ভাগ ক'রে নিলো নীল রঙে ছোপানো একটা পুরানো কাপড়ের পরদা দিয়ে—গোটাকয়েক আত্মীয়দের ফোটোগ্রাফ ছিলো, সেগুলো তার দেয়ালে সাজাতে গিয়ে কাটিয়ে দিলে একটা সম্পূর্ণ দুপুর। মোটামুটি সবই ভালো হ'লো, তবু তার শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। তবু তার মনের মধ্যে অবিশ্রান্ত কেউ বলছে : না, হ'লো না, ঠিক হ'লো না। সে নিজেকে ঢেলে দিলে তার সংসারে—দিলো তার শরীর আর মন, তার সব ; এক মুহূর্ত ব'সে থাকা তার পক্ষে যন্ত্রণার মতো। সে যখন ফুলের টবে জল দিচ্ছে না তখন বিছানা-বালিশ ঘাড়ে ক'রে যাচ্ছে ছাতে রোদে দেবার জন্য ; যখন আয়নাটার উপর চুন ঘ'ষে চকচকে করছে না তখন কাঁসার বাসনগুলো অকারণে মাজছে ছাই দিয়ে, যতক্ষণ না মুখের ছায়া তাতে ভেসে ওঠে। একটা-না-একটা তার করা চাই-ই—সব সময়। একটা মুহূর্ত সে নষ্ট হ'তে দেবে না ; ক্রীতদাসীর মতো সে খাটবে—আর ওঃ, দাসীবৃত্তির আনন্দ, গৌরব !

সগৌরবে, সানন্দে, সে তাকাতো তার বাড়ির দিকে ; বাড়িটার যেন কিছু বলবার আছে তাকে ; দু'য়ের মধ্যে নীরব নিবিড় ঐক্য। রক্ত চঞ্চল হ'য়ে, উষ্ণ হ'য়ে বইছে রাধারানির শিরায়, তবু তার মনের মধ্যে সেই কথা : 'হ'লো না, তবু হ'লো না। আরো অনেক বাকি র'য়ে গেছে।' মনে-মনে সে ভাবতো দক্ষিণ-খোলা আলাদা একটা বাড়ি, কালো বার্নিশের প্রকাণ্ড খাট, প্রমাণ সাইজের আয়না-লাগানো কাপড় রাখবার আলমারি।' সুবিধে পেলেই সে ছোটোখাটো আসবাব কিনতো—একটা বেতের চেয়ার কি একটা টিপয়, রাস্তায় যে-সব নিয়ে যায় ফেরি ক'রে ; কিন্তু কালো বার্নিশের সেই প্রকাণ্ড খাট সব সময় তার মনে, আর আয়না-লাগানো আলমারি, আর—আরো কত কী।

স্বামীকে সে মাঝে-মাঝে বলতো তার ইচ্ছা, ঠাট্টার সুরে, গোপন স্বরে। গিরিজা নিষ্ফলভাবে হাসতো, যেন বলতে চায়, 'কী-লাভ ও সব ব'লে ?' রাধারানি বলতো, 'কেন,

হ'তে পারে না বুঝি? কী আর অমন বেশি।' গিরিজা নিজে বিশ্বাস না-ক'রে বলতো, 'তাহ'লে হবে।'

এক বছর পরে রাধারানি জন্ম দিলো এক মৃত শিশুর। মুখ লুকিয়ে ছেলেটার জন্য সে কাঁদলো খানিকক্ষণ। কিন্তু তার নিজের শরীরই খুব খারাপ হ'য়ে পড়লো; দরকার হ'লো বড়ো ডাক্তার ডাকবার। রাধারানি ব্যাকুল তীব্রস্বরে বললে: 'কী যে করছো! এতগুলো টাকা—'

জীবনে প্রথমবার গিরিজা জোর দিয়ে একটা কথা বললে, 'তাই ব'লে তুমি মরবে নাকি?'

'পাগল! মরা কি এতই সোজা।'

কিন্তু গিরিজাকে থামানো গেলো না; সে নিয়ে এলো বড়ো ডাক্তার। ইতিমধ্যে সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিলো—যে-লোক সম্পূর্ণ আত্ম-সচেতন নয়, সে যেমন ক'রে ভালোবাসে—অন্ধভাবে, মূঢ়ভাবে। স্ত্রীর চিকিৎসায় সে তার সঞ্চয় অনেকখানি হালকা ক'রে ফেললো।

দুর্বল, রুগ্ন, শয্যাগত, রাধারানি অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। প্রতিটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে যেন তার শরীরের এক-এক ফোঁটা রক্ত। এ-টাকা দিয়ে কত কী হ'তে পারতো, বাড়ির শ্রী একেবারে ফিরিয়ে দেয়া যেতো। কেনই বা লোকে টাকা জমায়! এ-রকম হবে জানলে সে আগে থেকেই সব খরচ ক'রে দিতো, একটি পয়সা রাখতো না হাতে। কেন সে মরতেও পারে না—তাহ'লেই তো এ-অপব্যয় হয় না আর। না—মরতে সে চায় না, তাকে সেরে উঠতেই হবে। কিন্তু এমনিও তো তা হ'তে পারে।

একদিন সে তার স্বামীর হাত ধ'রে বললে, 'কী পাগলামি করছো। ভিখিরি হবে নাকি শেষটায়?'

গিরিজা বললে, 'টাকা চ'লে গেলে আবার আসে, কিন্তু—' বাকিটা সে বলতে পারলো না।

'কিন্তু এতই কি দরকার ছিলো?'

'তোমার ও-সব ভাবতে হবে না। তুমি এখন ভালো হ'য়ে ওঠো।'

ভালো রাধারনি হ'য়ে উঠলো; আবার পড়লো তার বাড়ি নিয়ে। এতদিনের অবহেলার শোধ তো তুলতে হবে। সে যে এতদিন এ-বাড়িতে শুধু বাস করেছে, আর কিছুই করেনি, এ-কথা ভাবতে অসহ্য লাগছিলো তার।

'বাড়িটা বদল করলে কেমন হয়?' একদিন সে কথায়-কথায় বললে। সে বলতে

গেলে এ-বাড়িকে যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এ-বাড়িতে তাকে আর ধরছে না। এখন দরকার নতুন বাড়ি—নতুন আর বড়ো।

'আমিও সে-কথাই ভাবছিলুম', গিরিজা বললে, 'তোমার শরীরটা '

'ওঃ, আমার শরীর!' এমন সুরে রাধারানি বললে কথাটা যে গিরিজা সেখান থেকে উঠে গিয়ে দাড়ি কামাবার আয়োজন করতে লাগলো।

বাড়ি খোঁজা হ'তে লাগলো, কিন্তু কলকাতায় বাড়ি বদল করবার মতো শক্ত কাজ আর কিছু নয়। খালি বাড়ির অভাব নেই ; কিন্তু একটাও এমন নয়, যা তারা নিতে পারে। তারা থাকতে পারে ঠিক এমন একটি বাড়ি নেই কোনোখানে ; অন্য সব রকমই অজস্র। রোদে ঘুরে-ঘুরে ল্যাম্পপোস্টের বিজ্ঞাপন পড়তে-পড়তে নবীন যতীন কাহিল হ'য়ে গেলো।

'নিজেদের একটা বাড়ি হ'লেই সবচেয়ে ভালো হয়,' রাধারানি বললে।

'আমি বাংলাদেশের লাট হ'লেই বা মন্দ কী।' গিরিজা একটা রসিকতার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেটা ঠিক লাগসই হ'লো না। রাধারানি ভুরু বাঁকিয়ে বললে, 'কী যে বলো এক-একটা কথা, শুনলে গা জ্বালা করে। আজকালকার দিনে যে-সে বাড়ি করছে।' সে যেন মনে-মনে জানে যে একদিন তারও হবে।

ততদিন চললো ভাড়া-বাড়ির খোঁজ ; পাওয়া গেলো না। দিন কাটতে লাগলো তারপর রাধারানি আবার সন্তান প্রসব করলো।

এবার মেয়ে। দিব্যি মোটাসোটা দেখতে, মাথা-ভরা কালো চুল, চ্যাচায় গলা ছেড়ে। রাধারানি ভয়ানক খুশি হ'লো। অনেক ভেবেচিন্তে মেয়ের নাম রাখলো মীরা। মীরার জন্য ব'সে-ব'সে শেলাই করলো জামার স্তূপ, নানা রঙের—শিশুর গায়ে দু'ঘণ্টা এক জামা থাকে না। গিরিজা কিনে আনলো বোতলের দুধ, দুধের বোতল। দু'মাস গেলো। তারপর একদিন দেখা গেলো, মীরার মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। রাধারানির মনে হ'লো সে যেন আর অত বেশি চ্যাঁচায় না, হাসে না। গেলো আরো বেশি ক'রে গ্ল্যাক্সো খাওয়াতে, মীরা বেশি খেতে পারে না, যেটুকু খায় বমি ক'রে ফেলে। দেখতে-দেখতে সে যেন অনেকটা রোগা হ'য়ে গেলো। গিরিজা বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে কিনে আনলো নতুনতম ও আশ্চর্যতম বিলিতি শিশুপথ্য। কিন্তু মীরা যেন কুঁকড়ে ছোটো হ'য়ে যাচ্ছে। ডাকা হ'লো ডাক্তার, তিনি গম্ভীর হ'য়ে ওষুধ দিয়ে গেলেন। দিন পনেরো ধ্বস্তাধ্বস্তি, তারপর মীরা মারা গেলো।

এর পরে আর ও-বাড়িতে বাস করা অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। একটু বেশি ভাড়া দিয়েই গিরিজা চট ক'রে ঠিক ক'রে ফেললো অন্য বাড়ি। রাস্তাটা বড়ো, বাড়িটাও

অনেক ভালো। দোতলায় তিনটে ঘর, রান্নাঘর, ভালো বাথরুম, ইলেকট্রিক আলো। রাধারানি অনুভব করলো যে মীরার মৃত্যু সত্ত্বেও তার জীবন আরম্ভ হ'লো নতুন ক'রে

পুজোর সময় গিরিজা মোটা বোনাস পেলো। অন্যান্য বছর এ-টাকা থেকে খানিকটা জমা হয়; এবার রাধারানি বললে, 'একটা খাট কেনো, আর একটা আয়না-বসানো কাপড়-রাখা আলমারি।'

'সে যে অনেক টাকা', গিরিজা বললে।

'অনেক টাকাই তো পেয়েছো।' একটু পরে: 'কী হবে টাকা রেখে। একটা-কিছু হবে, আর বেরিয়ে যাবে জলের মতো।'

গিরিজা বলতে যাচ্ছিলো, 'সেইজন্যেই তো।' কিন্তু সে মুখ খোলবার আগেই রাধারানি বললে, 'না, এবার কেনাই চাই।'

কেনা হ'লো। মস্ত খাট আর জাজিম; আলমারির আয়নাটা রাধারানির প্রায় দেড়গুণ লম্বা। সে সেটার দিকে তাকালো, মুগ্ধ হ'য়ে। কাছাকাছি যখন কেউ থাকে না, অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে থাকে আয়নার দিকে, আয়নায় তার মূর্তির দিকে। আর প্রাণ আস্তে-আস্তে ফিরে আসতে লাগলো তার রক্তে, শোক লঙ্ঘন ক'রে, মৃত্যু পার হ'য়ে।

সেই সঙ্গে ফিরে এলো সেই ক্ষীণ তীক্ষ্ণ স্বর: 'তবু হ'লো না, তবু হ'লো না। এখনো হয়নি—আরো চাই, চা-আ-আই। ধারালো তলোয়ারের মুখের মতো ছোটো-ছোটো সেই কথাগুলো লাগলো গিয়ে তার মনে। তার নিজের একটা বাড়ি চাই, তার নিজের, যাকে সত্যি সত্যি নিজের বলা যায়। বালিগঞ্জের কানোখানে ছোটো একটি দোতলা বাড়ি, চওড়া লাল সিঁড়ি; সামনে ছোটো একটু বাগান, সেখানে হেনা ফুটবে শ্রাবণ মাসে। সুন্দর ছোটো একটি বাড়ি—পৃথিবীর অন্য যে-কোনো বাড়ির চেয়ে সুন্দর, কেননা সেটা তার নিজের। এমন-কিছু বেশি আশা নয়।—কিন্তু এ যে আশার চেয়েও বেশি, এ একটা ক্ষুধা; তার রক্তের মধ্যে, জাগ্রত ও মগ্নচৈতন্য আচ্ছন্ন ক'রে একটা তীব্র ক্ষয়কারী বাসনা।

কিন্তু বছরের পর বছর সে কাটাতে লাগলো সেই ভাড়াটে বাড়িতেই। বাড়ি-হিশেবে সেটাতে কোনো আপত্তি ছিলো না, তাছাড়া সাজ-সরঞ্জাম একটু-একটু ক'রে বেড়েই যাচ্ছিলো। সে-বছরই গিরিজার স্ত্রী-ভাগ্য আর-একবার জাজ্জল্যমান হ'লো; আপিশের এক প্রৌঢ় কেরানি হঠাৎ মারা গেলেন, গিরিজাকে নেয়া হ'লো সে-জায়গায়।

পুরোপুরি দেড়-শো টাকা মাইনে। এত বড়ো একটা লাফ দিয়ে গিরিজা হাঁপাতে লাগলো। যা ঘটেছে প্রথমটায় ঠিক বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারলো না।

কিন্তু রাধারানি লাফিয়ে পড়লো সেই স্ফীত আয়ের উপর। জানলায়-জানলায় হলদে-আর-কালো পরদা, কুশান-আঁটা বেতের চেয়ার, ধবধবে শাদা বিলিতি চায়ের পেয়ালা, রান্নাঘরে কাঠের শেলফে সারি-সারি কাচের গেলাশ। ওঃ, কেন একজনের খরচ করবার মতো যথেষ্ট থাকে না, অজস্র থাকে না। কিন্তু তাহ'লে কি এমন নেশা হ'তো খরচ ক'রে ?

তারা এখন বেশ সচ্ছল ; সবাই বলছে যে রাধারানি খুব পয়া। গিরিজার মা-বাবা এসে থাকেন মাঝে-মাঝে ; অন্যান্য আত্মীয়রাও দু'চারদিন কাটিয়ে যায়। একটু ঈর্ষার দৃষ্টিতে তারা তাকায় তাদের দিকে, সেটা রাধারানির ভালো লাগে। ঝি-চাকর আছে, তবু এখনো অনেক কাজ তার করা চাই নিজের হাতে ; বাড়িটা তার হাতে, তার প্রাণের উত্তাপে যেন দিনে-দিনে ফুটে উঠছে। তার আশ্চর্য শক্তির স্রোত চাপা প'ড়ে থাকবে না ; পড়বে ছড়িয়ে, যাবে ছাড়িয়ে। সব সময়, এটা কি ওটা নিয়ে সে আছে ; কখনো কেউ তাকে দিনে ঘুমোতে ছাখেনি, কখনো তার হাতে কেউ ছাখেনি একখানা বই কি মাসিকপত্র। কাটলো দু' বছর। তারপরে রাধারানির আবার সন্তান-সম্ভাবনা হ'লো। তার মুখ গেলো শুকিয়ে। মনে-মনে বললে, 'আবার কেন ?' আবার কেন, যথেষ্ট হয়েছে। তার মনে পড়লো, কী কষ্ট সে পেয়েছিলো মীরা যখন মারা গেলো। যথেষ্ট, আর সে সন্তান চায় না। শুধু কষ্ট, শুধু যন্ত্রণা—নির্বোধ, নিষ্ফল যন্ত্রণা।

কিন্তু শিশু গ'ড়ে উঠতে লাগলো তার গর্ভে—নিষ্ঠুর নিশ্চয়তায়, তীব্র জন্ম-প্রত্যাশায়। আর তার শরীর যেন একবারে ভেঙে পড়লো ; সে সহ্য করতে পারে না, ও-কথা ভাবতে সহ্য করতে পারে না সে। তার স্বাস্থ্য এমনিতে চমৎকার, কখনো অসুখ করে না, কিন্তু সে যেন মাতৃত্বের অদ্ভুতরকম অনুপযোগী, তা তাকে মানায় না। দিন-দিন সে ম্লান হ'য়ে যাচ্ছে—সে, এক মুহূর্ত যার বসবার সময় নেই, এখন দিনের বেশির ভাগ শুয়েই কাটায়। গিরিজা শঙ্কিত হ'লো ; এলো ডাক্তার। যথারীতি উপদেশ, পদে-পদে নিয়ম মেনে চলা। প্রসব একটু কঠিন হ'তে পারে, ডাক্তার বললে। রাধারানির হৃৎপিণ্ড থমকে দাঁড়ালো।

শেষটায়, সময় যখন এলো, গিরিজা তাকে এক ম্যাটার্নিটি হোমে নিয়ে যাওয়াই ভালো মনে করলো। খরচের একশেষ, কিন্তু রাধারানির প্রাণ বাঁচাতেই হবে। জায়গাটা বেশ উঁচুদরের, রাধারানির যত্নের, সেবার কোনোরকম ত্রুটি হ'লো না। কিন্তু

ধবধবে শাদা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে, ধবধবে শাদা পোশাক পরা নিঃশব্দ-চারিণী নর্সদের মাঝখানে—সেই নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন শুভ্রতার পরিমণ্ডলে তার মনে হ'তে লাগলো, সে যেন এরই মধ্যে ম'রে গেছে মৃত্যুর এই শুভ্রতা, এই স্তব্ধতা মৃত্যুর। যেন একটা মোহের মধ্যে সে সময় কাটাতে লাগলো,—কিছু না-ভেবে, নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতা তাকে ঘিরে।

শিশু এলো, তার মা-কে যেন দীর্ণ ক'রে দিয়ে। অসম্ভব, অসম্ভব। সে মরবে, রাধারানির কোনো সন্দেহ রইলো না। তাকে মরতেই হবে—যদি শুধু এই যন্ত্রণা থেকে, এই দ্বি-খণ্ডিত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে। আ, এত ভালো, মৃত্যুর কথা ভাবতে এত ভালো লাগে!

কিন্তু সে মরলো না; আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্র আর বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরিচর্যার ফলে সে বেঁচে উঠলো। আর শিশুটিও মরবার কোনো লক্ষণই দেখালো না; জীবন-ক্ষুধাতুর মুখ দিয়ে সে তার মা-র বুক আঁকড়ে ধরলো, শোষণ ক'রে নিলো অন্ধ তীব্রতায় জীবনের রস। মেয়ে। তার দিকে তাকিয়ে রাধারানি শিউরে উঠলো। ঠিক যেন মীরার ছবি।

একমাস পর সে মুক্তি পেলো; মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলো বাড়িতে। সবসুদ্ধ পাঁচশো টাকা দণ্ড। পাঁচশো টাকা—রাধারানির বুকের রক্ত যেন জল হ'য়ে যায় সে-কথা ভাবতে। এতদিনের এত কষ্টের সঞ্চয়। এ-টাকা দিয়ে একটু জমি কেনা যেতো; দু'এক-বছরের মধ্যে আরম্ভ করতে পারতো তার বাড়ি। চেষ্টা করলে কিছু ধারও পাওয়া যায়। এমন-কিছু কঠিন কাজ নয়, বাড়ি করা—সত্যি যদি প্রাণপণ চেষ্টা করা যায়। এখন থেকেই উদ্যোগ করতে হয়, সুবিধেমতো এক টুকরো জমি পেলে কিনে রাখতে দোষ কী? তার বাক্স ভরা আছে গয়না, সে কখনো সে-সব পরে না, কী হবে তা দিয়ে? ওঃ, সে তার শেষ সোনার টুকরো বেচে দেবে—এক্ষুনি, এক্ষুনি, সমস্ত জীবন সে কাটিয়ে দেবে লোহা প'রে, যদি সে তার নিজের বাড়িতে থাকতে পারে, তার নিজের বাড়িতে।

কিন্তু—ওঃ, এই তো এতগুলো টাকা বেরিয়ে গেলো, তারই জন্য। বিষের মতো এই চিন্তা। নিজেকে সে ঘৃণা করতে লাগলো, তার জীবনকে; ঘৃণা করতে লাগলো সদ্যোজাত শিশুকে। ও কেন এলো? কী দরকার ছিলো ওর আসবার? সে তো ওকে চায়নি; ও কেন এলো তাকে সেই দুঃখ মনে করিয়ে দিতে? এক-এক সময় এমন হয় যে সে তার মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

আবার অন্য-কোনো সময়ে সে হয়তো বাক্স থেকে রাশি-রাশি ছোটো-ছোটো রঙিন জামা বা'র করে, মীরার জন্য যেগুলো সে তৈরি করেছিলো নিজের হাতে।

একটা-একটা ক'রে পরায় খুকিকে, পরিয়ে একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। খুকি হাত-পা ছোঁড়ে, অস্ফুট শব্দ করে। তারপর হঠাৎ রাধারানি ওকে টেনে নেয় বুকে, প্রাণপণে ওকে আঁকড়ে ধরে বুকের মধ্যে, এত জোরে যে খুকি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

'আর যেন আমাদের ছেলেপুলে না হয়,' এক রাত্রে সে তার স্বামীকে বললে।

'কেন?'

'কোনো মানে হয় না।'

'মানে হয় না?' গিরিজা কথাটা ঠিক বুঝতে পারলো না।

'শোনো, একটা কথা বলি।'

'কী?'

'একটা বাড়ি করলে কেমন হয়?'

'বাড়ি?'

'এত অবাক হচ্ছো কেন? লেকের দিকে তো খুব শস্তায় জমি দিচ্ছে।'

গিরিজা বললে, 'হুঁ।'

'এই কলকাতাতেই তো চিরকাল থাকতে হবে—কতকাল আর বাড়ি-ভাড়া গুনবে। সবই কি আর একদিনে হবে—আস্তে-আস্তে একটা বাড়ি হয় বইকি—ইচ্ছে করলেই হয়। নবীন যতীন কলেজে পড়ছে, ওদেরও তো রোজগার হবে। আর, অন্যদিকের খরচ কমিয়ে দিলেই হয়।'

গিরিজা সব কথা শুনলো, তারপর বললো, 'তা হয়।'

'হয় না? নিশ্চয়ই হয়। হ'তেই হবে। আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, ভাড়াটে বাড়িতে আমি আর বেশিদিন থাকবো না।'

গিরিজা বললে, 'যাক কিছুদিন।'

সে-বছর পুজোর পর গিরিজার মাইনে দু'শো হ'লো। রাধারানি আর অপেক্ষা করলো না; বালিগঞ্জে অল্প একটু জমি কেনা হ'লো ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রস্ট থেকে। অর্ধেক টাকা একসঙ্গে দিতে গিরিজার ব্যাঙ্কের খাতা তলায় এসে ঠেকলো। বাকিটা দিতে হবে কিস্তিতে। রাধারানির বুকের ভিতরটা জ্বলজ্বল করতে লাগলো; তার চোখে এক নতুন দীপ্তি।

ফাল্গুনমাসে অত্যন্ত সাধারণ জ্বরে রাধারানির খুকি মারা গেলো। তার উপর যেন একটা শাপ আছে, তার কোনো সন্তান বাঁচবে না। খুকির মরবার কোনো কারণ ছিলো না; সে যে মরবে, রাধারানির তা একবারও মনে হয়নি। এখন—এখন জানা

গেলো। যা-ই হোক, সেটা কম নয়। খুকির মৃত্যুতে সে মনে-মনে একটা অদ্ভুত স্বস্তি অনুভব করলো ; তার মনের মধ্যে যেন মুক্ত হ'লো সে। এ-মুক্তি চরম। যা-কিছু হবার শেষ হ'লো ; আর না।

এর পর রাধারানি যেন হঠাৎ একেবারে অন্য রকম হ'য়ে গেলো। তার বয়েস এখন বাইশ—পরিপূর্ণ, পরিপক্ক নারীত্বের সময়। কিন্তু এরই মধ্যে তার নাকের দু'পাশে গভীর হ'যে রেখা দেখা দিয়েছে ; তার শরীরও যেন হ'য়ে উঠেছে অনেকটা শুকনো, নীরস। চট ক'রে দেখে মনে হয় না, এ যুবতীর শরীর। আর তার মেজাজ—তাও এমন খারাপ হ'য়ে পড়লো যে আগে তাকে যারা দেখেছিলো, তারা গেলো অবাক হ'য়ে। সবাই বলাবলি করলে, 'আহা—এতগুলো শোক, আর তাও সন্তানের শোক—এ সামলানো কি সোজা।' রাধারানি তার স্বামীকে ধমকাচ্ছে, দেওরদের ধমকাচ্ছে, ঝি-চাকরদের ধমকাচ্ছে—কিছুতেই সে খুশি নয়, সবটাতেই তার আপত্তি। তার চোখে এক অদ্ভুত, প্রায় হিংস্র আভা। ঐ চোখ যেন তার সমস্ত শরীর থেকে শুষে নিয়েছে তার জীবনশক্তি। তার মুখে এখন শুধু এক কথা, 'বাঁচাও, বাড়ির জন্য পয়সা বাঁচাও।' বাড়ি—বাড়ি তুলতে হবে, যত শিগগির হয়। প্রতিটি ছোটো-ছোটো পয়সা জমা হ'তে থাকবে সেই উদ্দেশ্যে। সংসারের খরচ সে কমিয়ে দিলে রূঢ়ভাবে। আট আনার বেশি বাজার হ'তে পারবে না কোনোদিন। নবীন কি যতীন জামা-কাপড়ের কথা বললে সে মারমুখো হ'যে ওঠে, গিরিজার বৈকালিক জল-যোগের প্রস্থ ক'মে গেলো ; পারতপক্ষে সে ঘরের আলো জ্বালতো না, ইলেকট্রিক বিল হালকা করা চাই, পুরোনো ছেঁড়া কাপড় শেলাই ক'রে-ক'রে সে চালিয়ে দিতো যতদিন সম্ভব। তাদের প্রত্যেককে যে খেতে হয়, সেটাও যেন তার সহ্য হয় না ; যদি পারতো খাওয়া ব্যাপারটা বাতিল ক'রে দিয়ে পয়সাটা তুলে রাখতো ইঁট কেনবার জন্য। খরচ কমাও, খরচ কমাও— এ ছাড়া তার আর কথা নেই, এ ছাড়া আর ভাবনা নেই। তার মুখের উপর কথা বলতে সাহস পেতো না কেউ ; সবই হ'তো তার যেমন ইচ্ছা। তার কঠিন, কঠিন ইচ্ছার কাছে সবাই আনত। সে কর্তৃত্ব করবে, রাজত্ব করবে। সে সবার উপরে, সে চরম। আর, এই উন্মাদনা আর তিক্ততা সত্ত্বেও, এই তিক্ততা আর উন্মাদনার ভিতর দিয়েই সে পেলো তার পরিপূর্ণতা, তার ইচ্ছার নিঃসংশয় পরিপূর্ণতা। এ তার মনের মধ্যে একটা ব্যাধির মতো, তীব্র মোহের মতো, তার বাড়ির এই চিন্তা। এ তাকে পেয়ে বসেছে ; সে নিজেকে আহুতি দিচ্ছে এর কাছে, এই অসহ্য আকাঙ্ক্ষার তীক্ষ্ণ আগুনে। তা জ্ব'লে-জ্ব'লে উঠছে তার চোখে, তার চোখের স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে, দৃষ্টির হিংস্র আভায়।

গেলো আরো তিন বছর। নবীন আর যতীন বেরুলো কলেজ থেকে। একজন জুটিয়ে নিলে একটা স্কুলমাষ্টারি; যতীন বি. এস্-সি. পাশ ক'রে ঢুকে গেলো এক ওষুধের কারখানায়। তাদের আয় বেশি নয়, খরচ আরো কম। রাধারানির সংসারের আরো উন্নতি হ'লো।

জমির দেনা শোধ হ'য়ে গেছে অনেক আগেই; হাতে কিছু জমেওছে। যতীন বললে, 'বৌদি, এইবার আরম্ভ করো তোমার বাড়ি।'

রাধারানি বললে, 'আগে তোমাদের বিয়ে দিয়ে নিই।'

'তোমার বাড়ি তৈরি হবার আগে ও-সব হবে না।'

'তোমাদের এখন নিজেদের সংসার পাতবার সময় হয়েছে।'

যতীন বললে, 'এতদিন যে-বাড়িতে থাকবার অধিকার দিয়েছো, আজ কি সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবে?'

'নিজেদের সুখের ভাগ ছাড়বে কেন তোমরা?'

নবীন বললে, 'তোমাকে সুখী করতে চাই, এর বেশি সুখের আশা রাখিনে।'

'তাহ'লে বিয়ে করো।'

কোনো ওজর-আপত্তি টিঁকলো না; রাধারানি ওদের দু'জনের বিয়ে দিলে। নিজেই মেয়ে ঠিক করলো দেখে। তার সংসার এখন বিরাট।

প্রত্যেককে পেতে হবে তার সুখের ভাগ। তার জন্য কাউকে নিজের স্বার্থ এতটুকু ছাড়তে দেবে না রাধারানি, সবাই স্থির হ'য়ে বসুক—তারপর তার বাড়ি, সবার শেষে, সবার উপরে। এ-কথা সে কাউকে মনে করতে দেবে না যে অন্যকে ঠকিয়ে তার বাড়ি উঠেছে।

ঠিক হ'লো, সামনের বছর আরম্ভ হবে কাজ।

কিন্তু এরই মধ্যে তার আবার গর্ভ-সঞ্চার হ'লো। যে-মুহূর্তে সে জানলো, তার বুকের রক্ত হিম হ'য়ে গেলো। ভয়ে, আতঙ্কে। আর ক্রোধে—অন্ধ তীব্র ক্রোধে, তার স্বামীর প্রতি। স্বামীকে সে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলো। ওঃ, সে চারদিক মোটামুটি গুছিয়ে এনেছিলো—হঠাৎ সব নষ্ট হ'য়ে গেলো, সব। এর কী দরকার ছিলো? এ যদি কারো নিষ্ঠুর বিদ্রূপ না হয়, এ তবে কী? সে প্রায় পাগল হ'য়ে গেলো, ব্যর্থতায়, ব্যর্থ আক্রোশে। তার বাড়ি কি তৈরি হ'তে-হ'তে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়বে ধুলোয়? নিষ্ফলতার একটা প্রেত তার পিছনে লেগে থাকবে সব সময়?

স্বামীকে সে বললে, 'এ আবার কী?'

গিরিজা কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'কেন, ভালোই তো, দু' একটা ছেলেপুলে না-থাকলে ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগে না! কিন্তু ও কি থাকবে, ও কি থাকবে—'

'অলক্ষুনে কথা বোলো না, রানি।

'তুমি তো জানো আমার উপর শাপ আছে—'

'বাজে কথা ভেবে খামকা কেন মন-খারাপ করছো?'

রাধারানি চুপ করলো, তার পর থেকে একেবারে চুপ ক'রে গেলো। সে যেন ডুবে গেলো তার নিজের মধ্যে। নিঃশব্দে সে কাজকর্ম করে, নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায়, ক্লান্ত হ'লে চুপচাপ ব'সে থাকে। তার ক্ষীণ, ফ্যাকাশে শরীর নিয়ে সে প্রায় প্রেতের মতো আত্ম-বিস্মৃত, বিলুপ্ত। যেখানে সে আছে, সেখানে সে যেন নেই। তার শরীর-যন্ত্রের প্রত্যেকটি স্নায়ু এক আশঙ্কিত অনিবার্যের জন্য টান হ'য়ে আছে।

সময় যখন এলো, রাধারানি কিছুতেই ম্যাটার্নিটি হোম-এ যেতে রাজি হ'লো না। যদি সে মরে তো নি-খরচায় মরবে। কিন্তু তার স্বাস্থ্য গেলোবারের মতো ভেঙে পড়েনি; বিশেষ-কোনো ভয়ের কারণ ছিলো না। ডাক্তারও ডাকতে দেবে না সে; দিশি দাইয়েই কাজ চলবে।

হ'লো এক ছেলে। পরম অবজ্ঞা, উদাসীনতা নিয়ে রাধারানি ওকে জন্ম দিলে। তার মনে কোনো ভাবনা নেই ওর জন্য। শিশুকে সে লালন করলে শুধু তার অর্ধেক সত্তা দিয়ে; দু'য়ের মধ্যে কোনো প্রকৃত সম্বন্ধ নেই। নিজেকে সে অনুভব করলো অদ্ভুতরকম বিচ্ছিন্ন, আলাদা-হ'য়ে-স'রে-যাওয়া।

কয়েক মাস পর গিরিজা বললে, 'বাজার খুব শস্তা যাচ্ছে, এইবার আরম্ভ ক'রে দিই কাজ।'

রাধারানি বললে, 'কিছুদিন যাক।'

'কেন?' গিরিজা অবাক হ'লো।

'যাক না।' রাধারানি নিজের কাছেও বোধহয় বুঝিয়ে বলতে পারতো না, কেন সে এখন বাধা দিচ্ছে। কিন্তু অস্পষ্টভাবে, খোকার সঙ্গে এ জড়িত। যদি খোকা—যদি খোকা ম'রে যায়। দেখা যাক অপেক্ষা ক'রে। নতুন বাড়িতে কোনো মৃত্যু হ'তে দিতে পারবে না সে। যেন এক দীর্ঘ, অসহ্য ডিলিরিয়মের ভিতর দিয়ে সে তার খোকার মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলো।

এক বছর গেলো। এর আগে তার কোনো সন্তান এক বছর বয়সে পৌঁছতে পারেনি। আস্তে-আস্তে, রাধারানি খোকার দিকে ভালো ক'রে তাকাতে লাগলো।

ফুটফুটে ছোটো ছেলে, গোল-গোল হাত পা, গাল ভরা টোল। চঞ্চল উজ্জ্বল তার ছোটো শরীর। আশ্চর্য, এ যে তার শিশু। আর সে এর দিকে কখনো তাকায়নি, ভালো ক'রে একবার চেয়েও ছাখেনি।

আর হঠাৎ, খোকার জন্য বিশাল উত্তপ্ত ভালোবাসায় সে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো, অন্ধ হ'য়ে গেলো। বিশাল বন্যার মতো তা ব'য়ে গেলো তার উপর দিয়ে—তাকে অভিভূত ক'রে, রুদ্ধশ্বাস ক'রে, মুহ্যমান। এত ভালোবাসা, তার বুক টনটন ক'রে ফেটে পড়ছে, সে আর পারে না; তার এতদিনকার নিপীড়িত, ব্যর্থ মাতৃত্ব হঠাৎ জেগে উঠলো, মোচড় দিয়ে উঠলো তার বুকের মধ্যে। তা কষ্টের মতো, এত তীব্র। একজনকে, অন্তত, বিধাতা রেখেছেন তার আনন্দের জন্য, তাকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলবার জন্য। ওঃ, তারই জন্য খোকা বাঁচবে, বেঁচে উঠবে। আর সে তার খোকার জন্য নিজেকে গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে মিশিয়ে দেবে ধুলোয়, যদি তাতে খোকার ভালো হয়।

রাধারানি যেন রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো কোনো জাদুতে; তার যৌবন জ্ব'লে উঠলো আগুনের শিখার মতো, তার শরীর দীপ্তিময়। এত আনন্দ সে জীবনে কখনো পায়নি: চারদিক কথা ক'য়ে উঠছে সমস্বরে, প্রতিধ্বনি তুলছে তার মনে। ঢেউয়ের ছলছলানি দিয়ে ঘেরা সে যেন এক দ্বীপ; প্রতি ছোটো হাওয়ায় ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে তার বুকের উপর দিয়ে। আর এই আনন্দের উৎস তার খোকা; খোকা তার জীবনের, তার বিশ্বের কেন্দ্র।

কিছুকাল পরে আরম্ভ হ'লো বাড়ি। রাধারানির সব ব'লে দেয়া চাই—কোথায় কী হবে, ক'টা জানলা আর দরজা, বাথরুমটা কোনখানে, কী রং হবে মেঝেতে। সব হ'য়ে ওঠে না, কুলোয় না টাকায়। এমনিতেই, গিরিজা আর তার ভাইয়েরা সর্বস্ব ঢেলে দিচ্ছিলো বাড়ির পিছনে, রাধারানিকে খুশি করবার জন্য। কেননা, তাদের মনে-মনে ধারণা ছিলো যে রাধারানিই তাদের বাড়ির লক্ষ্মী।

রাধারানি মাঝে-মাঝে গিয়ে দেখে আসে, কতদূর হ'লো। বাড়ি ফিরে এসে খোকাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, 'খোকা, নতুন বাড়িতে যাবি, নতুন বাড়িতে?'

খোকা বলে, 'ম্মা—'

'আমরা সেখানে থাকবো, তুই আর আমি, টুকটুকে লাল সিঁড়ি, টুকটুকে লাল—'

মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে খোকা খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে।

চার মাস পরে বাড়ি শেষ হ'লো। গৃহ-প্রবেশে অনেককে তারা নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালো। মোটের উপর বেশ বাড়ি—যদিও রাধারানি যতটা আশা করেছিলো, ততটা হয়তো নয়। তা হোক, তবু এই ঝকঝকে নতুন বাড়ি, জানলায়

রঙের গন্ধ, চোখ-ধাঁধানো শাদা দেয়াল—সব মিলিয়ে স্বপ্নের মতো ঠেকলো রাধারানির মনে। মেঝেতে রং দেয়া সম্ভব হয়নি—না-ই বা হ'লো, সিঁড়িটা তো লাল—অনেক, আগে সে ঠিক ক'রে রেখেছিলো, সিঁড়িটা লাল হবে। অনেক জায়গায় অনেক দেনা প'ড়ে আছে, ধারও হয়েছে বিস্তর—এ একরকম গায়ের জোরে তোলা বাড়ি। তা হোক, ধার শোধ হ'য়ে যাবেই, কিন্তু বাড়িটা থাকবে, রাধারানির, তার নিজের। কলকাতায় তাদের প্রথম বাড়ির কথা তার মনে পড়লো, আর হাঁটু-ভাঙা দ-এর মতো সেই চেয়ার। চেয়ারটা এখনো আছে। এখন আর কোনো কাজেই লাগে না: তবু সে সেটা ফেলে দিতে ভ্যায়নি, নতুন বাড়িতেও সেটা নিয়ে এসেছে অন্যান্য জিনিশের সঙ্গে। ওটা তার ভাগ্যের প্রতীক।

সবাই বলাবলি করলে, 'বৌটার কপাল আছে বটে। গিরিজা যে এতখানি করবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।'

নতুন বাড়িতে প্রথম রাত্রি রাধারানির এক ফোঁটা ঘুম হ'লো না। জেগে থেকে-থেকে সে যেন সমস্ত বাড়িটাকে অনুভব করছিলো তার শরীর দিয়ে, তার আত্মা দিয়ে। নিজের প্রাণের অংশ দিয়ে এই বাড়িতে সে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবে। বাড়িটা বাঁচবে—তার মধ্যে, তার সঙ্গে বাঁচবে। তার আকাঙ্ক্ষায়, তার দুরাশায় এর হাওয়া বিদ্যুৎ-চকিত। এমনি অন্ধকার স্তব্ধ রাত্রে এর কিছু বলবার থাকবে তাকে—অস্পষ্ট মর্মরে, বাণীহীন ইঙ্গিতে; সে তার পূর্ণতা, তার অখণ্ডতা নিংড়ে আনবে এর কাছ থেকে। বাতাস স্তব্ধ হ'য়ে আছে সম্ভাবনায়।

পরের দিনও তার সেই মোহ কাটলো না; যেন স্বপ্নের মধ্যে চলাফেরা করছে সে। দু'একজনকে খেতে বলা হয়েছিলো; সে নিজেই গেলো রান্না করতে। খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলো, এক ছোকরা চাকরকে কাছে বসিয়ে। রবিবার, আপিশের তাড়া নেই; বিশাল সওদা এসেছে বাজার থেকে। রান্না আর ফুরোয় না। এক ফাঁকে সে উঠে গিয়ে খোকাকে দেখে এলো: খোকার ঘুম ভেঙেছে, হীরালাল তাকে মেঝেতে নামিয়ে খেলা করছে ব'সে। খোকাকে স্নান করাবার সময় হলো; কিন্তু এখন থাক, সে ভাবলো, রান্নাটা সেরেই আসি। বললে, 'খোকা, চান করবিনে?'

খোকা তার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ব'লে উঠলো 'ন্‌না।' তারপর লাল বলটা হাতে নিয়ে তার মা-কে দেখিয়ে বললে, 'ব।'

'হ্যাঁ, বল।' খোকা কি দেরি ক'রে কথা কইতে শিখছে, না কি এমনিই হয়? ওর সঙ্গে সব সময় কারো-না-কারো কথা কওয়া দরকার, তাহ'লেই ও তাড়াতাড়ি শিখবে। 'হীরা, ওর সঙ্গে ব'সে গল্প কর, আমি এক্ষুনি আসছি।'

রাধারানির রান্না শেষ হ'য়ে এসেছিলো। খোকা কি সত্যি দেরি ক'রে কথা কইতে শিখছে, সে ভাবছিলো। তার মনে হচ্ছিলো, আর যত দেড় বছরের ছেলে সে দেখেছে, এর চেয়ে অনেক বেশি কথা কইতে পারে তারা। কিন্তু হয়তো ওটা তার কল্পনা, হয়তো এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া একটু দেরি ক'রেই যদি কথা কইতে শেখে, তাতেই বা কী এসে যায়? শেষ পর্যন্ত যা হবে, সেটাই তো আসল। শেষ পর্যন্ত—কী হবে সে? সে কথা ভাবতেই তো বুক কাঁপে—আশঙ্কায়, আনন্দে। তার এই খোকা—সে একদিন আশা করবে, ব্যর্থ হবে, আবার রাস্তার ভিড় ঠেলে এগিয়ে চ'লে যাবে, সে একদিন দুঃখ পাবে, স্বপ্ন দেখবে, গ'ড়ে তুলবে নিজের অদৃষ্ট। ওর মা তখন কোথায়, তখন তো আর মা-র আঁচল ধ'রে ব'সে থাকবে না ও, জানবেও না যে ওর রক্তের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে ওর মায়েরই প্রাণ। তবু মাঝে-মাঝে মনে করিয়ে দেবার জন্য রইলো এই বাড়ি, ওর মায়ের প্রাণে পরিপূর্ণ।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট চীৎকার শোনা গেলো; তারপর মোটা পুরুষের গলা ব'লে উঠলো, 'কী হলো?' কী আবার হ'লো? বাড়িতে বড়ো বেশি লোক; সব সময় কিছু-না-কিছু ঘটছেই। রাধারানি হাত ধুয়ে আঁচলে মুছে বাইরে এলো। সিঁড়ির গোড়ায় সবাই জড়ো হয়েছে—তার স্বামী, দেওররা, জায়েরা। ব্যাপার কী? হঠাৎ সে স্বামীর তীব্র স্বর শুনতে পেলো, 'স'রে দাঁড়াও, স'রে দাঁড়াও—জল আনো, পাখা।' তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে গেলো। খানিকটা এসেই তার সমস্ত শরীর পাথর হ'য়ে গেলো, আর এক পা সে এগোতে পারলো না। গিরিজা কোলে নিয়ে ব'সে আছে—খানিক আগে যা ছিলো তার খোকা, এখন একটা মাংসের তাল—অদ্ভুত, তা-ই তার মনে হ'লো, মুখটা কী-রকম থেঁৎলে গেছে, কপালে, মাথায় রক্ত দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে এরই মধ্যে। লাল সিঁড়িটা কোনো ভীষণ পিশাচের আরক্ত মুখ-ব্যাদনের মতো; লাল বলটা গড়িয়ে পড়েছে গিয়ে বারান্দার অন্য কোণে। রাধারানি একবার দেখলো, একেবারে সব দেখে নিয়ে চোখ বুজলো।

বেলা চারটের সময় হাসপাতাল থেকে খবর এলো। একবারের জন্যও খোকার জ্ঞান করানো যায়নি; এইমাত্র সে মারা গেছে।

শুনে রাধারানি বললে, 'জানতুম।'

১৯৩৩ 'অসামান্য মেয়ে'

অর্কেস্ট্রা

মিসেস সেন বললেন, 'এই যে, এসো।' আধ ঘণ্টার মধ্যে এই ছ'বার বললেন।

অতিথিরা এরই মধ্যে আসতে আরম্ভ করেছে। গাছের মাথায়-মাথায় বিকেল এখনো সোনালি; আকাশে ছোটো-ছোটো গোলাপি মেঘ ভেসে চলেছে আগুন রঙা দিনান্তের দিকে। কী সুন্দর আলিপুর এই পড়ন্ত আশ্বিনের বেলায়।

কিন্তু মিসেন সেনের ড্রয়িংরুমে এখনই আলো জ্ব'লে উঠেছে। ভূতুড়ে আলো, কোথা থেকে আসছে টের পাওয়া যাচ্ছে না যেন, সমান হ'য়ে পড়েছে হলদে দেয়ালে আর মার্বেলের মেঝেতে। দুটো থামের ভিতর দিয়ে বারান্দায় যেতে হয়, তারই ফাঁকে বসেছেন মিসেস সেন। পরনে তাঁর একটি কালো-আর-রুপোলি-শাড়ি, দেখেই সম্ভ্রম হয়। যতবারই একজন অতিথি আসে, তিনি উঠে দাঁড়ান অভ্যর্থনা করতে।

এবার এলো ডোডো। দীর্ঘ সে, ঋজু সে, উঁচু খুর-তোলা জুতোয় হেলতে-দুলতে এমনভাবে ঢুকলো যেন সত্যিই সে সেই মহামূল্য লুপ্ত পাখি। তার স্বামী বুঝি ছোটোনাগপুরে জংলি চাকুরে। তার আসল নাম কেউ যেন জানেই না, সবাই ডাকে ডোডো ব'লে।

ভারি রেশম ভাঁজে-ভাঁজে ঝলমলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস সেন—'এই যে, এসো।'

'এতদিনে!' ডোডোপাখির মতোই প্রকাণ্ড শরীর থেকে ক্ষীণ, কম্পিত কণ্ঠ! 'এতদিনে আমাদের সৌম্যেন তাহ'লে বিয়ে করছে।'

'জানুয়ারির আগে নয়।'

'নববর্ষে নব হর্ষ!' ডোডো পদ্যে উছলিয়ে উঠলো 'আর মলির মনের ভাবখানা কী?'

'স্বর্গে আছে সে।'

'Ah love! Could thou and I with Fate conspire!' ডোডো সচেতনভাবে আবৃত্তি করলো, সম্ভাব্য শ্রোতার আশায় চারদিকে তাকিয়ে। কিন্তু হায়, অন্য সবাই ঘরের অন্যদিকে; তার আবৃত্তি দূরের কথা, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কারো খেয়াল নেই। ডোডো হতাশ হ'লো, কিন্তু সেটা বুঝতে না-দিয়ে বললে, 'কোথায় সেই যুগল—"world-losers and world-forsakers?" সে সামলাতে পারলো না, এই পদ্যাংশ সোডার মতো ভশভশিয়ে উঠলো তার ভিতর থেকে, যদিও অশিক্ষিত মিসেস সেন ছাড়া আর-কেউ শোনবার নেই। চেক সই করা আর দশটা লিমিটেড কোম্পানির

চিঠিপত্র পড়া—লেখাপড়ার সঙ্গে এই তো তাঁর সম্পর্ক। কী ভয়ানক, ডোডো ভাবলে। মিসেস সেনের তুলনায় নিজেকে তার এত উঁচু মনে হ'লো যে ঐ স্ত্রীলোকের অগাধ অনুপার্জিত অর্থ সম্বন্ধে ঈর্ষার ভাবটা চাপা পড়লো সহজেই। জীবনে কখনো একটা কবিতা পড়েনি—কী ভয়ানক!

'"Losers" বিশেষ নয়', মিসেস সেন বললেন। 'সৌম্যেন ব্যাঙ্কে বেশ ভালো কাজ করছে, শিগগিরই তার হাজার টাকা মাইনে হবে। আর মলির নিজেরও—যাক, ওরা বিয়ে করছে এটা মস্ত সুখের কথা।'

'কোথায় ওরা?'

'ওরা? ওরা সবখানেই আছে। আমাদের সব উৎসবের প্রাণই তো মলি।'

'রণজিৎ আছে কেমন?' ডোডো অন্য কথা পাড়লো।

'চমৎকার আছে।' তাঁর তেইশ বছরের ছেলের উল্লেখেই মিসেস সেন যেন বয়সে সত্যি-সত্যি ছোটো হ'য়ে গেলেন, তাঁর অপূর্ব প্রশান্ত মুখ লঘু হাসির ভাঁজে-ভাঁজে ভেঙে গেলো। 'তবে কিনা ওর মা-কে আর আগের মতো ভালোবাসে না।'

'বাসে না?' এর পরে কী বলবে ডোডো ভেবে পেলো না। যাক, ঐ তো বীণা আর ব্রজ এসে পড়েছে।

মিসেস সেনও নব আগন্তুকদের লক্ষ্য করেছিলেন, ডোডোর সঙ্গে কথাটা শেষ করবার ধরনে বললেন, 'জানো তো, আমাদের এখানে আজ গান হচ্ছে।'

'ও, শীলার ফ্রেঞ্চ গান—'

মিসেস সেন হাসলেন। 'না, এ অন্য জিনিশ। একেবারেই অন্য জিনিশ। রণজিৎ মিরজা সাহেবক ঠিক করেছে, তিনি গাইবেন।' খবরটা ব'লে মিসেস সেন সগর্ব বিজয়ী ভঙ্গিতে তাকালেন।

'মিরজা…?'

বীণা আর ব্রজ ততক্ষণে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। 'এইমাত্র ডোডোকে মিরজা সাহেবের কথা বলছিলাম,' তাদের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে মিসেস সেন বললেন।

ব্রজর মুখের পেশীগুলো হাসবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ হাসিটা শূন্যে মিলিয়ে গেলো। 'ও', এই গভীর মন্তব্য করলো সে।

'বুঝলে বীণা, মিরজা সাহেবের কথা বলছিলাম।' মিসেস সেন বীণাকেই যেন নিজের অন্তরঙ্গ ক'রে নিলেন।

বীণার আঙুলগুলো দ্রুতবেগে তার হাত-ব্যাগের গায়ে কয়েকবার ওঠা-নামা

করলো। কিন্তু স্বামীর চাইতে বেশি উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে সে বললে, 'অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য!'

'ভাবতে পারো না কী অদ্ভুত! কী আশ্চর্য অদ্ভুত!' মিসেস সেন তিনজনেরই মুখের দিকে তাকালেন, ফাঁকা, শূন্য মুখ, যেন তিনি বিশ্বের জ্যামিতির কথা বলছেন। তাঁর জয়ের পাত্র কানায়-কানায় ভ'রে উঠলো।

'রণজিৎ ঠিক করেছে সব,' খুব সাধারণভাবে বলতে লাগলেন তিনি। 'সত্যিকার উঁচুদরের ওস্তাদ দেশে এখন দু'চারজনই আছেন, মিরজা সাহেব তাঁদেরই একজন। প্রতিভা, অসাধারণ প্রতিভা! একেবারে বিশুদ্ধ সংগীত!' তাঁর অতি সুন্দর গ্রীক ছাঁদের মাথা দম-দেয়া পুতুলের মতো দুলতে লাগলো।

'আপনি শুনেছেন তাঁর গান? বীণা জিগেস করলো।

কিন্তু নিজের আবেগের ঝোঁকে মিসেস সেন যেন তার প্রশ্ন শুনতেই পেলেন না। '—জানো তো আমাদের রাগ-রাগিণী হচ্ছে দেবতার সৃষ্টি। একটা টোড়ি কি মূলতান শুনতে-শুনতে ঠিক মনে হয় যেন পৃথিবী ছাড়িয়ে স্বর্গে চ'লে যাচ্ছি।' মিসেস সেন এমনভাবে বললেন কথাগুলো যেন সমস্ত জীবন তিনি ভারতীয় সংগীতের চর্চাতেই কাটিয়েছেন।

'সশরীরে স্বর্গলাভ।' মনে-মনে বললে ব্রজ। অতি কষ্টে হাসি চাপলো সে।

'স্নব!' ডোডো ভাবলো। 'অসহ্য স্নব। জীবনে এক লাইন কবিতা পড়লো না। কবিতা ওঁর জুজু, রাগিণী ওঁর বাঘিনী!'

'কখন আসবেন তিনি?' জিগেস করলো বীণা।

'এক্ষুনি, এক্ষুনি। জানো, ওস্তাদ-জির চার্জ পঞ্চাশ টাকা মাত্র। শকিং! এত বড়ো প্রতিভা! নিজের তবলচিও আনবেন। দর-দস্তুর করলে নাকি পঁচিশ টাকাতেও— কী লজ্জার কথা ভাবো তো। আমাদের দেশে আর্টের কোনো আদর নেই।'

'আচ্ছা', এতক্ষণে ডোডো একটা কথা বললে, 'স্বর্গে যাবার আশায় রইলুম। ততক্ষণ···ঐ তো সুধীন।'

দ্রুত পায়ে মার্বেলের মেঝের উপর দিয়ে সে চ'লে গেলো, পিছনে ব্রজ আর বীণা। মীরা আর মায়াও এসেছে। ঐ কোণে···ভানু। চারদিকের কথাবার্তার স্রোতে থেকে-থেকে উঠছে হাসির ঢেউ। গোষ্ঠী-সুখ।

২

আটটার মধ্যে মিসেস সেনের বিশাল ড্রয়িংরুম ভ'রে গেলো। প্রায় একশো অভ্যাগত। এক হাজার, এক কোণে একলা ব'সে-ব'সে মৃন্ময়ের মনে হ'লো, দশ হাজার। হাজারে-হাজারে কাতারে-কাতারে এসেছে এরা। মানুষের সমুদ্র। শাড়ির ঝলকানি, কথার ছলকানি, সিগারেটের সরু নীল ধোঁয়া পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ভেসে চলেছে সোনালি সীলিঙের দিকে—মৃন্ময় মনে-মনে হেসে ভাবলো, রসেটির ব্লেসেড ড্যামোজেলের সেই স্বর্গগামী আত্মাগুলির মতো! এই অদ্ভুত উপমাটা নিয়ে মনে-মনে সে একটু খেলা করছে এমন সময় ডোডোর ঝকঝকে মূর্তি দেখা দিলো তার সামনে।

মৃন্ময়ের ঠোঁটে হাসির আভাস লক্ষ্য ক'রে, 'ঠাট্টাটা কি জানতে পারি?' ডোডো জিগেস করলে।

'ঠাট্টাটা গোপন।'

'যত গোপন ততই মিষ্টি।' কাকাতুয়ার মতো চীৎকার ক'রে হেসে উঠলো ডোডো।

'তাছাড়া, অর্থহীন।'

'অর্থহীন ঠাট্টাই আমি সবচেয়ে ভালোবাসি।'

'বেশ—' ব'লে মৃন্ময় থামলো। কারো সম্বন্ধে একটা গল্প বানাতে হবে, নয়তো ডোডো নড়বে না। কিন্তু ঈশ্বর তাকে বাঁচালেন —ঐ তো সুধীন আসছে। দেখা গেলো সুধীনের ঈষৎ বাঁকা দীর্ঘ-শরীর, চোখা নাকের দু'দিকে সাপের মতো চোখ। কত লোকের সম্বন্ধে কত মজার গল্প যে সে জানে তার অন্ত নেই।

'এতক্ষণে!' নাটকীয় ধরনে ব'লে উঠলো সুধীন। 'ডোডো, তোমার পিছন-পিছন ধাওয়া করা আর আস্ত একটা ক্রস-কনট্রি রেস দৌড়নো একই কথা। এই যে, মৃন্ময়।'

ব'লে সুধীন মাথা নেড়ে হাসলো। এটা তার দয়া বলতে হবে, কেননা মৃন্ময় 'তাদের একজন' নয়, এখনো পুরোপুরি নয়। সে-ই না শশাঙ্ক বোসের এক মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিলো—হ্যাঁ, পালিয়েছিলোই বলতে হবে, নয়তে মীরার সঙ্গে তার বিয়ে হবে, এ কি ভাবা যায়! বেচারা, করুণায় বিগলিত হ'য়ে সুধীন ভাবলে, বিয়ে ক'রে বৌয়ের আঁচল ধ'রে হাঁটু ভেঙে সোসাইটিতে ঢোকা!

'কেমন আছে তোমার অতুলনীয়া স্ত্রী?' সাপের মতো ঝকঝকে চোখে মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে সুধীন বললে।

'অতুলনীয়াই আছে।'

'ওকে না এইমাত্র দেখলুম বীণার সঙ্গে', ডোডো ব'লে উঠলো। 'নোট মেলাচ্ছে আরকি দুজনে। যা মনে হয় বিয়ে তা নয়—কেমন না?' মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে ডোডো চটুলভাবে হাসলো। 'একদিন আমাকে সব বলতে হবে কিন্তু।'

'কী বলতে হবে?'

সুধীন তার লম্বা ঘাড় বাড়িয়ে কোনো-একটা আশ্চর্য রসিকতা করতে যাচ্ছিলো নিশ্চয়ই, এমন সময় বীণা সেখানে এসে উপস্থিত।

'বলো বীণা একটু ক্ষীণা হবে কিনা—' সুধীন আরম্ভ করলো।

কিন্তু রসিকতার সময় নেই বীণার। মিরজা সাহেব এসেছেন, এই এলেন ব'লে উপরে।

সুধীন কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'মিসেস সেনের হাবাগোবা লক্ষপতিদের একজন বুঝি?'

ডোডো এত বেশি জোরে হেসে উঠলো যে তার পিছনে যে-তিনজন বুড়ো ভদ্রলোক ব'সে ইনভেস্টমেণ্ট নিয়ে আলাপ করছিলেন তাঁরা চমকে ফিরে তাকালেন।

'ওঃ, মোটে পঞ্চাশ টাকা!' তীক্ষ্ণস্বরে ব'লে উঠলো ডোডো। 'তবলচি সুদ্ধু!'

সুধীন চোখ বড়ো ক'রে বললে: 'তাহ'লে এবার উচ্চ সংগীতের পাল্লায় পড়া গেছে।'

'প্রতিভা! অসাধারণ প্রতিভা! সোজা স্বর্গে চ'লে যাবে।' হাসির চাপে ডোডো কঁকিয়ে উঠলো, তারপর হঠাৎ ফেটে পড়লো হাসির চীৎকারে।

'কী নাম বললে?' মৃন্ময় বীণাকে জিগেস করলে, 'মিরজা সাহেব?'

কিন্তু মৃন্ময়ের ক্ষীণ প্রশ্নটা ডোডোর হাসির ধাক্কায় উড়েই গেলো।

'অসাধারণ প্রতিভা। একেবারে বিশুদ্ধতম উচ্চতম সংগীত। "I pant for the music which is divine"!' ডোডোর মগজে পলগ্রেভ যেন টগবগ ক'রে ফুটছে।

'ঐ তো,' ব'লে উঠলো বীণা। সঙ্গে-সঙ্গে সকলেই ফিরে তাকালো। ছোট্ট একটি মানুষকে নিয়ে আসছে—আর-কেউ নয়, স্বয়ং রণজিৎ। ছোটো মানুষটি, অল্প দাড়ি আছে, পরনে আধ-ময়লা পাজামা আর একটা খয়েরি রঙের কোট। পিছনে আসছে আর-একটি টাক-পড়া লোক, আর যে-উরদি-আঁটা ভৃত্যদ্বয় তানপুরা আর বাঁয়া-তবলা বহন ক'রে আনছে তাদের মুখে গভীর উদার সহনশীলতার ব্যঞ্জনা।

'প্রতিভা!' ডোডো চুপি-চুপি এমনভাবে বললে যেন ওটা অসম্ভব একটা হাসির কথা।

ডোডোর কাঁধে টোকা দিয়ে বললে সুধীন, 'লক্ষ্ণৌয়ে এক ওস্তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো—'

'এক্ষুনি আরম্ভ হবে নাকি?' বীণা একটু যেন ভয়ে-ভয়ে জিগেস করলে। সে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো এই 'বিশুদ্ধ সংগীত' শুনে মুগ্ধ হবেই। কিন্তু মুগ্ধ হবার সময় যতই কাছে আসছে ততই তার দেহে-মনে সেই ভাব হচ্ছে, যে-ভাব হয় অপারেশনের সকালবেলায়।

বলা বাহুল্য তার প্রশ্ন কেউ শোনেনি। সেই অতি উজ্জ্বল ঘরে অতি উজ্জ্বল নর-নারীর ভিড়ের ভিতর দিয়ে আসছেন ওস্তাদ—ডোডো আর সুধীনের চোখ সেই দিকে। ঘরের মাঝখানে সবুজ-আর-সোনালি রঙের খাঁটি কাশ্মিরি গালিচায় দয়াশীল ভৃত্যদ্বয় যন্ত্রগুলো রেখেই অন্তর্হিত হ'লো। মিসেস সেন উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এলেন—এই বিশেষ অনুগ্রহ সেদিনের মতো প্রতিভাবানের জন্যই জমা রাখা হয়েছিলো। ওস্তাদজি মাথা নত ক'রে অভিবাদন করলেন।

'এক্ষুনি আরম্ভ হবে নাকি?' বীণা আবার জিগেস করলে। তার দুশ্চিন্তা অসহ্য হ'য়ে উঠছিলো। সে ফিরে তাকালো মৃন্ময়ের দিকে, কিন্তু মৃন্ময় সেখানে নেই। কিছু না-ব'লে কখন যে চ'লে গেছে কেউ লক্ষ্য করেনি।

৩

এঁকে-বেঁকে, ঘুরে-ফিরে, বেহাগের রূপ ফুটে উঠছে। যেন কোনো আশ্চর্য মধ্যরাত্রির ফুল। পাপড়ির পর পাপড়ি, কুঁড়ির পর কুঁড়ি, রঙের পর রং! উঠছে, পড়ছে, কাঁপছে। ফুটে উঠছে আকাশ ভ'রে তারার মতো, মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশ ছেয়ে মেঘের মতো। তানপুরার গুঞ্জন, তবলার স্পন্দন; মিরজা সাহেবের বয়সের-রেখা-আঁকা মুখ, তামাটে রঙের পুরু ঠোঁট, জোলো-জোলো চোখ, সুরের রসায়নে সব রূপান্তরিত; মুখে তাঁর আনন্দ, চোখে তাঁর লাস্য, সমস্ত মানুষটি যেন এক অলৌকিক আলোকের স্বচ্ছ পরিমণ্ডলে স্নাত, মগ্ন, স্বপ্নময়। অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অপরূপ—কোনো দেহধারীর কণ্ঠ-যন্ত্র থেকে নিঃসৃত এই অবিশ্রাম ধ্বনিপ্রপাত।

'হিমোফিলিয়ার মতো', সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সুধীন মন্তব্য করলো, 'কিছুতেই থামবে না।'

'না কি প্রেমের মতো?' জবাব দিলে ডোডো। 'বাসি হ'য়ে যায়, প'চে যায়, তবু থামে না।'

শরীরটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে উঠলো সে, তার কানের প্রকাণ্ড নীল পাথর সুধীনের কাঁধে আঁচড় কাটলো।

'সুন্দর', বীণা মনে-মনে বললে, 'কী সুন্দর!' সে প্রাণপণ চেষ্টা করলো মুগ্ধ হ'তে, মূর্ছিত হ'যে যেতে। কিন্তু, যতই চেষ্টা করুক, একটি চিঠির কথা না-ভেবে সে কিছুতেই পারছিলো না। যে-চিঠি কাল সকালে তার মা-কে লিখবে। এই সব কথা। মিরজা সাহেবের কথা, বিশেষ ক'রে। মাগো, কী অদ্ভুত গান···

'অদ্ভুত!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে একটি মেয়ে। মুখখানা তার হুবহু দোকানের জানলায় সাজানো পুতুলের মতো। নিখুঁত শ্বেতাঙ্গবেশী একটি যুবকের দিকে সে ফিরে তাকালো। 'অদ্ভুত—'

'অত্যন্ত অদ্ভুত,' অতি সহজেই যুবকটি সায় দিলে।

'বেলার খবর কী বলো? এখনো দারজিলিঙে ফগ খাচ্ছে?'

যুবকটির মুখ লাল হ'য়ে উঠলো।

'আমার মনে হয় ওর অন্যান্য জিনিশ বেশি ক'রে খাওয়া উচিত। যেমন প্রোটিন। যেমন ফ্যাট। সত্যি বড়ো রোগা। জানো তো ঈশ্বরের আর মানুষের চোখে স্ত্রীলোকের অন্যতম সার্থকতা হচ্ছে···'

যুবকটি মুখচোরাভাবে হেসে উঠলো।

'চায়ের শেয়ারে আর কিছু নেই,' তিনজন বুড়ো ভদ্রলোকের একজন বললেন, 'কিছুই নেই।'

'সত্যি বলতে, কটন-মিল ছাড়া আর-কিছুতেই কিছু নেই আজকাল। উঃ, টাকার কী ঝামেলা!'

'থাকলেও, না-থাকলেও', বললেন তৃতীয় ভদ্রলোক। তিনি রোগা, মাথার চুল শাদা, মুখের ভাব খিটখিটে। 'কিন্তু লোকটা গাইছে বেশ। শুনতে পেলে মন্দ হ'তো না।' পাইপে টান দিয়ে তিনি একটু চুপ ক'রে রইলেন। 'অসম্ভব! বাঁদরের মতো চ্যাচাচ্ছে সবাই।'

'গানটা কি সত্যি খুব ভালো? টাকা-নিয়ে-বিব্রত ভদ্রলোক জিগেস করলেন।

'আর সিনেমা!' যেন হঠাৎ একটি জরুরি কথা মনে প'ড়ে গেছে, এইরকম সুরে ভদ্রলোক ব'লে উঠলেন। 'ফিল্মে মোটারকম কিছু ফেললে অল্প সময়ের মধ্যেই···এই দেখুন না···'

পাংলা গোঁফওলা এক উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির যুবতী বললে: 'লোকেরা যুদ্ধ করে কেন? খুব বেশি ক'রে ফুটবল খেললেই পারে।' কথাটা সে এক বইতে পেয়েছিলো, কিন্তু সে-কথা ভুলে' গিয়েছিলো নির্ভুলভাবেই।

'সত্যি তা-ই মনে হয় আপনার?' অত্যন্ত গম্ভীর চেহারার এক যুবক তার চশমা-পরা দৃষ্টি মেয়েটির কিশোর গোঁফের উপর রাখলো। 'এদিকে অতিরিক্ত জনসংখ্যা। এদিকে অতিরিক্ত পণ্যোৎপাদন। এদিকে তৃতীয় ও ষষ্ঠ রিপু। এদিকে—'

'এদিকে একটু গান শুনলে কেমন হয়?' খুব সাধারণ চেহারার একটি মেয়ে বললে।

একটা মোহ, একটা জাদু, ডাইনিদের অলৌকিক মন্ত্র। মৃন্ময় কার্পেটের উপর আসন-পিঁড়ি হ'য়ে ব'সে, তার নোয়ানো মাথা গানের তালে-তালে নড়ছে, তার চোখ আধো বোজা। অসহ্য অসহ্য। যন্ত্রণার মতো।

ডোরিডার কাঁধে টোকা দিয়ে সুধীন বললে: 'মৃন্ময়কে ছাখো! মোক্ষলাভ করেছে। স্বর্গে বদলি হয়েছে। কেমন মাথা নাড়ছে, ছাখো না।'

ডোডো বললে, 'ওস্তাদকে ছাখো! মুখ দেখে মনে হয় না কে যেন তাকে চাবুকের পর চাবুক মারছে, আর মাঝখানকার ফাঁকটুকুতে সে উঠছে কঁকিয়ে!'

'আর চোখ দুটো!' সুধীন গম্ভীরভাবে বললে, 'চোখ দুটো কী-রকম বেরিয়ে আসছে—ঠিক ফাঁসির মড়ার মতো!' তারপর এক নিশ্বাসে একই রকম সুরে: 'আচ্ছা ডোডো, তোমার মেয়ে কোথায়?'

'নামকুমের কনভেণ্টে পড়ছে। আছে বাপের জিম্মায়। Out of harm's way,' শেষের কথাটা ব'লে ডোডো দাঁত বের ক'রে হাসলো।

'এতদিনে প্রায় মনোহারিণী তরুণী হ'য়ে উঠেছে—কী বলো?'

'ঠিক কথা, সুধীন, তুমি ওকে বিয়ে করবে? আমার আপত্তি নেই, আর তাছাড়া…'

'শাশুড়ির খাতিরে…' ব'লে সুধীন চোখের পাতা মিটমিট ক'রে নাড়লো।

আকাশে তারা। ফুলের মতো তারা ফুটেছে আকাশে। রাশি-রাশি তারা ঝরছে। আকাশ থেকে, শূন্য থেকে। কিছু-না থেকে। সীমাহীন সময়হীন মহাশূন্য একটি ফুল হ'য়ে ফুটছে, একটি তারা হয়ে জলছে। 'তিনটি শব্দ থেকে আমি সৃষ্টি করি চারটি শব্দ নয়, একটি তারা।' সাতটি শব্দ থেকে আমি সৃষ্টি করি বাসনাময় এক বিশ্ব। আর কী প্রচণ্ড বাসনা! বেহাগ শুনলেই মৃন্ময়ের যেন কান্না পায়। সুরের বন্যায় সে ভাসছে, সে দুলছে, সে ডুবে যাচ্ছে, এখন আর তার চেতনা নেই। পারিপার্শ্বিক তো মুছে গেছেই, এখন আর গানটাও যেন কান দিয়ে শুনছে না…শুধু তার বুকের মধ্যে কী-যেন ঠেলে উঠছে, ভয়ংকর, অসংবরণীয় বেগে। আর তার বোজা চোখের মধ্যে সেই একটি তারা ক্রমশই বড়ো হ'য়ে উঠছে, আরো বড়ো, আরো… তারপর তা একটা সূর্য হ'য়ে উঠলো।

'ঠোঁট দুটো ছাখো,' বললে ডোডো। 'অতিরিক্ত তাম্বুলচর্বণ।'

'আর অঙ্গভঙ্গি!' সুধীন গম্ভীরভাবে বললে।

'এই শেষের মুখভঙ্গিটা দেখলে! যেন ওর এক গালে কেউ চড় মেরেছে, আর এক গাল পেতে দিবে কিনা তা-ই ভাবছে।'

উচ্চ, উচ্চ স্বরে হেসে উঠলো দু'জনে।

'ঈশ—গানটা একটু যদি শুনতে পেতুম!' খিটখিটে চেহারার বুড়ো ভদ্রলোক পাইপের গোড়াটা চিবোতে-চিবোতে আর্তস্বরে বললেন। 'একপাল বেবুনের মতো কিচিরমিচির…'

'আশ্চর্য!' বীণা ভাবলে, 'আশ্চর্য!' সে সমস্ত মন দিয়ে শুনলো, মনোনিবেশের চেষ্টায় প্রায় পাগল হ'য়ে গেলো। কিন্তু চিঠির ভূত কিছুতেই ছাড়বে না তাকে। 'মা-মণি, কাল সন্ধেবেলাটা কী চমৎকার কাটলো! এমন গান শুনলুম···' মনে-মনে প্রায় অর্ধেকটা চিঠি লেখা হ'য়ে গেলো। তারপর হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো উপস্থিত পরিবেশে, সেই পাঁশুটে রঙের কণ্ঠকসরৎকারীর কাছে, হাত নেড়ে মুখ ভেংচিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে সে। অদ্ভুত, আশ্চর্য! এমন গান কি সে জীবনে কখনো শুনেছে? 'জানো মা, মিরজা সাহেব সত্যিকার প্রতিভাবান···' নাঃ, অসম্ভব!

বাইরে বারান্দায়, রাত্রির হাওয়া ঠাণ্ডা হ'য়ে লাগলো মৃন্ময়ের গালে। সে পালিয়ে এসেছে, এখানে—এতক্ষণে সে একা। প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনি···সময়ের সুরঙ্গ বেয়ে কোথায় চ'লে গেলো, তারা-ভরা আকাশ পেরিয়ে চ'লে গেলো কোথায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় দীর্ঘ, দীর্ঘ কয়েকটা নিশ্বাস নিলে সে। ঘরের মধ্যে গোলমাল কেবলই বেড়ে চলেছে। কারা সব গায়ককে বাহবা দিলে। এত গোলমাল ছাপিয়ে ডোডোর তীক্ষ্ণ কাকাতুয়া-কণ্ঠ পৌঁছলো এসে তার কানে। এখন তো ডিনার। কিন্তু ডিনারে সে কিছুতেই থাকতে পারবে না। তাকে যেতে হবে, পালিয়েই চ'লে যেতে হবে। মীরা বোধহয় কিছু মনে করবে না।

'মৃন্ময়কে লক্ষ্য করেছিলে?' ডোডো হাসলো। 'সত্যি-সত্যি চোখ দিয়ে জল পড়ছিলো!'

'"Music hath its charms,"' বললে সুধীন, '···to make asses of men.' তারপর, ভিড়ে ভরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে ডাইনিং হলের দিকে নামতে-নামতে: 'তুমিই বলো, ডোডো, এই জরজেট শাড়িগুলো কি বড্ড বেশি এগজিবিশনিস্টিক নয়?'

১৯৩৬ 'খাতার শেষ পাতা'

ফেরিওলা

ফেরিওলার হাঁক শুনলেই নীলিমার মন রাস্তায় ছুটে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হয়তো ডাকে—'এই এসো—দোতলায়।' কি হয়তো চাকর দিয়ে ডেকে পাঠায়। পিঠের বোঝা নামিয়ে একটি ঘর্মাক্ত জীব সিঁড়ির ধারে এসে বসে, নীলিমা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কত জিনিশ যে নেড়ে-চেড়ে ছাখে। চার আনার জিনিশ কিনতে আধ ঘণ্টা লাগে। ফেরিওলারা অতি ভালো লোক, অতি মধুর কথা বলে, তাছাড়া তাদের সঙ্গে আজগুবি দরদস্তর চলে। প্রথমে যা চাইলো তার প্রায় অর্ধেক দামেই হয়তো জিনিশটা দিয়ে যায়। তাও বাকিতে।

কী জিনিশ? ছিটের কাপড়, তাঁতের শাড়ি, কাচের চুড়ি; সিঁদুর আলতা, চুলের কাঁটা, কত কী। আর বাবলুর জন্যে পুতুল, আর এটা-ওটা। কতগুলো লোক আছে, তারা এই ঝাঁ-ঝাঁ রোদে চীৎকার ক'রে হেঁকে যায়—'চে-য়াই সাবান তরল আলতা!' পিঠের উপর বোঁচকাটার ভারে শরীরের উপরের অর্ধেক তাদের বাঁকানো—ঐ বোঝা নিয়ে এত বড়ো শহরে কোথা থেকে কোথায় তারা চ'লে যায়, নীলিমার ভাবতে অবাক লাগে।

এদিকে শান্তনু ফেরিওলা পছন্দ করে না। তার বড়োলোকি মেজাজ, জিনিশের দরকার হ'লে নিউ মার্কেটে গিয়ে ঝনাৎ-ঝনাৎ টাকা ফেলে নিয়ে এসো—হাঙ্গামা চুকলো। ফেরিওলা, জাপানি খেলো জিনিশ আর দরদস্তর—তিনটার উপরেই তার পরম নাক-শিঁটকোনো ভাব।

অথচ ঝনাৎ-ঝনাৎ-এর অভাব প্রায়ই ঘটে; এবং শান্তনুর মতে চললে ভালো জিনিশ কেনবার আশায় ব'সে থেকে-থেকে অনেক দরকারি জিনিশ হয়তো কখনোই কেনা হ'তো না। তাছাড়া, সংসারে কত জিনিশ দরকার, পুরুষমানুষ তার কী বোঝে!

না বুঝুক, নাক ঢোকানো চাই সবটাতেই। যেমন ধরা যাক, নীলিমা সেদিন তার ফেরিওলার কাছ থেকে দশ পয়সা ক'রে আট গজ মার্কিন রেখেছে, শান্তনু মুখ বাঁকিয়ে বললে, 'ওগুলো রাখলে কেন?'

নীলিমা হঠাৎ চ'টে গিয়ে বললে, 'রেখেছি তো রেখেছি, তুমি চুপ করো।'

শান্তনু সংক্ষেপে বললে, 'পয়সা নষ্ট।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই! এদিকে বালিশের ওয়াড়গুলো সব ছিঁড়ে গেছে, তা নিয়ে প্যানপ্যান করতে তোমাকেই শুনি।'

'ও, এ দিয়ে বালিশের ওয়াড় হবে বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আর এই অভাগিনীর একটা শেমিজ।'

'ঐ মোটা কাপড়ে তোমার শেমিজ! আমাকে যদি বলতে—'

'তোমাকে বললে শেমিজ কিনতে ছুটতে তো হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকানে! তোমার বুদ্ধির দৌড় তো ঐ পর্যন্ত। হয়তো আধডজন পিলো-কেসও আসতো।'

'ভালোই তো। ভালো জিনিশ তো ভালোই। তোমার শেমিজের জন্য আমি খুব চমৎকার একটা কাপড় কিনে আনবো, দেখো।'

'থাক, থাক, আমি গরিবমানুষ, আমার ওতেই হবে। তুমি আর তোমার ছেলে যত পারো বাবুগিরি কোরো।'

নীলিমা তক্ষুনি মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শেলাইয়ের কল নিয়ে ব'সে গেলো। শান্তনু একটু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি ক'রে বললে, 'এই খেয়ে উঠলে, এক্ষুনি বসলে কল নিয়ে। ঐ রকম করো বলেই তো মাথা ধরা ছাড়ে না।'

'ওঃ, আমার মাথা—তা ধরলেই বা কী, না-ধরলেই বা কী? তোমার মাথা ঠাণ্ডা থাকলেই বাঁচি।' চললো তারপর কলের ঘটরঘটর। শান্তনু আর কী করে, রবিবারের দুপুরবেলায় নভেল হাতে নিয়ে এপাশ-ওপাশ।

দু'জনে কথা কাটাকাটি লেগেই আছে। শান্তনু যা বলবে, নীলিমা ঝাঁ ক'রে প্রতিবাদ করবে; তারপর এক প্রস্থ ঝগড়া। জগতে এমন-কোনো বিষয় নেই যাতে দু'জনে একমত!

সকালবেলায় একটা লোক হেঁকে যাচ্ছে—'আতা ফল চাই। আতা ফল!' তক্ষুনি শান্তনু ব'লে উঠলো, 'ঐ যে তোমার কৃষ্ণের বাঁশি।'

নীলিমা বললে, 'ঠিক মনে করেছো। আতা ফলের কথাই ক'দিন থেকে ভাবছি। তুমি ভালোবাসো না আতা?

'ও-সব বাজে ফল-টল আমি খাইনে।'

'তা খাবে কেন। মনে করো বারো পেয়ালা চা খেলেই খুব হ'লো! রাখি কয়েকটা, আপিশ থেকে এসে খাবে।'

আতাওলা এলো, ছ'টা ফল বেচে দিয়ে গেলো। শান্তনু বললে, 'সত্যি আমার এক-এক সময় ফেরিওলা হ'তে ইচ্ছে করে।'

'বড়ো সুখ কিনা! এই রোদ্দুরে ঘুরে-ঘুরে ক' পয়সাই বা রোজগার। আহা—ওরা বড়ো ভালো। ওদের মধ্যে আমি এ-পর্যন্ত একটাও খারাপ লোক দেখিনি।'

'ওদের স্ত্রীদের মতটা নিশ্চয়ই অন্য রকম।'

'আহা—ওদের আবার স্ত্রী-পুত্র! কোথায় সব দেশে প'ড়ে আছে—বছরে বুঝি দেখাও হয় না।'

শান্তনু একটা চিঠি লিখতে শুরু করেছিলো; অন্যমনস্কভাবে বললে, 'হুঁ।'

'তোমার মার্কেটের জোচ্চোরদের পয়সা দেয়ার চাইতে ওদের পয়সা দেয়া ঢের ভালো। ওরা যে কী অসম্ভব গরিব ভাবতে পারো না।'

'কেন বলো তো?

'সেদিন এক বুড়োর কাছ থেকে চিনে সিঁদুর কিনলুম। ও বলে—এ পাড়ার সক্কলে আমার কাছ থেকে নেয়, আপনিও নেবেন, মা।'

'ও, তোমার নতুন পুষ্যি হ'লো বুঝি?'

'ও বলে—আর পারিনে, মা, রোদে-রোদে ঘুরতে, কিন্তু কী করবো। মায়েরা সব বলেন—কত লোক তো সিঁদুর হেঁকে যায় কিন্তু তোমার মতো জোরে আর-কেউ হাঁকে না। আমার ডাক শুনলেই মায়েরা চিনতে পারেন। জোরে কি আর শখ ক'রে হাঁকি, মা, জোরে না-হাঁকলে কেউ তো ডাকবে না আমাকে। এবারে কিছু পয়সা জমলেই দেশে চ'লে যাবো।—জানো, লোকটা হিন্দুস্থানি, দেশ মজঃফরপুরে, বৌ কবে ম'রে গেছে, এক মেয়ে আছে শুধু। বলছিলো, দেশে যাবার টাকা জমতে আরো ছ'মাস নাকি লাগবে। আহা—মেয়ের জন্য মন কেমন করে না! আমি বলেছি, ওর কাছ থেকেই সব সময় সিঁদুর কিনবো, কিন্তু বছরে মানুষের কতটুকুই বা সিঁদুর লাগে।'

শান্তনু বললে, 'এ-রকম কত আছে।'

'এত খাটে, কিন্তু কী পায়? কিচ্ছু না।'

'আমি যত খাটি, আমিই কি তার উচিত দাম পাই।'

'কী যে বলো! সত্যি, মনটা ভারি কেমন লাগে না? জানো, ও বলছিলো কোনো বাড়িতে কাজ পেলে ফেরি করা ছেড়ে দেয়।'

'তবে আর কী! আমাদের বাড়িতেই ওকে বহাল করো।'

'তা তো আর হয় না। সত্যি-সত্যি কেষ্টটা ভারি ভালো, ওকে কী ক'রে তুলবো? আবার একজন ঝি-ও তো জুটিয়েছো। তিনজন মানুষের জন্য তিনজন লোক রাখবে নাকি? আমি তো আরো ভাবছি সামনের মাসে ঝি তুলে দেবো। কোনো কাজেই লাগে না, মাঝখান থেকে টাকার শ্রাদ্ধ।'

'তারপর তুমি কোমর টাটিয়ে রোজ ঘরের মেঝে মুছবে তো ?'

'ইশ—ঐটুকু কাজ করলে আমি যেন ম'রে যাবো। তোমরা কিচ্ছু বোঝো না। বরং ঝি-চাকরের পিছন-পিছন তাড়না করবার চাইতে নিজের হাতে কাজ করায় অনেক সুখ।'

'বেশ, যা খুশি কোরো', ব'লে শান্তনু চিঠি শেষ ক'রে উঠলো। তার আপিশের বেলা হয়-হয়। আপিশমুখো ট্রামে ব'সে-ব'সে শান্তনু ভাবে, সত্যি, আয় বাড়াবার কিছু-একটা ব্যবস্থা না-করলে চলে না। ভালো লাগে না আর এত টানাটানি। কিন্তু কী করবে ? বীমার দালালি ? না কি মাসিকপত্রের জন্য গল্প লিখবে ?

এদিকে নীলিমার ভাবখানা যেন ভারি নিশ্চিন্ত। পাগল! এই আপিশের খাটুনি, তারপর আরো কিছু করতে যাবে নাকি ? শরীর ব'লেও তো একটা জিনিশ আছে মানুষের! কত টাকাই তো আনছো—আরো লাগবে কিসে ? নীলিমা যখন-তখন দু'চার পয়সা থেকে দু'দশ টাকা পর্যন্ত বা'র করতে পারে—বিছানার তলায়, টেবিলের টানায়, শেলাইকলের বাক্সে—যেখানে হাত দেবে সেখানেই কিছু আছে। হঠাৎ কিছু দরকার হ'লে, শান্তনু জানে, নীলিমা চালিয়ে নিতে পারবেই।

কিন্তু একে অবশ্যি সচ্ছলতা ব'লে ভুল করা যায় না। প্রায়ই বেশ খোঁচা লাগে। নীলিমা প্রাণপণে হাসি-ঠাট্টা ক'রে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু শান্তনুর মন-খারাপ হয়ে যায়।

আয় বাড়াবার চেষ্টা তাকে করতেই হবে। সে কি একটা ট্যুশনি পায় না ?

সেদিন সন্ধ্যার পর আপিশ থেকে ফিরে চা খাচ্ছে, নীলিমা বললে : 'ছাখো, সেই সিঁদুরওলা বুড়ো আজ আবার এসেছিলো।'

'বিনা আহ্বানেই ?'

'আজ হঠাৎ শুনি ও হাঁকছে—'চে-য়াই সাবান তরল আলতা, হেজেলিন পমেটম পাউডার চাই।' অবিকল ফেরিওলার সুর নকল ক'রে ব'লে উঠলো নীলিমা। শান্তনু হেসে ফেললো।

'ও কি রাতারাতি বড়োলোক হ'য়ে গেলো ?'

'আমি তো অবাক। ও বললে অনেক কষ্টে এ-সব জিনিশ জুটিয়েছে, খালি সিঁদুর বেচে কিছুই হয় না। খুব খুশি লাগলো—এবারে বোধহয় শিগগিরই ওর দেশে যাবার মতো টাকা জ'মে যাবে - কী বলো ?'

'তোমাদের দয়া! তা কত চাঁদা দিলে ওকে ?'

'দু' আনা দিয়ে একটা হারমোনিয়ম-বাঁশি কিনেছি। বাবলু কী খুশি!'

শান্তনু গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'না-কিনলেই কি চলতো না? এমনি ক'রে কত পয়সার অপব্যয় করো।'

'কী যে বলো! 'ছেলেটা বাঁশি নিয়ে বাজাতে শুরু করেছে, কেড়ে নেয়া যায় নাকি হাত থেকে!'

'এ নিয়ে তো বোধহয় পঞ্চাশটা বাঁশি কিনলে। ছেলেটা দু'দিন লাফালাফি করে, তারপরেই হয় ভাঙে নয় ফেলে দেয়। এত পয়সা জোটাতে কি আমরা পারি!'

'কী আর করবে, শিশুরা ঐরকমই। তা দু'আনার বাঁশি কবে আর কিনেছি। এক পয়সার বাঁশের বাঁশিগুলো—'

'এক পয়সা এক পয়সা ক'রে কম হয় না।'

'ওঃ, খুব তো হিশেব শিখেছো। কবে এত সুবুদ্ধি হ'লো? বড়ো যে বলছো অপব্যয়, ফেরিওলাদের কাছ থেকে কত শস্তায় সব পাওয়া যায় তা জানো?'

'শস্তাও যেমন, পচাও তেমন।'

'তা তো ঠিকই! সেদিন দেড়টাকা দিয়ে বাক্সওলার কাছ থেকে বাবলুর যে-কোটটা রেখেছি, সাধ্য ছিলো তোমার চার টাকার কমে কোথাও কেনো! আসল সাটিন, আর কি সুন্দর ছাঁটকাট। তোমাকে পাঁচশো দিন ব'লে-ব'লে এই জামাটা কেনাতে পারলুম না। আর্মি-নেভিতে যাবার মতো অবস্থা হবে, তবে তো! তাও কত সুবিধে—বাকি রাখা যায়, আস্তে-আস্তে দিতে গায়েই লাগে না।'

শান্তনু সিগারেট ধরিয়ে বললে · 'এদিকে কত পয়সা যে বাজে খরচ হ'য়ে যায় তা তো ভাবোই না। খামকা কত কিছু কেনো—কোনো কাজেই লাগে না সে-সব।'

'কাজে কোনটা লাগে আর না লাগে তুমি তার কী জানো! হাজার রকম ছোটোখাটো জিনিশের ব্যবহারের ফল হচ্ছে—তোমার শারীরিক আরাম। সেই জিনিশগুলো তুমি তো আর চোখে ভাখো না—'

'যথা—হাতা, খুন্তি, শিল-নোড়া ইত্যাদি। হার মানছি, এবারে একটা পান দিলে বাধিত হই।'

'এই তো—সেবারে পুরী থেকে ফেরবার সময় কটক স্টেশনে একখানা জাঁতি কিনেছিলাম ব'লে রাগ করেছিলে। অথচ কী সুন্দর জাঁতিখানা, কী চমৎকার কাজে লাগছে।'

নীলিমা উঠে গিয়ে পান সেজে নিয়ে এলো। একটু পরে বললে, 'জানো, ঐ বুড়ো ফেরিওলা বলে কী। ও আমাদের সমস্ত জিনিশ দেবে—সাবান, পাউডর, এমনকি তোমার সিগারেট, তারপর মাসের শেষে দাম নেবে। আমরা যে-সব

সাবান-টাবান মাখি তার বাক্সগুলো পেলে ও ঠিক সেই জিনিশ এনে দেবে। তোমার সিগারেটের একটা খালি টিন নিয়ে গেছে।'

মাস ভ'রে বাকিতে সিগারেট খাবার সম্ভাবনায় শান্তনু একটু উল্লসিত হ'য়ে বললে : 'বলো কী !'

নীলিমা বললে, 'তুমি যদি বলো ওকে ঠিক করি। বাবাঃ, তোমার ঐ নবকৃষ্ণ ভাণ্ডার যা চোর ! বাকিতে যেমন দেয়, দাম নেয় ডবল। ওদের তুমি এ-মাস থেকে ছেড়ে দাও।'

'বেশ। তোমার ফেরিওলা দিয়ে সুবিধে হ'লেই হয়।'

'ও দিতে পারলে দিক না। কী বলো ?'

'ভালোই তো। আমার সিগারেট কবে আনবে ?'

'বলেছে তো কাল নিয়ে আসবে।'

আর সত্যি, পরের দিন শান্তনু আপিশ থেকে ফিরে ছাখে, টেবিলের উপর আস্ত দু'টিন সিগারেট, আর তার সঙ্গে এক সেট ছবি-আঁকা জাপানি ছাই-দান। একটা বড়ো থালার উপর চারটে ছোটো-ছোটো বাটি। নেহাৎ মন্দ না।

'কত দাম নিলে ?'

'পাঁচ আনা বলেছে—এখনো দিইনি। সুন্দর না ? তোমার পছন্দ হয়েছে ? আর শস্তাও খুব।'

শান্তনু বললে, 'হুঁ।'

নীলিমা স্বামীর মুখের দিকে বাঁকা চোখে একবার তাকিয়ে বললে, 'তোমার পছন্দ না হয় ফিরিয়ে দেবো। অ্যাশট্রে তো তোমার দরকার।'

সত্যি বলতে, ছেলের জন্য দু'আনার বাঁশি যতটা বাজে খরচ মনে হয়েছিলো, নিজের জন্য এই পাঁচ আনার অ্যাশট্রে ঠিক ততটা মনে হ'লো না। দোমনা ভাবে বললে, 'আচ্ছা, রেখেছো যখন—'

নীলিমা মুচকি হেসে বললে, 'তোমাকে দাম দিতে হবে না। আমি উপহার দিলুম তোমাকে ওটা।'

'ওঃ, এতই যখন তোমার দয়া, তখন দুটো টাকা আমাকে ধারও দিতে পারো। বড়ো উপকার হয়।'

'আমি গরিব মানুষ, দু'টাকা কোথায় পাবো। দু'আনা চার আনা পর্যন্ত দৌড়।'

'কেন, সেবার তো আস্ত দুটো টাকা দিয়েছিলে।'

'মনে আছে তাহ'লে! দু'দিনের কথা ব'লে দুটো টাকা নিয়েছিলে, আর ফিরিয়ে দিলে না! চোর!'

শান্তনু হেসে বললে, 'গোড়া থেকেই তা-ই। তোমাকে যখন মাতৃক্রোড় থেকে ছিনিয়ে এনেছিলুম তখন ডাকাত বলতে পারতে।'

নীলিমা বললে, 'ওগো ভালোমানুষ, দয়া ক'রে আমার টাকা দুটো ফিরিয়ে দিতে ভুলো না। আমার কৌটোতে কিচ্ছু নেই।'

একটি পাউডরের কৌটো ফুটো ক'রে নিয়ে নীলিমা তাতে বাজার-ফেরৎ দু'চার পয়সা ফেলে রাখে, মাঝে-মাঝে একটা দু'আনি কি সিকি, কদাচ একটা আধুলি কি টাকা। জিনিশটা এক-এক সময় ওজনে খুব ভারি হ'য়ে ওঠে, কিন্তু তার আসল ভার বিশেষ-কিছু নয়, কেননা তার গহ্বরে বেশির ভাগই তাম্রমুদ্রা। তবু সেটা অনেক সংকট থেকে বাঁচায় এবং সংকট প্রায়ই ঘটে ব'লে তার উপর এত বেশি টানা-হেঁচড়া চলে যেটা নীলিমার পছন্দ হয় না। সকালে উঠে দেখা গেলো বাজারের পয়সা নেই, ভৃত্য অপেক্ষমান; নীলিমা আড়ালে গিয়ে কৌটো ঝেঁকে-ঝেঁকে পয়সা বা'র করে—ভৃত্য কিছু দেখতে পায় না, কিন্তু ঝনঝন শব্দ শোনে কিনা কে জানে। পাউডরের তলানিতে শাদাটে-হ'য়ে-যাওয়া এক মুঠো তামার পয়সা চাকরের হাতে দিতেও কেমন লাগে।

কিংবা হয়তো বাড়িতে হঠাৎ কোনো আত্মীয়রা বেড়াতে এসেছেন, নীলিমা তাঁদের বসবার ঘরে বসিয়ে লুকিয়ে একটি আধুলি উদ্ধার ক'রে আনে, মিষ্টিমুখে ভদ্রতা রক্ষা হয়।

একদা সেই কৌটা থেকে দু'-দুটো টাকা ধার ক'রে শান্তনু আর ফিরিয়ে দেয়নি। নীলিমা সুযোগ পেলেই সেটা শোনায়।

শান্তনু তার শেষ কথা বললে, 'আমি তো তোমার কৌটোর ভরসাতেই আছি—আর সম্প্রতি তোমার ফেরিওলার।'

ঘরে ব'সে ধারে সিগারেট খেয়ে শান্তনুর মেজাজটা বেশ ভালোই যাচ্ছিলো, এর মধ্যে এক কাণ্ড। সকালবেলায় চা খেয়ে কাগজ কলম-নিয়ে বসেছে; এক বন্ধু বলেছে আধুনিক মেয়েদের বিরুদ্ধে দু'পৃষ্ঠায় সাধুভাষায় কিছু অসাধু বচন ঝাড়তে পারলে দশটা টাকা পাওয়া যাবে। বিষয়টা মোটেই মনঃপূত নয়, কিন্তু দশটা টাকাও ছাড়া যায় না। কিছুতেই লেখা এগোচ্ছে না, সিগারেটের পর সিগারেট খামকা পুড়ে যায়, এদিকে ঘরের বাইরে নীলিমা অবিশ্রান্ত কার সঙ্গে যেন বকরবকর করছে।

খানিক পরে তার মনে হ'লো এ কোনো ফেরিওলা না-হ'য়ে যায় না। রাগে তার মুখ কালো হ'য়ে গেলো। কার সাধ্য এ-বাড়িতে একটু নিরিবিলি ব'সে কাজ করে!

সব সময় বাজার বসেছে। এদিকে সে দশটা টাকার জন্য মাথা খুঁড়ে মরছে, ওদিকে নীলিমার কাণ্ডটা দ্যাখো।

ঠিক আধুনিক মেয়েদের মারাত্মক আক্রমণ করবার মতোই যখন তার মনের অবস্থা এমন সময় নীলিমা ঘরে ঢুকে নিচু গলায় বললে—'শোনো, ঐ ফেরিওলা টাকা চাইছে।'

'আমাকে কেন বলতে এসেছো ও-কথা', ব'লে উঠলো শান্তনু।

'কাকে বলবো তবে? শোনো, ও বলছে এত জিনিশ দিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না - টাকা না-পেলেই চলবে না ওর।'

'তাই ব'লে এক্ষুনি চাই? এই মুহূর্তে?'

'বড্ড পিড়াপিড়ি করছে। গরিব মানুষ—ঠিকই তো, এত সিগারেট ও কোত্থেকেই বা দেবে। সব সুদ্ধ ছ' টাকা তেরো আনা হয়েছে।'

'এখন মাসের শেষ, কোথায় পাবো টাকা?'

'তাই তো ভাবছি।'

'আগে ভাবলেই ভালো করতে। যত রাস্তার লোক ধ'রে-ধ'রে এনে জোটাবে—কী বোকার মতো কাজ করো এক-এক সময়।'

শেষের কথাটা হজম ক'রে অতি নিচু গলায় বললে নীলিমা, 'কাল আসতে বলবো ওকে? পারবে জোগাড় করতে?

কাগজের উপর গোটা দুই লাইনের আঁকিবুঁকির দিকে তাকিয়ে শান্তনুর শরীরটা যেন জ্ব'লে গেলো। চড়া গলায় ব'লে উঠলো, 'কোত্থেকে জোগাড় করবো? তুমি জানো না আমার অবস্থা? এখন আমাকে ধার করতে ছুটতে হবে তো—আর চাওয়ামাত্র ধারই বা কে দেবে আমাকে।'

নীলিমা প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে বললে, 'ও তো বলেছিলো মাসের শেষে নেবে, এ-রকম হবে জানলে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ফেরিওলারা তো এ রকমই। জোচ্চোর, চোর, বাড়ির মেয়েদের ঠকিয়ে দু'পয়সা করাই তো ওদের পেশা। আর তুমিও যেমন! ফেরিওলা ডাকা ছাড়া আর কি সময় কাটাবার উপায় নেই?'

'দরকারেই ডাকি।'

'অদরকারেও ডাকো। জানো কিছু নেবে না, হাতে পয়সা নেই, তবু কত লোককে ডেকে এক ঘণ্টা জিনিশপত্র ঘেঁটে ফিরিয়ে দাও। লজ্জাও করে না। আমি তোমাকে বলছি, কক্ষনো আর এ-বাড়িতে ফেরিওলা ডাকতে পারবে না।'

মুহূর্তে ঝলসে উঠলো নীলিমার চোখ। 'বেশ, আর ডাকবো না। এ বাড়ি তোমার, তোমার ইচ্ছেমতোই সব হবে। কিন্তু এটা ঠিক জেনো যত জিনিশ আমি ও'দের থেকে কিনি সবই তোমার আর তোমার ছেলের জন্য। নেহাৎ যা না-হ'লেই নয়। এই ছ' টাকা তেরো আনার মধ্যে পাঁচ টাকাই তোমার সিগারেটের, তা মনে রেখো। আর সাবান--তাও তোমার। আর বুঝি কয়েকটা কাচের গেলাস—তাও—'

'থাক, থাক, আর হিশেব শুনতে চাইনে। এক্ষুনি বিদেয় ক'রে আসছি ওকে।' এক ঠেলায় চেয়ারটা সরিয়ে শান্তনু বাইরে গিয়ে ঢাখে, বুড়োমতো একটা লোক সামনে প্রায় একটি মনোহারি দোকান সাজিয়ে বারান্দায় ব'সে গামছা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে। রাগে শান্তনুর মুখ দিয়ে হিন্দি বেরিয়ে গেলো, 'এই ভাগো! বাহার যাও! নিকালো! আভি নিকালো।'

শান্তনুর সঙ্গে তার সিগারেট-সরবরাহকারীর প্রথম সাক্ষাৎ হ'লো এইরকম। লোকটা তার কুঁকড়োনো মুখ তুলে অবাক হ'য়ে তাকালো শান্তনুর দিকে।

'ক্যায়া? মালুম নেই হোতা? বাহার যাও জলদি।' ব'লে শান্তনু ওর দু'একটা জিনিশ পা দিয়ে ঠেলেও দিলে বুঝি।

লোকটা কোনো কথা বললে না; মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে তার সব পসরা কুড়িয়ে নিয়ে বস্তা বাঁধলো, তারপর সেটা ঘাড়ে ক'রে আস্তে-আস্তে নেমে গেলো সিঁড়ি দিয়ে।

শান্তনু ঘরে ফিরে এসে বললে, 'আপদ গেছে। কক্ষনো আর ডেকো না ব'লে দিলাম।'

কথা বলতে গিয়ে নীলিমার ঠোঁট কেঁপে উঠলো, চেষ্টা ক'রে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'খুব তো বারত্ব ক'রে এলে। তা ওটা আমার উপর করলেই ভালো করতে। ও বেচারা তো কোনো দোষ করেনি।'

নিষ্ঠুরতার একটা নেশা আছে, তারই ঝোঁকে শান্তনু ব'লে উঠলো, 'নাও, নাও, রাস্তার লোককে অত দয়া না-ক'রে নিজের স্বামীকে একটু-আধটু দয়া করতে শেখো।'

নীলিমার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো, চোখ উঠলো ঝকঝক ক'রে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে, 'এটাই তো তুমি জানাতে চাও যে তুমি কর্তা, তুমি প্রভু! এ তো কবেই বুঝেছি যে আমি তোমার দাসী ছাড়া কিছু নই—তোমার সব খুঁটিনাটি মরজি মেনে চললে মাঝে-মাঝে পিঠে একটু হাত বুলোতে পারো বটে। আমার নিজের ব'লে কিছু আছে নাকি? আমি তো সেই রকমই চলি—তুমি যা ভালো না-বাসো তা না করাটা

আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বলতে পারবে, আমার নিজের কোনো শখ ব'লে কিছু আছে, নিজের খেয়ালে একটা টাকা কখনো খরচ করেছি? ভিখিরির মতো কুড়িয়ে-কাচিয়ে দু'চার পয়সা যা জমাই তা-ই দিয়ে কখনো-কখনো এটা-ওটা কিনি ব'লেই তো তোমার এত রাগ। ঐ বুড়োকে তোমার সিগারেটের জন্যই ঠিক করেছিলুম —সব সময় হাতে পয়সা থাকে না, অসুবিধে হয়—'

'জানি, জানি, আমি সিগারেট খেয়ে পয়সা নষ্ট করি, এ-কথা কত আর শোনাবে। আমার বাবুগিরির মধ্যে তো ঐ সিগারেট! তা তুমি যা-ই বলো, সিগারেট না-হ'লে আমার চলবে না। এত খেটে রোজগার করি, এই সামান্য একটা বিলাসিতাও কি আমার থাকা অন্যায়?'

'থাক, থাক, আর বোলো না। তুমি একা থাকলে তো ভালোই থাকতে, আমাকে বিয়ে ক'রে গরিব হয়েছো ও-কথাটা আর না-ই শোনালে। আমি এলাম, তারপর বাবলু এলো, কত বাড়লো খরচ, তোমার নিজের সুখ-সুবিধে সব গেলো, সবই জানি আমি! কেন আমাকে বিয়ে করেছিলে? এত কঠিন দুঃখ কেন দিলে আমাকে? তোমার জীবনের সমস্ত জিনিশের মধ্যে নিজেকে মনে-প্রাণে বিলিয়ে দিয়ে ভাবি, এই তুমি চেয়েছিলে, আমাকে না-হ'লে তোমার কিছুতেই চলতো না, চলবেও না। ভুল, ভুল! আমরা মেয়েরা শুধু মনে-মনে খেলাঘর সাজাই, তা ছাড়া আর কী।'

বলতে-বলতে নীলিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

এদিকে শান্তনু হঠাৎ লক্ষ্য করলো ঘড়ির কাঁটা ন'টা ধরো-ধরো। পাগলের মতো ছুটে গেলো বাথরুমে, মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে এসে হাঁকে-ডাকে কেষ্টকে অস্থির ক'রে তুলে, গোগ্রাসে কিছু ভাত গিলে, পাৎলুন আর কোট চাপিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে ট্র্যাম ধরলো। নীলিমার সঙ্গে আর একটা কথা বললে না।

বিশ্রী একটা কাণ্ড হ'য়ে গেলো।

আপিশ থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই শান্তনু পকেট থেকে একটি দশ টাকার নোট বা'র করলে, 'এই নাও, তোমার ফেরিওলার পাওনা চুকিয়ে দিয়ো।' হেসে বললে কথাটা, ঈষৎ ঠাট্টার সুরে, যেন সকালবেলার ঘটনাটা এই একটুখানি হালকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চায়।

নীলিমা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। 'তোমার কাছেই রাখো।'

শান্তনু আবার বললে, 'নাও।'

নীলিমা নিলে নোটটা, কাপড়ের আলমারির দেরাজে রেখে দিয়ে বললে, 'চা খাবে এসো।'

খাবার টেবিলে বিরাট আয়োজন, নীলিমাই ব'সে-ব'সে ও-সব করেছে। খিদেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছিলো শান্তনুর, দ্রুতবেগে খেতে শুরু করলে। একটু পরে বললে, 'তুমি খাচ্ছো না?'

'আমিও খাচ্ছি।'

একটু শিঙাড়া ভেঙে মুখে দিলে নীলিমা আধ পেয়ালা চা ঢেলে নিলে। হয়তো সে কেঁদেছে, হয়তো দুপুরে সে খেতে ব'সেও কিছু খেতে পারেনি। এদিকে শান্তনু আপিশে পৌঁছিয়েই যা হোক ক'রে সেই প্রবন্ধ লিখে বেয়ারার হাতে পাঠিয়ে দশ টাকা আনিয়েছে; লাঞ্চের সময় খুব খিদে পেয়েছিলো, তবু ভালো ক'রে কিছু খায়নি, তাহ'লে নোটটা ভাঙাতে হয়। এমনি ক'রে নোটটি উপার্জন ও রক্ষা ক'রে বাড়ি নিয়ে এসেছে, কিন্তু নীলিমা একবার জিগেস করলো না কোথায় পেলো। কথাগুলো সব মনে-মনে সাজানো ছিলো; বলা হ'লো না।

চাপা গুমোটে কাটলো রাত্রি, কাটলো তার পরের দিন। আপিশ থেকে ফিরে শান্তনু জিগেস করলে, 'তোমার ফেরিওলা এসে টাকা নিয়ে গেছে?'

'না, আসেনি।'

'আসেনি? কাল আসবে দেখো -টাকা যখন পাবে, না-এসে যাবে কোথায়?' কিন্তু শান্তনুর মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া পড়লো।

চারদিন কেটে গেলো, বুড়ো এলো না। শান্তনু বললে, 'নীলিমা, কেমন হ'লো? আসে না কেন লোকটা?'

'কী জানি!'

'অসুখ করলো নাকি? তোমার তো আরো সব ফেরিওলা আছে – তাদের দিয়ে একটু খোঁজ করাও না।'

নীলিমা চুপ ক'রে রইলো।

'রাস্তায় ওর ডাক শুনতে পাও না?'

'কই, না তো।'

'কাল মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা কোরো।'

কিন্তু পরের দিনও বুড়োর সেই চড়া হাঁক শোনা গেলো না একবারও। তার পরের দিন রবিবার। শান্তনু সারা দুপুর ঘুমোতে পারলো না। প্রায়ই উঠে-উঠে বারান্দায় যায়, মনে হয় বুড়োকে বুঝি দেখবে। কিন্তু কোথায়!

এক মাস কেটে গেলো।

'কী আশ্চর্য', শান্তনু হঠাৎ একদিন বললে, 'বুড়ো আর এলোই না।'

নীলিমা বললে, 'এলো না তো।'

'কী হ'লো ওর বলো তো?' বড়ো ম্লান দেখালো শান্তনুকে, প্রশ্নটা বড়ো অসহায় শোনালো। 'হয়তো দেশে ফিরে গেছে ওর মেয়ের কাছে—কী বলো?'

'হয়তো গেছে।'

হয়তো গেছে। হয়তো গাড়ি চাপা পড়েছে, হয়তো জ্বর হ'য়ে ম'রে গেছে—কি হয়তো কলকাতারই অন্য-কোনো পাড়ায় ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে পথে-পথে ঘুরে গলা ফাটিয়ে চিনে সিঁদুর হেঁকে বেড়াচ্ছে, দেশে যাবার পয়সা জমতে এখনো ঢের দেরি। কে জানে!

১৯৩৭ 'ফেরিওলা'

হতাশা

—কী, শুয়ে পড়লে যে বড়ো? আপিশে যাবে না আজ?

—আহা, এই খেয়ে উঠলুম, একটু জিরোতে দাও না। আর একটা পান দাও।

সুরমা পানের ডিবেটা নিয়ে স্বামীর শিয়রের কাছে রাখলো। অনুপম একটা পান মুখে দিয়ে খবর কাগজের ছবির পৃষ্ঠাটা চোখের সামনে খুলে ধ'রে বললে—বিলিতি মেয়েগুলো কী অসভ্যই হচ্ছে দিন-দিন! ঐটুকু কাপড় গায়ে না-রাখলেই বা কী! দেখেছো?

কিন্তু পাশ ফিরে তাকিয়ে সুরমাকে সেখানে দেখতে পেলো না। কোথায় সে? অনুপম হাঁক দিলে—সুরমা!

সুরমা পাশের ঘর থেকে বললে—যাই। কোন জুতোটা পরবে আজ?

--গেছে আবার জুতো বুরুশ করতে! বেশ একটু বিরক্তির সুরেই বললে অনুপম।

একটু পরে সুরমা একজোড়া চকোলেট রঙের জুতো হাতে ক'রে ঢুকলো। ঝকঝক করছে আয়নার মতো। জুতোটা নামিয়ে রেখে বললে—ওঠো এখন।

অনুপম খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টালো; কথাটা তার কানে গেছে কিনা বোঝা গেলো না। সুরমা টেবিলের কাছে স'রে এসে বললে—বারোটা বাজে যে।

অনুপম তবু চুপ। এত গভীর মন দিয়ে খবর-কাগজে কী পড়ছে সে-ই জানে। চেয়ারের পিঠের উপর তার পাৎলুন, কোট, নেকটাই সব সাজানো, সেগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া ক'রে সুরমা আবার বললে—ওঠো না! •

এবার অনুপম জবাব দিলে—কী যে বিরক্ত করো! আপিশের বাঁধা কাজ তো নয় যে দশটা বাজতেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে।

—কাল তো দশটা না-বাজতেই বাড়ি মাথায় ক'রে তুলেছিলে। একটু ঝাঁঝালো স্বরেই বললে সুরমা। ঝাঁঝের কারণ ছিলো। কাল আপিশে বেরোবার আগে অনুপমের নতুন নেকটাই খুঁজে পাওয়া যায়নি—তাই নিয়ে কী কাণ্ড! সুরমা একাই নয়, তার শাশুড়ি, তার ইশকুলগামী ছোটো ননদ সকলকেই হাঁকে-ডাকে বিপর্যস্ত ক'রে অনুপম শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলো যে এমন বিশৃঙ্খল বাড়িতে মানুষের বসবাস অসম্ভব। স্বয়ং শ্বশুরমশাই আপিশে বেরোবার মুখে বলেছিলেন—কী বিশ্রী মেজাজ হয়েছে ছেলেটার। তা তোমারাও তো আগে থেকেই ওর কাপড়চোপড়গুলো একটু…

লজ্জায় সুরমা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। স্বামীর তুচ্ছতম সুখ-সুবিধার জন্য সে তো প্রাণপণ করে, তবে মানুষ যদি এমন হয় যে পুরোনো চিঠি-পত্রের দেরাজে নতুন নেকটাই ঢুকিয়ে রেখে তারপর বাড়িসুদ্ধ লোকের উপর মেজাজ ফলিয়ে বেড়ায়···

সেইজন্য আজ সকালবেলাই সে কাপড়চোপড় সব ঠিক ক'রে রেখেছে, কিন্তু আজ অনুপমের তাড়া নেই। একটু পরে বললে—আজ কি তাহ'লে বেরোবেই না?

অনুপম গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে বললে—উঠছি। কিন্তু তার ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না।

টেবিলের উপর কয়েকটা জিনিশ নিয়ে অকারণে নাড়াচাড়া করতে-করতে সুরমা বললে—কাজে এ-রকম গাফিলি করা কি ভালো? মাসের শেষে মাইনে তো ওরাই দেবে!

—ওঃ, তা দিলেই বা। আমাদের তো আর দশটার সময় আপিশে হাজিরা দিতে হয় না। আমাদের হ'লো ফীল্ড-ওঅর্ক। নিজের ইচ্ছে-মতো কাজ।

—তা হোক, বিছানায় শুয়ে থাকলে কোনো কাজই তো হবে না।

অনুপম হঠাৎ চ'টে উঠে বললে—আমার ইচ্ছে শুয়ে থাকবো। আমার শোয়া-বসাও তোমার হুকুমে হবে নাকি?

—আমার হুকুমে হবে কেন? সমস্ত সংসারটাই হুকুমে চলছে। ইচ্ছে-মতো শোয়া-বসা কার আছে?

—ওঃ ভারি তো একশো-পঁচিশ টাকার চাকরি— ছেড়ে দিলেই বা কী?

এবার সুরমার মুখে সত্যি-সত্যি আশঙ্কার ছায়া পড়লো।—বলো কী, এমন ভালো চাকরিটা ছেড়ে দেবে। ভালো ক'রে কাজ তো আরম্ভই করলে না এখনো।

অনুপম যেমন হঠাৎ চ'টে উঠেছিলো, তেমনি হঠাৎ নরম হ'য়ে বললে, না, না, ছাড়বো কী! উঠি এবার। ব'লে সে সত্যি-সত্যি উঠে বসলো।

সুরমা আশ্বস্ত বোধ করলো, তবু না-ব'লে পারলো না—দ্যাখো, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ ছেড়ে-টেড়ে দিয়ো না কিন্তু। শ্বশুরমশাই তাহ'লে মনে বড়ো কষ্ট পাবেন।

আর-কোনো কথা সুরমা বলতে পারলো না; তার নিজের দিকটা মনে এলো না তার, অনুপমের দিকটাও না, শ্বশুরের কথাই মনে হ'লো। বয়সের চাইতে বেশি বুড়ো হয়েছেন। সরকারি চাকরিতে পেনশন নেবার আর দু'চার বছর বাকি। দেড়শো টাকাতে পেনশন নেবেন—তখন এই বৃহৎ সংসার চলবে কেমন ক'রে? সারাজীবনের সঞ্চয় নিঃশেষ ক'রে টালিগঞ্জে এই ছোটো বাড়িটি করেছেন। তার উপর বিস্তর দেনা। আশ্রিত, অতিথি, নিঃসম্বল আত্মীয়ের অভাব নেই। নিজের পড়ুয়া ছেলে, অবিবাহিত

মেয়ে আছে এখনো। অনুপম বড়ো ছেলে। বছর চারেক আগে বি. এ. পাশ করেছে। বিয়ে হয়েছে বছর-খানেক। বিবাহটা মা-বাপের কর্তব্যসম্পাদন। সুরমা খুব সুখে আছে শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুর-শাশুড়ি অত্যন্ত স্নেহ করেন। এত স্নেহ করেন ব'লেই শ্বশুরের জন্য তার এত কষ্ট হয়। 'উপার্জন একজনের, দাবি দশজনের। বুড়ো ভদ্রলোক একটা শার্ট ছিঁড়ে গেল সহজে আর-একটা কেনেন না। অথচ পুত্রবধূর জন্য ঘন-ঘন শাড়ি কেনা হচ্ছে --পাছে ছেলের মনে কষ্ট হয়। সুরমার ভারি লজ্জা করে।

অনুপমই একমাত্র আশা। কিন্তু···আজকালকার দিনের সাধারণ বি. এ পাশ ছেলে, কতটুকু আশা তার, কতটুকু মূল্য? সেরা পাশিয়েরা খাবি খাচ্ছে। তাই ব'লে অনুপমের কোনো উৎকণ্ঠাও নেই। সে দিব্যি খায়-দায় ঘুমোয়, বিকেলে হাওয়া খেতে বেরোয়, সিনেমাও ত্যাখে। এই পরম নিশ্চিন্ত ভাবটা সুরমার ভালো লাগে না। আজকালকার দিনে কি নিজের উপর মমতা করলে চলে! জীবন পণ ক'রে খাটতে হবে···অমনি ক'রেই কিছু হ'য়ে যাবে। কী আর হবে? কতটুকু হবে? যেটুকুই হোক, বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা হবে তো। তাছাড়া, শুয়ে-ব'সে কি আর পুরুষমানুষের দিন কাটে? না কি মেয়েদেরই কাটে? না কি সেটা ভালোই দেখায়?

তবে কিছুদিন থেকে অনুপমের ভাবটা যেন বদলেছে। বাড়ি থেকে সে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যায় সাড়ে-দশটা বাজতেই, ফিরে যখন আসে তখন প্রায় সন্ধে। তার রোদে-পোড়া ক্লান্ত মুখ দেখে সুরমার ভারি কষ্ট হয়। কিন্তু এই তো পুরুষের জীবন··· মনে-মনে তার কেমন-একটা আনন্দে-মেশা গর্বও হয়। সে নিজে···সে তো দুপুরবেলা ঠাণ্ডা পাটিতে প'ড়ে ঘুমিয়েছে, কিন্তু এ ছাড়া আর কী করবে সে? সে অতি সাধারণ স্ত্রীলোক···তাকে দিয়ে সংসারের যা-যা কাজ হ'তে পারে, তাতে সে কখনো ত্রুটি হ'তে দেয় না। অনুপম ফিরে এসেই চা তৈরি পায়, স্নান করতে যাবার সময় কাপড়ের জন্য হাৎড়াতে হয় না, বাথরুমের আলনায় সব সাজানো আছে। এর বেশি সুরমার সাধ্য নেই, সাবেকি পরিবারের আড়ালে-আবডালে সে মানুষ হয়েছে, বৃহৎ পুরুষ-পৃথিবীর কোনো ব্যাপারই সে জানে না; সে গেঞ্জি কেচে দিয়ে ধোবার খরচ বাঁচাতে পারে, দশবার ঘর ঝাঁট দিয়ে স্বামীর মেজাজ ভালো রাখতে পারে, দিতে পারে জুতো বুরুশ ক'রে, দরকার হ'লে সুখাদ্য রেঁধে খাওয়াতে পারে—এই পর্যন্ত। সুরমার বাপের বাড়ি বড়োলোক নয়, টানাটানির সংসারকে নিজের বুদ্ধি আর পরিশ্রম দিয়েই সুশ্রী ক'রে তুলতে সে তার মা-কে দেখেছে। সে-ও কি তা পারবে না?

রাত্রে সে স্বামীকে জিগেস করে—কোথায় থাকো সারাদিন?

অনুপম গম্ভীরভাবে শুধু একটি কথা বলে—কাজ। এর চাইতে মহৎ কথা আজকালকার ভাষায় নেই।

—সুবিধে হচ্ছে কিছু ?

—চেষ্টা তো করছি। দেখি কী হয়। অনুপম তার কথায় বেশ একটা রহস্যের ভাব বজায় রাখে, সুরমা আর প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। আর সত্যি, অনুপম যখন পর-পর পাঁচ-সাতদিন সাড়ে-দশটায় বেরিয়ে গিয়ে নিতান্তই ক্লান্ত চেহারা ক'রে সন্ধেবেলা ফিরতে লাগলো, তখন আর সন্দেহ করবার কোনো উপায় রইলো না যে সত্যি-সত্যি সে এবার কর্মক্ষেত্রে নেমেছে।

তারপর একদিন সে তার স্ত্রীকে চুপি-চুপি বললে—কাউকে বোলো না এখন, একটা চাকরি পেয়েছি।

—পেয়েছো সত্যি ?

অনুপম একটা ইনশিওরেন্স কোম্পানির নাম করলে। সেখানে, জানা গেলো, তাকে একটা চাকরি নেবার জন্যে সাধাসাধি করছে অনেকদিন থেকে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে বনিবনাও হচ্ছিলো না। এবারে রফা হয়েছে—বেশি কিছু নয়, একশো-পঁচিশ দেবে গোড়াতে। ছ' মাস পরে কাজকর্ম দেখে বাড়িয়ে দেবার কথা। তাছাড়া কমিশন। মোটর-অ্যালাউএন্স গোটা পঞ্চাশ দিতেও রাজি আছে, তবে গাড়ি তো···

এখানে বাধা দিয়ে সুরমা বলেছিলো—বলো কী ! সত্যি ?

অনুপম অবিচলিতভাবে বললে—নেহাৎ মন্দ না, কী বলো ? আমি অনেক ভেবে-চিন্তে আজ রাজি হ'য়ে এসেছি।

—রাজি হবে না ! সুরমা এবার রীতিমতো উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। যে দিনকাল পড়েছে, কত সব ভালো-ভালো এম-এ. পাশ ছেলে পঞ্চাশ টাকার জন্যে ঘুরে মরছে—আর এ তো চমৎকার ! ক'টা লোক আজকাল একশো টাকা রোজগার করে ! তার উপর আবার কমিশন দেবে, অ্যাঁ ?

অনুপম বললে এম.-এ পাশ হ'লেই তো হ'লো না, কাজের লোক হওয়া চাই ! ইনশিওরেন্স কোম্পানি বিদ্যা বোঝে না, কাজ বোঝে।

—তা কাজটা কী করতে হবে ?

—ওঃ, কাজ ! কাজ বিশেষ-কিছু নয়। আমার অধীনে সব এজেন্ট থাকবে, তারা বিজনেস জোগাড় করবে, তাদের একটু দেখাশোনা করতে হবে, এই আরকি। ভাবছি ছ'মাস পরে ছোটো একটা গাড়িই কিনে ফেলবো। বাইরে ঘোরাঘুরি আছে কিছু।

মাইনে ভালো, অথচ কাজ কিছু নেই। সুরমার ঠিক যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না।

আর এমন-একটা সুখের কাজ বাংলাদেশের এত ছেলেকে এড়িয়ে তার স্বামীর হাতে কেমন ক'রে এলো, ভাবতে রীতিমতো অবাক হ'লো সে। তা অবাক হ'য়ে আর কী হবে—মানুষের কপাল যখন ফেরে, তখন এই রকমই।

—কাউকে বলতে বারণ করলে কেন?—সুরমা নিজের সৌভাগ্য একা-একা সহ্য করতে পারছিলো না—হ'য়েই তো গেছে।

—হ'য়ে গেলোই বা। কাজকর্মের ব্যাপার—বাইরে বেশি বলাবলি না-করাই ভালো।

—আহা, বাইরে আমি কাকে আর ঢাক পিটিয়ে বেড়াবো। শ্বশুরমশাইকে বলেছো?

—না, বলিনি এখনো। বাবার ইচ্ছে ছিলো আমি গবর্মেণ্টের চাকরিতে ঢুকি, হয়তো তিনি খুব খুশি হবেন না। হাজার হোক, সামান্য কোম্পানির চাকরি বই তো নয়।

—কী যে বলো! সামান্য হ'লো কিসে! আর গবর্মেণ্টের চাকরি চাইলেই যে পাওয়া যাচ্ছে তা তো নয়। শ্বশুরমশাই খুবই খুশি হবেন, দেখো।

হ'লেনও। অনুপমের এ-কাজে বিলিতি কাপড়চোপড় না-হ'লে নাকি চলবে না, ও-সব করাতে গোটা পঞ্চাশ টাকা খরচ হ'য়ে গেলো। হেমবাবু ধার ক'রে এনে দিলেন টাকাটা। তারপর কয়েকদিন সেই শ্বেতাঙ্গ বেশে অনুপম নিয়মিত যাতায়াত করলো—ইতিমধ্যে গোটা দুই নতুন টাই কেনা হ'য়ে গেলো। সুরমা বিছানার তলায় পাৎলুন ভাঁজ ক'রে রাখে, টাই মোজা রুমালের হিশেব রাখে, আর বাড়ির মধ্যে সারাদিন অকারণে অফুরন্ত কাজ ক'রে বেড়ায়।

আজ তাই স্বামীকে খাওয়ার পর শুয়ে পড়তে দেখে সে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলো। রোজ নির্দিষ্ট সময়ে আপিশে না-গেলেও হয়তো চলে, কিন্তু একেবারে শুয়ে থাকলে চলে কি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুপম উঠলো, উঠে একটা পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে বললে—চললুম।

—আজ স্যুট পরবে না?

—না, যা গরম।

স্বামীর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে সুরমার একটু কষ্ট হ'লো। ভাদ্রমাসের রোদ্দুর সমস্ত গায়ে পিন ফুটিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে বেরুনো! তাই সে বললে—আজ না-বেরোলেও চলে নাকি?

—বেরোলেও হয়, না-বেরোলেও হয় শরীরটা আজ মোটে ভালো লাগছে না।

—তাহ'লে আজ আর না-বেরোলে। একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও।

অনুপম হেসে বললে—ছুটির জন্য দরখাস্ত পাঠাতে হয় না, আমাদের যতদিন খুশি না-গেলে কেউ কিছু বলবার নেই।

—বলো কী! যতদিন খুশি না-গেলেও চলে ?

—তা চলে বইকি। ওদের কাজ পাওয়া দিয়েই কথা।

—কাজটা তাহ'লে ওরা কেমন ক'রে পাবে ?

—তুমি তা বুঝবে না।

সুরমা আর-কিছু বললে না। সত্যি, কাজটা যে কী-রকম তা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। অনুপমও আর কথা না-ব'লে পাঞ্জাবিটা খুলে রেখে এসে শুয়ে পড়লো। উঠলো যখন, পাঁচটা বেজে গেছে। সুরমা চা ক'রে এনে দিলে। চা খেয়ে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় প'রে অনুপম বেরিয়ে গেলো বোধহয় কোনো বন্ধুর বাড়িতে।

তার পরের দুটো দিন এইভাবেই কাটালো সে। সুরমা মাঝে-মাঝে দু'একবার তাড়া দিলে, কিন্তু অনুপম নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে বললে—তুমি তো দেখছি ভারি ছেলেমানুষ! এজেন্টরাই সব কাজ করে যে। আমার বেরোবার কী-দরকার। এই তো আজ বিকেলেই দু'জনের আসবার কথা আছে আমার কাছে।

সত্যিও সেদিন বিকেলে দু'টি ছেলে এলো তার কাছে। অনুপম তাদের সঙ্গে ব'সে-ব'সে অনেকক্ষণ কথা বললে। সুরমা চা পাঠালো, খাবার পাঠালো, পান পাঠালো।

ভারি খুশি হ'লো সে মনে-মনে।

পরের দিন সকালে ন'টা না-বাজতেই অনুপমের বেরোবার তাড়া লেগে গেলো। আজ তাকে যেতে হবে ভাটপাড়া, সেখানে একজন বড়োদরের মক্কেলের খোঁজ পাওয়া গেছে। অসম্ভব তাড়াহুড়ো ক'রে, কোনোরকমে দুটো গরম ভাত আর মাছের ঝোল গলাধঃকরণ ক'রে, পোশাক প'রে, মা-র কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে সে বেরিয়ে গেলো। তার কিছুই খাওয়া হয়নি ভাবতে পরে সুরমাও ভালো ক'রে খেতে পারলো না—তিনটে না-বাজতেই উঠে স্টোভ ধরিয়ে নানারকম খাবার তৈরি করতে বসলো।

এদিকে অনুপম আপিশে গিয়ে খবর পেলো ভাটপাড়ার ভদ্রলোককে অন্য কোম্পানির লোক পাকড়ে ফেলেছে। ব'সে-ব'সে আড্ডা দিলো ঘণ্টা তিনেক, তারপর আর-একজনের সঙ্গে বেরিয়ে ক্লাইভ স্ট্রিটে এ-আপিশ ও-আপিশ ঘুরে বেড়ালো যেখানে যত চেনা লোক আছে। কোথাও এক পেয়ালা চা, কোথাও পান, নানারকম

লাখ-বেলাখের গল্প, সময়টা কাটলো মন্দ না। কিন্তু রোদ্দুরে ঘুরতে আর ভালো লাগে না, যা-ই বলো।

বিকেলে বাড়ি ফিরে যখন চা খাচ্ছে, সুরমা জিগেস করলে—কেসটা পেলে?

—কোন··· ?

—ভাটপাড়ায় গেলে যে ?

অনুপম বলতে পারলো না যে ভাটপাড়ায় সে যায়নি। সংক্ষেপে বললে—আর-একদিন যেতে হবে।

—কবে যাবে ? কাল ?

—এত খবর দিয়ে তোমার দরকার কী ? আমার কাজ আমি ভালো বুঝি।

পরের দিনও সে যথাসময়ে রাজবেশ প'রে বেরুলো, যথাসময়ে ফিরে এলো। তারপর একদিন সে সুরমাকে বললে—আর-একটা অফর পেয়েছি, এর চেয়ে ভালো।

—কী-রকম ?

—এক ভদ্রলোক একটা বিজনেস করবেন, আমাকে পার্টনর ক'রে নিতে চান। লায়ন্স রেঞ্জে আপিশের ঘর খোঁজা হচ্ছে। এখন অবশ্য মাত্র হাজার দশেক নিয়ে আরম্ভ হবে—তবে ভদ্রলোক কুড়ি হাজার পর্যন্ত ফেলতে রাজি। তাঁর নিজের আরো অনেক কাজ আছে—আমাকেই ম্যানেজর হ'তে হবে। আপিশে আলাদা ঘরে বসবো, টেলিফোন থাকবে, বাড়িতেও রাখতে হবে একটা। তুমি যখন-তখন দরকার হ'লে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। বেশ ভালো—কী বলো ?

সুরমা জিগেস করলে—ব্যবসাটা কিসের ?

—সে নানারকম। ঐ ভদ্রলোকের দশরকম ব্যবসা আছে কলকাতায়—কাগজ, কাঠ, কয়লা, তাছাড়া একটা জুয়েলারি দোকানও আছে। বিস্তর পয়সা ওর, পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেলতেও আটকাবে না। আমাকে গোড়াতে দু'শো দেবে, আস্তে-আস্তে পাঁচশো পর্যন্ত উঠবে। লাভের উপর আমার টু পর্সেন্ট শেয়ারও থাকবে, তাইতে বা কোন না দু' হাজার হবে বছরে। আর আপিশের গাড়িটা অবশ্যি আমার জন্যেই থাকবে। আমাদের কয়েকজন কেরানি দরকার—আছে নাকি তোমার জানাশোনা কোনো ছেলে-ছোকরা ?

সুরমা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে—তুমি তাহ'লে ইনশিওরেন্সের কাজটা ছেড়ে দেবে ?

—ছেড়ে দেবো না তো কী ! ঐ মাইনেতে কোনো ভদ্রলোকের কি চলে ! আর যা খাটুনি ! রোদ্দুরে ঘুরে-ঘুরে হয়রান।

—তা যেখানেই যাও, ব'সে-ব'সে তো তোমাকে কেউ খাওয়াচ্ছে না।

—তুমি কিছু বোঝো না। এটা কত ভালো। আপিশটাই আমার, সবই আমার ইচ্ছে-মতো হবে। আমার পার্টনর নিজে বিশেষ-কিছু দেখতে-শুনতে পারবেন না, আমি রাজি হয়েছি ব'লেই তিনি ব্যবসাটা ফাঁদবেন।

—অত বড়ো একটা ব্যবসা চালাতে তুমি পারবে তো? ব্যবসাতে তো খাটুনি সবচেয়ে বেশি শুনি।

—ওঃ, সে ঠিক হ'য়ে যাবে দু'দিনেই। দু'চারখানা বইপত্র দেখে নিলেই হবে। তাছাড়া আমার নিজের তো বিশেষ-কিছু করতে হবে না, আমার অধীনে কেরানিরাই থাকবে। শিগগিরই আমরা আরম্ভ ক'রে দেবো কাজ—আপিশের একটা ভালো ঘর পেলেই হয়।

হঠাৎ সুরমার কী-রকম একটা সন্দেহ হ'লো। জিগেস করলে—ইনশিওরেন্সের কাজটা তুমি ছেড়েই দাওনি তো?

অনুপম মুচকি হেসে বললে—তা একরকম ছেড়েই দিয়েছি বলতে পারো।

সুরমার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। ক্ষীণস্বরে বললে—একেবারে ছেড়েই দিলে! ওটার তো এখনো ঠিক নেই। শ্বশুরমশাইকে একবার জিগেসও করলে না!

—ওঃ, বাবাকে আবার জিগেস করবো কী। এ-সব ব্যাপারের উনি বোঝেনই ভারি। তাছাড়া, কিছু ঠিক নেই বলছো কেন? কোম্পানি শিগগিরই রেজিস্টর্ড হবে। আরে ভাবছো কেন—বাবার দুঃখ এতদিনে দূর হ'লো। বাবাকে আর এক বছরের বেশি চাকরি করতে দেবো নাকি ভেবেছো!

কথাটা শুনে সুরমা রোমাঞ্চিত হ'লো, কিন্তু ছোট্ট একটু সন্দেহ তার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছিলো না। তাই সে বললে—কিন্তু ব্যবসা তো, তার নিশ্চয়তা কী? বাঁধা একটা চাকরি হুট ক'রে ছেড়ে দিলে!

—ভারি তো বাঁধা চাকরি! ব্যাটারা ভারি পাজি, ছোটোলোক, কথা দিয়ে কথা রাখে না, টাকা-পয়সা কিছু দিতে চায় না!

সুরমা অবাক হ'য়ে বললে—বলো কী! চাকরিতে কখনো মাইনে না-দিয়ে পারে! মাস পুরলে নিশ্চয়ই দেবে। তুমি ওদের সঙ্গে খামকা ঝগড়া করোনি তো?

এবারে অনুপম বেশ উত্তেজিত স্বরেই বললে—ওদের যা ব্যবহার, তাতে ঝগড়া না-ক'রে পারা যায় না। আছে, ভিতরে অনেক ব্যাপার আছে। মান-সম্মান নিয়ে ওদের কাজ করা যায় না। দিয়েছি আজ খুব দু'কথা শুনিয়ে।

সুরমা হতাশ স্বরে বললে—তাহ'লে ছেড়েই দিয়েছো!

অনুপম একটু হেসে বললে—আহা, তুমিও যেমন! এমন একটা ভাব করছো যেন কত বড়ো একটা লোকশান। ও-রকম চাকরি পথে-ঘাটে অনেক ছড়িয়ে থাকে।

কথাটা আসলে সত্য, কেননা বীমার দালালি আজকাল চাইলেই পাওয়া যায়। কিন্তু যতখানি কাজ করতে পারলে তা থেকে মাসে পঞ্চাশটা টাকাও উপার্জন করা যায়, অনুপমের পক্ষে তা অসম্ভব। অবশ্য আসল কথাটা জানে না ব'লেই সুরমা চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে বললে—বলো কী! আজকালকার দিনের পক্ষে ও তো চমৎকার চাকরি ছিলো। আমি তো মনে করি ও-রকম একটা কাজ পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অনুপম তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—তুমি তা-ই মনে করতে পারো, আমি করিনে। তাছাড়া, কত একটা বড়ো কাজে যাচ্ছি। হ্যাখো না দু-পাঁচ বছরে কী হয়। শোনো—ভদ্রলোক বলছেন আমাকেও কিছু টাকা ফেলতে। বেশি নয়, হাজার পাঁচেক। তাহ'লে লাভের টেন পর্সেণ্ট দিতে রাজি। টেন পর্সেণ্ট মানে জানো? বছরে হাজার কুড়ি তো বটেই। বলবো নাকি বাবাকে একবার?

সুরমা ঠাণ্ডা গলায় বললে—দেখতে পারো ব'লে।

একটু যেন দ্বিধা ক'রে অনুপম বললে—আচ্ছা, তোমার বাবা কি কিছু দিতে পারেন না?

সুরমা ম্লান হ'য়ে গিয়ে বললে—আমার বাবা গরিব মানুষ, তিনি অত টাকা কোথায় পাবেন?

একটু যেন লজ্জিতভাবেই অনুপম বললে—আচ্ছা, থাক, থাক। এমনি একটা কথার কথা বলছিলাম। তুমি কিছু ভেবো না। এ-ব্যবসায় লাভ আমাদের হবেই। অবশ্য রিস্‌ক্ যে কিছু নেই তা নয়—রিস্‌ক্ সব ব্যবসাতেই আছে—তা একটু রিস্‌ক্ না-নিলে জীবনে কি বড়ো হওয়া যায়! তুমিই বলো!

সুরমা আবার জিগেস করলে—ব্যবসাটা কিসের?

এবারেও অনুপম জবাব দিলে—আছ নানা রকমের।

—ইনশিওরেন্সের কাজটা এ-ক'দিন ক'রেই ছেড়ে দিয়ে ভালো করলে কিনা কে জানে। কিছুদিন করলে হয়তো ভালো লাগতো। মোটে তো ভালো ক'রে করলেই না।

—আরে ছি, ছি, এ-কাজ কি ভদ্রলোকে করতে পারে! দু'দিনেই ঘেন্না ধ'রে গেছে! বললুম না তোমাকে, ওরা অত্যন্ত বদ লোক—কথায়-কথায় অপমান করে।

—তা এ-ক'দিনের মাইনে দিয়ে দিয়েছে তো?

—তা দিলেও তো বুঝতুম। কিছু না, এক পয়সাও না।

—বলো কী, এ-ক'দিন খাটিয়ে নিলে, তার মজুরি দিলে না! এ কি সম্ভব নাকি?

—ওদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

—বাঃ, এমন কথা তো কোনোদিন শুনিনি। আইন আছে কী করতে? একটা উকিলের চিঠি দাও—বাপ-বাপ ক'রে টাকা দিয়ে দেবে।

—ব'য়ে গেছে এখন আমার সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য অত হাঙ্গামা করতে। বিজনেস-এর জন্য এখন ভয়ানক খাটতে হবে কিছুদিন। অত সময় কোথায় আমার!

—তাই ব'লে তুমি চুপ ক'রে এ-ও সহ্য করবে?

—খুব দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে চ'লে এসেছি—আবার কী? আমাদের ব্যবসাটা জাঁকিয়ে উঠুক, তখন ঐ পচা কোম্পানির ম্যানেজরকে কেরানি রাখবো।

এর পর কয়েকদিন অনুপমকে সত্যি খুব ব্যস্ত দেখা গেলো। দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার সে বেরোয় আর বাড়ি ফেরে। অদ্ভুত সব জায়গায় এনগেজমেণ্ট থাকে তার। টেলিফোন ছাড়া কাজের বড্ড অসুবিধে হচ্ছে, সামনের মাসের গোড়ার দিকেই আনিয়ে ফেলবে একটা। কিছুদিন তার পকেটে কিছু টাকা-পয়সাও ঝনঝন করলো। তাছাড়া পকেটে তার প্রায়ই সচিত্র পুস্তিকা দেখা যায়—মোটরগাড়ির ক্যাটালগ। আপিশের গাড়ি কেনা হবে—সে-ভারও তারই উপর পড়েছে।

দিন পনেরো কাটলো এইভাবে। ততদিনে সুরমারও প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়ে এসেছে যে ব্যাণিজ্যেই বসতে লক্ষ্মী। এখন ভালোরকম সব চললেই হয়।

রাত্তিরে শোবার সময় ছাড়া অনুপম আজকাল প্রায় বাইরে-বাইরেই থাকে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর পাছে ভেঙে পড়ে, সে-ভাবনায় তার মা অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে থাকেন। কিন্তু অনুপমের সে-সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই তার। তার নামে বড়ো-বড়ো খামে টাইপ-করা চিঠিপত্র আসে, নানা রকমের লোক আসে বাড়িতে। হ্যাঁ—এ না-হ'লে আর ব্যবসা কী! সুরমা ভাবে, এতদিনে তার স্বামী নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে, একদিন সত্যি-সত্যি বিরাট কিছু হ'য়ে বসা আশ্চর্য নয়। কার মধ্যে কী থাকে বলা তো যায় না।

আরো কিছুদিন গেলো। তারপর একরাত্রে শুয়ে-শুয়ে অনুপম বললে - দ্যাখো, কলেজ স্কোয়ারের কাছে পাঁচশো টাকায় একটা চায়ের দোকান বিক্রি হচ্ছে। ভাবছি বাবাকে ব'লে সেটা কিনে ফেলি। পাঁচশো টাকা তিনি নিশ্চয়ই দিতে পারবেন?

সুরমা অবাক হ'য়ে বললে—কেন, চায়ের দোকান কিনে তুমি কী করবে?

—কী আবার করবো। চালাবো। মাসে দু'শো টাকা নেট প্রফিট।

—বলো কী! মাসে দু'শো টাকা যাতে লাভ, সে-দোকান পাঁচশো টাকায় ছেড়ে দিচ্ছে! লোকটা কি পাগল?

সঙ্গে-সঙ্গে সুর নামিয়ে অনুপম বললে—না, ঠিক দু'শো হয়তো হবে না। দেড়শো—হ্যাঁ, একশো তো হবেই। ব'লে-ক'য়ে পাঁচশোতেই রাজি করাতে পারবো বোধহয়। লোকটার ব্যামো হয়েছে, পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে চ'লে যেতে চায়।

—তোমার হাতে সেই কোম্পানি তো রয়েছে—এত বড়ো ব্যবসা—

—হ্যাঁ, বিজনেসটা রয়েছে বটে। তা চায়ের দোকানটাও থাক না। গোটা কুড়ি টাকা মাইনে দিয়ে একটা লোক রেখে দিলেই হবে। আমি তো নিজে গিয়ে দোকানে বসতে পারবো না। বুঝলে না—চার-পাঁচটা কলেজের কাছে কিনা, ছাত্রদের ভিড় খুব হয়। বেশ লাভ।

—নিজে না-দেখলে দোকান চলে না।

—হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে গিয়ে দেখে আসবো বইকি। কালই বলবো বাবাকে। আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে একটা ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁও ক'রে তোলা যায়। তাহ'লে অবশ্য চৌরঙ্গি পাড়ায় তুলে আনতে হয়।

হঠাৎ সুরমার মনে পড়লো সেই ব্যবসার কথা স্বামীর মুখে কিছুদিন শোনা যাচ্ছে না। কেমন একটা ভয়ের ভাব এলো তার মনে, খুব নিচু গলায় জিগেস করলে- তোমাদের ব্যবসা কবে থেকে আরম্ভ হবে?

—জোগাড়যন্ত্র চলেছে। এ-প্রসঙ্গে অনুপমের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেলো না।

—এ-মাসের প্রথমেই আরম্ভ করবার কথা ছিলো না?

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এইভাবে অনুপম বললে—চায়ের দোকানটাই কিনে নেবো। আমাদের কালীপদ বেশ বিশ্বাসী লোক, তাকেই বসিয়ে দেয়া যাবে। ও তো বাড়িতে আট টাকা মোটে মাইনে পাচ্ছে, আমি কুড়ি টাকা দেবো—আচ্ছা, না-হয় পঁচিশই দেয়া যাবে। ওর পক্ষে কত বড়ো একটা লিফ্‌ট ভাবো তো।

বোধহয় সেই কথাই ভাবতে-ভাবতে অনুপম খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়লো।

আরো কয়েকমাস কাটলো। অনুপম যেদিন খুশি বাড়িতে প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোয়, যেদিন খুশি পোশাক প'রে বেরোয়। কোথায় যায়? একটি মন্থলি টিকিট নিয়ে শহরের এমন জায়গা নেই যেখানে সে না যায়। বড়োবাজারে তার আনাগোনা, ড্যালহৌসি স্কোয়ারে বহু আপিশে তার ঘন-ঘন আবির্ভাব। কিছু কাজ নেই, সুতরাং সে সবচেয়ে ব্যস্ত। তার পাশ দিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকার স্রোত ব'য়ে চলেছে, সেই ঘূর্ণির মধ্যে ঢোকবার যতবারই চেষ্টা করে, ততবারই ফিরে আসে ধাক্কা খেয়ে। ঘর্মাক্ত ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে এসে বলে—উঃ, এত ভয়ানক পরিশ্রম আর সহ্য হয় না।

সত্যি, অকারণে নিরুদ্দেশে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়ানো —কতদিন মানুষ তা সইতে পারে? কতদিন, আর কতদিন?

তবে এটাও মানতে হবে যে সে এখন বিজনেসম্যান। অবশ্য সেই কুড়ি-হাজারি কোম্পানিটা শেষ পর্যন্ত হ'লো না, সমস্ত ঠিকঠাক হবার পরে যে-লোকটি টাকা দেবে, সে-ই শেষ মুহূর্তে পেছ-পা হ'লো—লোকটাকে শূকরসন্তান বললে কিছুমাত্র অন্যায় বলা হয় না। পৃথিবীর সব লোকই এইরকম—ইতর, অশিক্ষিত, ধূর্ত, স্বার্থপর, প্রতারক—এতগুলো খারাপ লোকের মধ্যে একমাত্র ভালো লোক অনুপমের উপায় কী? তা সেও একটা বিজনেস চালাচ্ছে, ক্লাইভ রো-তে এক বন্ধুর আপিশে গিয়ে একটা চেয়ারে দু' তিনঘণ্টা ব'সে থাকে মাঝে-মাঝে। বিজনেসটা কী, সেটা সুরমা এখনো জানে না, যখন বেশ ফেঁপে উঠবে তখন জানতে পারবে। তবে সেটা চায়ের দোকান নয়। দোকানদারি করাটা ঠিক ভদ্রলোকের কাজ কি? 'দোকানে যাচ্ছি', বলতে কেমন বিশ্রী লাগে না? 'আপিশে যাচ্ছি', কথাটাই বেশ। তাও নিজের আপিশ। অনুপম এখন নিজের আপিশে যাচ্ছে।

এইভাবেই আরো এক বছর কাটলো। হেমবাবু মলিন জিনের কোট প'রে আপিশে যান, আপিশ থেকে ফিরে শুয়ে থাকেন খোলা গায়ে চিৎ হ'য়ে, মাসের পয়লা তারিখে প্রচুর ধার শোধ করেন ও সাত তারিখে আবার ধার করতে ছোটেন। বড়ো ছেলের সঙ্গে বিশেষ দেখাশোনা হয় না তাঁর। একদিন সন্ধ্যাবেলায় অনুপম বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, বাইরের ঘরে বাপের মুখোমুখি প'ড়ে গেলো। সে এড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, হেমবাবু তাঁকে ডাকলেন। একটুখানি কেশে, অত্যন্ত যেন লজ্জিতভাবে বললেন:

—শোন—আমাদের আপিশে একটা চাকরি খালি হয়েছে।

অনুপম চুপ ক'রে রইলো, যেন এ ব্যাপারে তার কিছুই এসে যায় না।

—আমি তোর কথা সাহেবকে বলেছি, তবে যা দিনকাল—

—কী চাকরি?

—মন্দ নয় খুব। পঞ্চাশ টাকা থেকে আরম্ভ—

—ওঃ, পঞ্চাশ টাকা! অনুপম খুব মৃদুস্বরে বললে কথাটা, অসম্ভব আজগুবি কিছু শুনে যেন সে হতবাক হ'য়ে গেছে।

—পঞ্চাশ থেকে সওয়া-শো, তারপর ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় উৎরোলে হয়তো তিনশো পর্যন্ত যাওয়া যাবে। গবর্মেণ্টের বাঁধা স্কেলে আস্তে আস্তে উঠে যাবি—বেশ ভালোই তো।

অনুপম বললে—পঞ্চাশ টাকায় আমার কী হবে!

খুব কুণ্ঠিতস্বরে বললেন হেমবাবু—আপাতত আর-কিছু যখন হচ্ছে না—। আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করিয়ে রেখেছি—কাল সেটা দিতে হবে।

অনুপম বাপের মুখের উপর আর-কিছু বললে না, পরের দিন দরখাস্ত সই ক'রে দিলে। স্ত্রীকে বললে—দুঃখে-কষ্টে বাবার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। আমাকে পঞ্চাশ টাকার কেরানিগিরি করতে বলছেন!

সুরমা বললে—ঐ পেলেই কত লোক আজকাল কৃতার্থ!

—বত লোক তা-ই হ'তে পারে, আমার কথা আলাদা। বিজনেস-এর লাইন আমি ছাড়বো না। আমার একটা স্কীম আছে—সেটা হ'য়ে গেলে তো আর কথাই নেই। দস্তুরমতো গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি জাঁকিয়ে থাকতে পারবো।

স্কীমটা কী, সুরমা তা শুনতে চাইলো না। শুনেই বা কী হবে, সে সামান্য মেয়েমানুষ, ও-সব বড়ো-বড়ো ব্যাপার সে বুঝবে না।

অনুপমই আবার বললে—একটু বুদ্ধি থাকলে কলকাতার শহরে মাসে শো-পাঁচেক রোজগার করা কিছুই না। ত্যাখো না সব মাড়োয়ারিদের—না জানে লেখাপড়া, না পারে ভদ্রলোকের মতো একটা কথা বলতে। একজন মাড়োয়ারির সঙ্গে আলাপ হয়েছে সম্প্রতি, তার কাছে সব ফন্দি-ফিকির শিখে নিচ্ছি। দেখবে আর দু'দিন পরে—হ্যাঁ, আমাকে একটা টাকা দাও তো।

সুরমা বললে—একটা টাকা?

—একটা টাকাও নেই তোমার কাছে?

—আমার কাছে টাকা থাকবে কোত্থেকে?

—কেন, বাজার-খরচ তো তোমার হাতেই আজকাল। আচ্ছা, এক টাকা না পারো আট আনা দাও।

—এক টাকাই দিচ্ছি। নিজের জমানো দু'টি আধুলি সুরমা বা'র ক'রে দিলে। মাঝে-মাঝে এমন দেয়। তার হাতে দু'চার আনা পয়সা যা আসে সব সে সযত্নে জমিয়ে রাখে, যে-কোনো দিন স্বামীর দরকার হ'তে পারে।

পরের দিন হেমবাবু আপিশ থেকে খানকয়েক বই নিয়ে এলেন। অনুপমকে ডেকে বললেন—এগুলো নেড়ে চেড়ে দেখিস তো একটু—ইণ্টরভিয়্যুতে ডাকতে পারে।

—পঞ্চাশ টাকার চাকরি, তার আবার ইণ্টরভিয়ু!

—ইনকম-ট্যাক্সের আইনগুলো একটু দেখে নিস। কিছু জিগেস করলে দু'একটা কথা বলতে পারলেই হ'লো।

—বাবার একদম মাথা-খারাপ হয়েছে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুপম বললে। আমাকে বলছেন ইনকম-ট্যাক্সের বই পড়তে। এখনো যেন আমার পরীক্ষা পাশ করবার বয়েস আছে। হো-হো ক'রে হেসে উঠলো সে, হাসিটা অত্যন্তই উচ্চ।

—ভালোই তো। কখনো একখানা বই তো ছুঁয়েও ছাখো না। তবু একটু পড়াশুনোর চর্চা হবে।

—ওঃ, পড়াশুনো সম্বন্ধে এই তোমার ধারণা! ইনকম-ট্যাক্সের আইন! অনুপম আরো জোরে হেসে উঠলো।

বইগুলো সে ছুঁয়েও দেখলো না। সন্ধেবেলা আপিশ থেকে ফিরে নাকের নিচে চশমা নামিয়ে হেমবাবুই সেগুলো পড়তে বসলেন। রোজই এ-রকম হ'তে লাগলো; যখনই সময় পান, হেমবাবু ব'সে-ব'সে ইনকম-ট্যাক্সের আইনের সমস্ত মারপ্যাঁচ আয়ত্ত করেন। অনুপম তাঁকে একদিন দেখে ফেললো। হাসতে-হাসতে সুরমাকে বললে—দেখেছো বাবার কাণ্ড! তিনি বই পড়লে কি আমার বিদ্যে হবে?

সুরমা শান্তভাবে বললে—ও, সেটা তাহ'লে বোঝো!

—আমাকে দিয়ে ও-সব রাবিশ চাকরি পোষাবে না তা তো আমি ব'লেই দিয়েছি।

তারপর, একদিন আপিশে সাযেবের কাছে তার ডাক পড়লো। না-গেলে বাবা নেহাৎই দুঃখিত হবেন, শুধু সেই কারণেই সাজগোজ ক'রে গেলো সে। ফিরে এসে বললে—সাহেব আমাকে বললে, তুমি আমাদের হেমবাবুর ছেলে, তোমাকে নিতে পারলে তো ভালোই হয়। তা আপাতত এটা নিলে কেমন হয়, বলো তো? বিজনেসটা একটু ফেঁপে উঠলে ছেড়ে দিলেই হবে। হাত-খরচটার জন্য আরকি—বুঝলে না?

সুরমা বললে—আপাতত হাতখরচ ছাড়া আর-কোনো খরচও তো নেই তোমার।

—আহা, কোনোরকমে দিন কাটলেই কি হ'লো! বাবার অবস্থা দেখছো তো। সেই মাড়োয়ারিটা যা বলে তাতে তো মনে হয় ছ'মাসের মধ্যেই খুব সুবিধে হ'য়ে যাবে।

কয়েকদিন পরে অনুপম বাড়ি ফিরে দেখে সুরমার মুখ ভারি গম্ভীর। জিগেস করলে—কী হয়েছে তোমার?

—তোমার চাকরির খবর এসেছে।

—কী খবর? অনুপম খুব তাচ্ছিল্যের সুরেই জিগেস করলে, তবু তার গলাটা একটু কেঁপে গেলো।

—হয়নি। শ্বশুরমশাই ভারি ভেঙে পড়েছেন।

মুহূর্তের জন্য ম্লান হ'য়ে গেলো অনুপমের মুখ। কিন্তু তক্ষুনি আবার বললে—ওঃ, বাঁচলাম। হ'লে মুশকিলই হ'তো—বাবার জন্য না-নিয়েও তো পারতাম না। আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি এখন থেকে শেয়ার মার্কেটেই মন দেবো। এ ছাড়া আর-কিছুতে পয়সা নেই। গোড়াতে হয়তো মাসে দু'শো আড়াইশোর বেশি হবে না—ক্যাপিট্যাল না-থাকার এই তো মুশকিল। তবে বছরখানেক মধ্যে পাঁচশো-মতো সহজেই হ'য়ে যাবে। আমাদের এ-বাড়িটা ভারি ছোটো—এটা ভাড়া দিয়ে তখন বড়ো বাড়িতে যাবো, কী বলো?

১৯৩৮ 'ফেরিওলা'

আবছায়া

আই. এ. পাশ ক'রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন ভর্তি হলাম সেদিন মনে ভারি ফুর্তি হ'লো। বাস্‌রে, কত বড়ো বাড়ি! করিডরের এক প্রান্তে দাঁড়ালে অন্য প্রান্ত ধু-ধু করে। ঘরের পরে ঘর, জমকালো আপিশ, জমজমাট লাইব্রেরি, কমনরুমে ইজিচেয়ার, তাসের টেবিল, পিংপং, দেশবিদেশের কত কাগজ—সেখানে ইচ্ছামতো হল্লা, আড্ডা, ধূমপান সবই চলে, কেউ কিছু বলে না। কী যে ভালো লাগলো বলা যায় না। মনে হ'লো এতদিনে মানুষ হলুম, ভদ্রলোক হলুম। এত বড়ো একখানা ব্যাপার—যেখানে ডীন আছে, প্রভস্ট আছে, স্টুঅর্ড আছে, আরো কত কী আছে, যেখানে বেলাশেষে আধ মাইল রাস্তা হেঁটে টিউটরিঅল ক্লাস করতে হয়, তারও পরে মাঠে গিয়ে ডনকুস্তি না-করলে জরিমানা হয়, যেখানে পর্সেন্টেজ রাখতে হয় না, অ্যানুএল পরীক্ষা দিতে হয় না, যেখান আজ নাটক, কাল বক্তৃতা, পরশু গানবাজনা কিছু-না-কিছু লেগেই আছে, রমনার আধখানা জুড়ে যে-বিদ্যায়তন ছড়ানো, সেখানে আমারও কিছু অংশ আছে, এ কি কম কথা! অধ্যাপকরা দেখতে ভালো, ভালো কাপড়চোপড় পরেন, তাঁদের কথাবার্তার চালই অন্যরকম, সংস্কৃত যিনি পড়ান তিনিও বিশুদ্ধ ইংরেজি বলেন—ঘণ্টা বাজলে তাঁরা যখন লম্বা করিডর দিয়ে দিগ্বিদিকে ছোটেন, তাঁদের গম্ভীর মুখ আর গর্বিত চলন দেখে মনে হয় বিশ্বজগতের সমস্ত দায়িত্বই তাঁদের কাঁধে ন্যস্ত। এ সব দেখে-শুনে আমারও আত্ম-সম্মান বাড়লো, এ-সংসারে আমি যে আছি সে-বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন হ'য়ে উঠলুম। মন গেলো নিজের চেহারার দিকে, কেশবিন্যাস ও বেশভূষা সম্বন্ধে মনোযোগী হলুম। শার্ট ছেড়ে পাঞ্জাবি ধরলুম, সদ্যোজাত দাড়িগোঁফের উপর অকারণে ঘন-ঘন ক্ষুর চালিয়ে ছ'মাসের মধ্যেই মুখমণ্ডলে এমন শক্ত দাড়ি গজিয়ে তুললুম যে আজ পর্যন্ত কামাতে ব'সে চোখের জলে সেই স্বকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তখন অবশ্য ভবিষ্যতের ভাবনা মনে ছিলো না, বালকত্বের খোলশ ছেড়ে খুব চটপট যুবা বয়সের মূর্তি ধারণ করাই ছিলো প্রধান লক্ষ্য।

এর অবশ্য আরো একটু কারণ ছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ছাত্রীও ছিলেন। ওখানকার নানারকম অভিনবত্বের মধ্যে এ-জিনিশটাই ছিলো আমার চোখে—প্রায় সব ছেলেরই চোখে—সবচেয়ে অভিনব। যখনকার কথা বলছি, তখনও মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার বান ডাকেনি, সমস্ত বিদ্যালয়ে পাঁচটি কি ছ'টি মেয়ে ছিলো সব সুদ্ধু। আমাদের সঙ্গে অপর্ণা দত্ত নামে একজন ভর্তি হয়েছিলো।

পাৎলা ছিপছিপে মেয়ে, শ্যামল রং, ফিকে নীল শাড়ি প'রে কলেজে আসতো। দু'শো ছেলের সঙ্গে ব'সে একটিমাত্র মেয়ের বিদ্যাভ্যাস ব্যাপারটা বিশেষ সোজা নয়, বিশেষ যখন ক্লাশে ছাড়া আর সবখানেই ছেলেদের থেকে তাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ক'রে রাখার আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা থাকে। অপর্ণার কেমন লাগতো জানি না, কিন্তু আমার ওর জন্য দুঃখ হ'তো। ছেলেদের মধ্যে ওকে নিয়ে নানারকম আলোচনা শুনতুম, তার সবগুলো বলবার মতো নয়। তাদের ভদ্রতার আদর্শ সমান ছিলো না। মনের মধ্যে যে-চাঞ্চল্যটা স্বাভাবিক কারণেই হ'তো, সেটাকে ব্যক্ত করবার উপায়ও ছিলো এক-এক জনের এক-এক রকম, বেশির ভাগ শুধু কথা ব'লেই খুশি থাকতো—অর্থাৎ জীবনে যা ঘটবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, নিজের মনে সে-সব কল্পনা ক'রে নিয়ে গল্প করতো; কয়েকজন দুঃসাহসী কোনো-না-কোনো অছিলায় মেয়েদের কমনরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে অপর্ণার সঙ্গে আলাপ ক'রে এলো; আর কেউ-কেউ ছিলো একেবারে চুপ। ব'লে রাখা ভালো, আমি ছিলুম এই শেষের দলে। ক্লাশে আমি বসতুম সব-শেষের বেঞ্চিতে; অনেক[illegible] মাথার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ কখনো-কখনো অপর্ণাকে আমার চোখে পড়[illegible] স্বতন্ত্র চেয়ারে ব'সে খোলা বইয়ের দিকে তাকিয়ে, একটি হাত গালের [illegible] বাঁধানো ছবির মতো সেই মুখ, বসবার সেই ভঙ্গিটি আমার মুখস্থ[illegible] এখনো মনে করতে পারি। সরু হাতে একটি মাত্র চুড়ি[illegible] পাড় মুখখানাকে ঘিরে আছে। লক্ষ্য করতুম অপর্ণা অ[illegible] চোখ রাখতো, যেন অত্যন্ত সংকুচিত হ'য়ে নিজেকে দি[illegible] আড়াল ক'রে। শুধু মাঝে-মাঝে অতগুলো কালো মা[illegible] আমারই মুখের উপর যেন এসে পড়তো। তবে এট[illegible]

চার বছর অপর্ণা ছি[illegible] [illegible]নী কি[illegible] ওর পরিচয়। সে-[illegible] কাছাকাছি দাঁড়ি[illegible] যোগ্য অনেকেই [illegible] গোছের ছেলে, বা[illegible] শীতকালে ফ্ল্যানেলের [illegible] বিলোয় তার বেশি, সমস্ত ই[illegible] চেহারা, তাছাড়া গুণও তার অনেক [illegible] সাইকেল চালাতে অদ্বিতীয়, ইত্যা[illegible]

আরম্ভ ক'রে ইউনিভর্সিটি ইউনিয়নের সেক্রেটারি পর্যন্ত যেটার জন্যই যখন দাঁড়িয়েছে, অসম্ভবরকম বেশি ভোট পেয়ে অনায়াসে হ'য়ে গেছে। সত্যি বলতে, ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হবার মতো ছেলে আর ছিলো না।

এই অশোকের কাছে অপর্ণার কথা অনেক শুনতুম। সে তুখোড় ছেলে; কমনরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে দু'মিনিট আলাপ ক'রেই তৃপ্ত হয়নি, গেছে অপর্ণার বাড়িতে, চা খেয়েছে, তার মা-কে মাসিমা ডেকেছে; তার বাবার সঙ্গে পলিটিক্স চর্চা করেছে, ভাই-বোনদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, এক কথায়, যা-যা করা দরকার সবই করেছে সে। এক বছরের মধ্যে এই ভাগ্যবান পুরুষ এমন জমিযে তুললো যে অন্য ছেলেরা তাকে মনে-মনে ঈর্ষা ও বাইরে খোশামোদ করতে লাগলো—যদি তার সূত্রে তারাও সেই অমরাবতীর কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। কিন্তু অন্য সকলকে অগ্রাহ্য ক'রে অশোক গায়ে প'ড়েই আমার কাছে শুধু ঘেঁষতো, তার কারণ বোধ হয় এই যে আমি ছিলুম আদর্শ শ্রোতা, আমার কাছে মনের সমস্ত কথা উজোড় ক'রে সে ভারি আরাম '। কতদিন আমাকে নিয়ে ক্লাশ পলিযেছে, শীতের সুন্দর দুপুরবেলায় ঘাসের আমাকে শুনিয়েছে অফুরন্ত অপর্ণা-চরিত। এ-ধরনের গল্প সাধারণত ' আমি স্বীকার করবো যে, আর কিছু না হোক, বার-বার ঐ অপর্ণা ভালো লাগতো।

...শোক আমাকে প্রায়ই বলতো, 'চলো না তুমি একদিন ওদের

প করতে। ডক্টর করের সঙ্গে ও টিউটরিয়ল করে, ...র কথা।'

আমি একটু ভালো। ...ন্তু কিছুই হ'লো না,

অপর্ণার বাড়ি। ...ন অসম্ভব কথা কিন্তু অত্যন্ত লাজুক ...কের মধ্যস্থতায় অপর্ণার সঙ্গে ...মিই বা ওর চেয়ে কম কিসে! ...দ, দিন ভ'রে আড্ডা আর রাত

জেগে পড়ায় এত ব্যস্ত ছিলুম যে তার মধ্যে অপর্ণার কথা ভাববার খুব বেশি সময় ছিলো না।

হু-হু ক'রে দিন কাটতে লাগলো, বি. এ. পরীক্ষা হ'য়ে গেলো। আমার বিষয় ছিলো দর্শন, আজগুবি রকমের ভালো নম্বর পেয়ে ফার্স্ট ক্লাশে উৎরে গেলুম। অপর্ণা আর অশোক দু'জনেই ছিলো পাস-কোর্সে, এম. এ.-র শেষ বছরে এসে অপর্ণা আমার নিকটতর সহপাঠিনী হ'লো, কারণ সে-ও দর্শনে এম. এ. নিয়েছিলো। মডর্ন ইয়ং ম্যান অশোক নিয়েছিলো ইকনমিক্স, কিন্তু অধ্যয়নের ব্যবধান ডিঙিয়ে সে সমীপবর্তিতার মৌরশিপাট্টার ব্যবস্থা ক'রে এনেছিলো। একদিন খুব চুপে-চুপে আমাকে বললে কথাটা। সবই ঠিকঠাক, এম. এ টা হ'য়ে গেলেই হয়।

পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে দর্শনের বাজার-দর তখন থেকেই নামতে শুরু করেছে। সবসুদ্ধ আমরা সাতজন ছিলাম ক্লাশে, ছ'টি ছেলে ও একটি মেয়ে। আলাপ করবার সুযোগ ছিলো অবারিত। পড়াশুনোয় সাহায্য করবার অছিলা ছিলো হাতের কাছেই, আর আমার মুখে সেটা ফাঁকা বুলিও শোনাতো না। কিন্তু যখনই কথাটা আমার মনে হ'তো তখনই আমার ভিতর থেকে কে আর-একজন ব'লে উঠতো—'তুমি গিয়ে কারো সঙ্গে যেচে আলাপ করবে—ছি!'

এদিকে অশোক আমাকে বড়োই পিড়াপিড়ি করতে লাগলো অর্পণাদের বাড়ি যাবার জন্য। কান্ট দুর্বোধ ঠেকছে অপর্ণার, আমার সাহায্য দরকার। আমি হেসে বললুম, 'বড়ো-বড়ো বিদ্বান মাষ্টার মশাইদের মুখে শুনে যা সরল হচ্ছে না, তা কি বোঝাতে পারবো আমি!' আর-একদিন অশোকের হুকুম, হেগেল সম্বন্ধে আমার কী-কী নোট আছে দিতে হবে। শুনে মনে হ'লো, হায়.হায়, কেন অন্য ছেলেদের মতো নোট রাখিনি! কিন্তু আমার যে কোনো নোটই নেই, এ-কথা অশোক বোধহয় বিশ্বাস করলো না; ভাবলো পরীক্ষা-সংক্রান্ত আমার সব গোপনীয় তুকতাক ফুশমন্তরে আমি অন্য কাউকে অংশী করতে চাই না। যা-ই হোক, অপর্ণার হ'য়ে অশোক আমাকে পড়াশুনো বিষয়ে আর-কোনো কথা জিগেস করেনি।

অতএব দর্শনের ছোটো ক্লাশে দুটো বেঞ্চির ওপারে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বছরটা কাটলো। আমার মনে হ'তো, অপর্ণা আমার দিকে ঘন-ঘনই তাকাচ্ছে, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই আমার মনের ভুল।

এম. এ. পরীক্ষা হ'য়ে গেলো। বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদায় দিয়ে বেকারবাহিনীতে ভর্তি হবার সময় যখন ঘনাচ্ছে, এমন সময় অশোক একদিন আমার বাড়ি এসে সুখবর দিয়ে

গেলো। তারিখ পর্যন্ত ঠিক। আজ সন্ধ্যায় কন্যার আশীর্বাদ উপলক্ষ্যে অপর্ণাদের বাড়িতে উৎসব, আমি যেন অবশ্য যাই।

আমি তক্ষুনি বললুম, 'যাবো।' আমার হঠাৎ মনে হ'লো আজ আর আমার যাবার কোনো বাধা নেই, যদিও এতদিন যে কী বাধা ছিলো তাও আমি জানি না।

এই প্রথম আমি অপর্ণাকে কাছাকাছি দেখলুম, তার কথা শুনলুম। কিন্তু সেদিন তার সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি, কপালে চন্দন, পরনে খয়েরি রঙের রেশমি শাড়ি, গা ভরা গয়না। চেনাই যায় না। যে-ঘরটায় গিয়ে বসলুম সেখানে অনেক লোক। অধিকাংশই আমার অচেনা, সুতরাং জড়োসড়োভাবে চুপ ক'রে রইলুম।

অশোক এক সময়ে আমার কাছে এসে চুপি-চুপি বললে, 'এখানে তোমার ভালো লাগছে না, বুঝেছি। চলো আমার সঙ্গে।'

নিয়ে গেলো আমাকে পাশের একটি ছোটো ঘরে, অপর্ণার পড়ার ঘর সেটা। চারদিকে দর্শনের বই দেখে খানিকটা আরাম পেলাম। আমাকে বসিয়েই অশোক যেন কোথায় অন্তর্হিত হ'লো, ভারি ব্যস্ত সে। একা ব'সে আমি একটি বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলুম।

মৃদু শব্দ শুনে চমকে তাকিয়ে দেখি অপর্ণা আমার একটু দূরে দাঁড়িয়ে। সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালুম, কী বলবো ভেবে পেলুম না।

অপর্ণাই প্রথমে কথা বললে, 'এতদিনে আপনি এলেন!'

আমি বললুম, 'আমার অভিনন্দন আপনাকে জানাই।'

'এতদিন আসেননি কেন?'

'আসিনি—আসিনি—তার মানে—আসা হয়নি আরকি।'

'অশোক আপনাকে বলেনি আসতে?'

'বলেছে।'

'আপনি কি ওর কথা বিশ্বাস করেননি?'

'অবিশ্বাস করিনি, তবে-'

'তবে আমার সঙ্গে আলাপ করবার আপনার ইচ্ছে হয়নি, এই তো?'

'না—না-ইচ্ছে হবে না কেন।'

অপর্ণা একটু মুচকি হেসে বললে, 'থাক, এখন আর ভদ্রতার শুকনো কথা ব'লে কী লাভ—এখন তো আর সময় নেই।'

শেষের কথাটা শুনে হঠাৎ আমার বুকের ভিতরটা ধ্বক ক'রে উঠলো। অপর্ণা স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এই চার বছরে অশোককে দিয়ে

এতবার আপনাকে খবর পাঠালুম,—একবার এলেন না! তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে ঈষৎ মাথা নেড়ে খুব নিচু গলায় বললে, 'কিচ্ছু বোঝেন না আপনি!' সঙ্গে-সঙ্গে শুনতে পেলুম অপর্ণার দীর্ঘশ্বাস, কিন্তু সেটাও বোধহয় আমার কল্পনা।

বাড়ি ফিরে অনেক রাত অবধি ঘুমুতে পারলুম না, হয়তো তার একটা কারণ এই যে অন্যমনস্কভাবে ও-বাড়িতে অত্যন্ত বেশি খেয়ে ফেলেছিলুম। শুয়ে-শুয়ে অনেক কথা মনে হ'লো। অপর্ণার কথাগুলি বিষাক্ত পোকার মতো মগজের মধ্যে কামড়ে ফিরতে লাগলো। ভাবনাগুলো যেখান থেকেই শুরু হোক, খানিক পরে এক:অন্ধ গলির সামনে এসে পড়ে, তারপর আর রাস্তা নেই। আমি যে কত বড়ো বোকা তা উপলব্ধি ক'রে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। অন্ধকারে চোখ মেলে নিজের মনে বার-বার বললুম, ও আমাকেই চেয়েছিলো, আমাকেই চেয়েছিলো. হয়তো এখনো—না, না, এখন আর সময় নেই, আর সময় নেই।

কয়েকদিন পরেই অপর্ণার বিয়ে হ'য়ে গেলো, আর আমি চ'লে এলুম কলকাতায় চাকরির চেষ্টায়।

দশ বছর কেটে গেছে। আমি এখনো বিয়ে করিনি, তার কারণ আমার ক্ষীণ আয়ের উপর মা-বাবা ভাইবোনের নির্ভর, আমি বিয়ে করলেই তাদের ভাগে কম পড়বে, অতএব সে-বিষয়ে সকলেই উদাসীন। অশোক ঢুকেছিলো ইনকম-ট্যাক্সে, এতদিনে নিশ্চয়ই অফিসর হয়েছে, হয়তো রংপুরে, হয়তো বরিশালে, হয়তো চাটগাঁয়ে হাকিমি করছে। আমার জীবন অত্যন্ত শান্ত ও নিয়মিত; কোনো আক্ষেপ, কোনো উচ্চাশা, কোনো কল্পনা নেই। দর্শন পড়ি ও পড়াই, নিছক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাকেই জীবনের একমাত্র সুখ ব'লে মেনে নিয়েছি। ভালোই আছি।

শুধু মাঝে-মাঝে অনেক রাত্রে সেই একটি তরুণ শ্যামল মুখ মনে পড়ে, সরু হাতে একটিমাত্র চুড়ি, নীল শাড়ির পাড় মাথাটিকে ঘিরেছে। অন্ধকারে কে যেন চুপি-চুপি কথা বলে—'এত দেরি ক'রে এলেন—আর তো সময় নেই।'

১৯৪১ অপ্রকাশিত

সবিতা দেবী

ললিতচন্দ্র চন্দ্র বিশুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গীয়। বাজেশিবপুরে জন্মগ্রহণ ক'রে, উত্তরপাড়ার ইশকুলে এবং হাওড়ার কলেজে বিদ্যাভ্যাস ক'রে তিনি বাগবাজারের নীলকান্ত পাঠশালায় বঙ্গভাষার শিক্ষকরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেখানে কুড়ি বছর কাজ করবার পরে তাঁর মাইনে যখন চল্লিশ থেকে ষাটে এসে ঠেকেছে এবং উচ্চাশার শেষ সোপানে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের চেয়ারটা যখন কল্পনাকে শুড়শুড়ি দিচ্ছে, এমন সময় ভাগ্য তাঁকে নিয়ে একটু তামাশা করলো। হঠাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারের চাকরি তিনি পেয়ে গেলেন। তিনি বি. এ পাশ মাত্র, কিন্তু তাতে কী? তিনি কবি—এবং সমালোচক। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পুরুষদের মধ্যে একজন তাঁর প্রাণের বন্ধু। কে বলে বাংলাদেশে প্রতিভার আদর নেই, কে বলে বাঙালি বন্ধুতার মূল্য দিতে জানে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল বাদশাহি ধরনের। লর্ড কর্জন যখন বাংলাকে দু' টুকরো করেছিলেন তখন ঢাকা শহরকে গবর্মেণ্টের একটি পীঠস্থানরূপে প্রস্তুত করা হচ্ছিলো; সেই প্রস্তুতির নামই রমনা। বঙ্গ-ভঙ্গ নাকচ হ'য়ে যাবার পর প্রায় সমস্ত রমনাটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাস ক'রে বসলো। সেক্রেটারিএটের ঘরগুলি বিদ্বজ্জনের বক্তৃতায় গুমগুম করতে লাগলো, লাটের নাচঘরে পরীক্ষার আপিশ, দরবার-ভবনে ল্যাবরেটরি এবং সরকারি স্বর্গের কেষ্ট-বিষ্টুদের জন্য যে-সব বিলেতি ছাঁদের বাসভবন তৈরি করা হয়েছিলো, সেগুলিতে জ্ঞানমার্গের বিভিন্ন দিক্‌পালেরা বিরাজ করতে লাগলেন। রমনার উত্তরপ্রান্তে দু'চারঘর জজ-মাজিস্টরও রইলেন, একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ ও শ্বেতাঙ্গদের ক্লবঘরও রইলো, কিন্তু সেগুলি রমনার অলংকার মাত্র। ছাত্র ও ছাত্রী; প্রোফেসর, ডীন, প্রভস্ট; রীডর ও লেকচারর—এরাই রমনার রক্তমাংস।

দীনু মল্লিকের গলির একতলা থেকে রাতারাতি নীলখেতে বদলি হ'য়ে ললিতচন্দ্রের টাল সামলে নিতে একটু সময় লাগলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের জাঁক-জমক দেখে তিনি প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেলেন, কিন্তু সেটা নিজের কাছেও স্বীকার করলেন না। ইংরেজিতে যাকে বলে চীক, সেটা প্রচুর পরিমাণে ছিলো তাঁর, পেশীবহুল পালোয়ানি ভাষায় ভাষাতত্ত্ববিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে অজ্ঞ প্রমাণ ক'রে তিনি সমালোচক হিশেবে নাম কিনেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নীলখেতের বাগানওলা বাড়ি, তিনটে

চাকর, সপ্তাহে দশটি ক্লাশ, বাংলাবিভাগে ছাত্রীবহুলতা, স্বনামধন্য পণ্ডিতদের সংসর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুন, কমিটি কাউন্সিল, ছাত্রছাত্রীদের প্রাত্যহিক বিচিত্র অনুষ্ঠান সবই তিনি নিজের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মানিয়ে নিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁর হাবে-ভাবে কথাবার্তায় এটা খুব স্পষ্ট হ'য়েই প্রকাশ পেলো যে তাঁর মতো একজন ক্ষণজন্মা কবি-পণ্ডিত যে পূর্ববঙ্গীয় বর্বরদের আলোকবিতরণ করতে পদ্মাপার হ'য়ে এসেছেন এটা নিতান্তই তাঁর মহানুভবতা, এবং এ-জন্যে চট্টগ্রাম থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত সমগ্র পূর্ববঙ্গ যদি তাঁর পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে, তাহ'লেও যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় না। তৈলচিক্কণ হ্রস্ব চুলের দুই প্রান্ত শিঙের মতো তুলে দিয়ে, চিনে কাপড়ের গলাবন্ধ কোটের উপর পাকানো শাদা চাদর জড়িয়ে, ফিতেওলা ইংরেজি জুতোর সঙ্গে লাল মোজা প'রে, এবং ধুতির কোঁচাটি ডান হাতে তুলে ধ'রে করিডর কম্পিত ক'রে তিনি যখন চলতেন, ছাত্রেরা পাশ দিয়ে যেতে-যেতে আবক্ষনত নমস্কার করতো এবং একটু দূরে গিয়ে ফিক ক'রে হেসে ফেলতো। রসবিগলিত তাম্বুলচর্বণের প্রাচুর্যে তাঁর ওষ্ঠাধরের রং পোড়া কয়লার মতো, এবং দাঁতের রং জবাকুসুম তেলের মতো হয়েছিলো। সেই দন্তপংক্তি বিকশিত ক'রে প্রচণ্ড নিনাদে তিনি মাইকেল পড়াতেন, এবং চার লাইন পড়িয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে নির্বোধ পূর্ববঙ্গীয়দের অপচেষ্টার এমন সুতীব্র নিন্দা করতেন যে বেচারা বাঙাল ছেলেরা স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে থাকতো, এবং মাইকেলের পঞ্চম লাইনে পৌঁছবার আগেই ঘণ্টা যেতো বেজে।

একদিন তিনি তাঁর মাছের মতো মুখ পূর্ণব্যাদন ক'রে অর্ধনিমীলনয়নে আবেগভরে মেঘনাদবধ কাব্য আবৃত্তি করছেন, এমন সময় চটিজুতো ফটফট করতে-করতে একটি লম্বামতো টেড়ি-কাটা ছেলে ক্লাশে ঢুকে পিছনের বেঞ্চিতে বসলো। ললিতচন্দ্র সশব্দে বই বন্ধ ক'রে ছেলেটিকে তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র চোখে বিদ্ধ ক'রে বললেন, 'ক্লাশে ঢোকবার আগে আমার অনুমতি নেয়া উচিত ছিলো তোমার।'

ছেলেটি পিছনের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হাত দোলাতে লাগলো।

'তোমাদের অভদ্রতায় আমি স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছি।'

ছেলেটি তেমনি দেয়ালে ঠেশান দিয়েই বললে, 'ভদ্রতা শেখবার জন্যেই তো আপনার ক্লাশে আসি।'

ললিতচন্দ্র চীৎকার ক'রে বললেন, 'দাঁড়িয়ে কথা বলো। দাঁড়াও।' তারপর ইংরেজিতে বললেন, 'Stand up.'

সেই ছেলেটি উঠলো না, উঠলো তার পাশের ছেলেটি। —'না, না, তুমি নও— you, *you*!'

'আমি, স্যর ?' ব'লে অত্যন্ত নিরীহদর্শন চশমা-পরা একটি ছেলে উঠে দাঁড়ালো।

'এয়ার্কি হচ্ছে, না ? এই টেড়ি-কাটা কুষ্মাণ্ড, দাঁড়াও !'

এবার যে উঠলো, তার প্রকাণ্ড চেহারা, মাথার টেড়িটি ফিটফাট, গায়ে সিল্কের শার্ট। বুকের উপর দু' হাত একত্র ক'রে গম্ভীর গলায় সে বললে, 'আমাকে কুষ্মাণ্ড বললেন, স্যর ?'

ললিতচন্দ্র ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে বলতে লাগলেন, 'শুধু তোমাকে নয়, তোমাদের সকলকে বলেছি। মূর্খ ! ইতর ! বর্বর ! আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো যে পদ্মার জলে ভদ্রতার সলিলসমাধি হয়েছে। গবর্মেন্টকেও বলিহারি ! বাঙালদেশে আবার ইউনিভর্সিটি ! শূকরের কাছে মুক্তো ছিটোনো !' বলতে-বলতে ললিতচন্দ্রের মুখ দিয়ে ফেনা গড়াতে লাগলো।

হঠাৎ ক্লাশের প্রায় অর্ধেক ছেলে উঠে দাঁড়ালো। ঐ রাগের মুখেও ললিতচন্দ্রের মনে সুবুদ্ধির উদয় হ'লো। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ আর ক্লাশ হবে না—তোমরা যাও।'

ব'লেই তিনি বই-খাতা কুড়িয়ে নিয়ে বেরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ক্লাশঘরের সব ক'টি দরজা কলের মতো পর-পর বন্ধ হ'য়ে গেলো, এবং মিনিটখানেক পরে তিনি দেখতে পেলেন দশ-বারোটি যুবকের একটি ব্যূহের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে।

প্রকাণ্ড চেহারার ছেলেটি শার্টের আস্তিন গুটিয়ে তাঁর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ বাঙাল ভাষায় বললে, 'কী স্যার, আর এ-রকম কইবেন ?'

ললিতচন্দ্র অবিশ্বাস্য মিহি সুরে বললেন, 'তোমরা কি রাগ করেছো ? শিক্ষক হ'লে ছাত্রদের মাঝে-মাঝে ভর্ৎসনা করতেই হয়, তার জন্যে —'

পিছন থেকে দ্রুতস্বরে আর-একজন ব'লে উঠলো, 'ন্যাকামি রাখেন, স্যার। আপনে আমাগো সকলরে অপমান করছেন। ভালো চান তো ক্ষমা চান, না অইলে মশকিল আছে কইয়া দিলাম।'

সঙ্গে-সঙ্গে আর-একজন বললে, 'কী আর করবেন, স্যার, ক্ষমাটা চাইয়া ফালান। দেখতে আছেন তো, আমাগো কাছে তেরিবেরি খাটবো না। আমরা বাংগাল, আমাগো রক্ত গরম।'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে ললিতচন্দ্র বুঝলেন যে একটা সুচিন্তিত চক্রান্তের ফাঁদে তিনি পা দিয়েছেন। তাঁর ঠিক পিছনেই ক্লাশের ছ'টি মেয়ে তাদের স্বতন্ত্র চেয়ারে মুখ অত্যন্ত নিচু ক'রে ব'সে—তাদের মুখের ভাব দুঃখের না কৌতুকের বোঝবার কোনো উপায় নেই।

'কথা কন না যে স্যার ?'

ললিতচন্দ্র নিরুপায় হ'য়ে বললেন, 'আমি দুঃখিত। হ'লো ? আমাকে এখন যেতে দাও।'

যাকে উপলক্ষ্য ক'রে গোলমালটা আরম্ভ, সেই লম্বা ছেলেটি এতক্ষণ চুপচাপ পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলো, এইবার এগিয়ে এসে বললে, 'ওতে হবে না। আমরা রিটন্ অ্যাপলজি চাই।'

'হ। ঠিক কথা। আপনেরে এখনি অ্যাপলজি লেইখ্যা দিতে অইবো—'

'যদি না দেন, তবে আমরা কেউ আর আপনের ক্লাশ করুম না।'

'একটা ছেলেও আর আপনের ক্লাশে আইবো না। আমরা স্ট্রাইক করুম।'

'রোজ-রোজ গালাগাল খাওনের লেইগা আপনের ক্লাশে আসতে বইয়া গেছে আমাগো। ত্যাখেন না—আপনার কইলকাত্তাই ফুটানি বাইর কইরা দিমু, তবে ছারুম।'

মুখ থেকে মুখে কথা কাড়াকাড়ি ক'রে মনের ভাব ব্যক্ত করলে ছেলেরা। তারপর লম্বা ছেলেটি বললে, 'অ্যাপলজির সঙ্গে একটা গুড কণ্ডক্টের বণ্ডও দিতে হবে আপনাকে।'

ললিতচন্দ্রের মনে হ'তে লাগলো তাঁর পায়ের তলায় আর মাটি নেই। ফিশফিশ ক'রে বললেন, 'তোমরা যা চাও তা-ই হবে। মেয়েদের সামনে আর অপমান আমাকে কোরো না। এবার আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও।'

লম্বা ছেলেটির ইঙ্গিতে ছেলেরা স'রে দাঁড়িয়ে একটা দরজা খুলে দিলো। বেরিয়ে যেতে-যেতে ললিতচন্দ্র পিছন থেকে শুনলেন, 'আইচ্ছা স্যার, এইবার ছাইরা দিলাম, মনে থাকে য্যান্।'

গল্পটা দ্রুতবেগে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়লো। ছেলেরা হাততালি দিয়ে হো-হো ক'রে হাসলো, মেয়েরা হাসির হাওয়ায় হিল্লোলিত হ'লো, এবং অধ্যাপকরা মুখ টিপে হাসলেন। ললিতচন্দ্রের মনে পূর্ববঙ্গ-বিদ্বেষ এত প্রচণ্ড হ'লো যে সেটা যদি তাঁর মন থেকে নিষ্কাষণ ক'রে নেয়া সম্ভব হ'তো তাহ'লে সেই বিষে ঢাকা শহরের সমস্ত লোককে এক মিনিটের মধ্যে মেরে ফেলা যেতো। তিনি এসেছেন দয়া করতে, সেই দয়ার নাকি এই প্রতিদান! মানুষের অকৃতজ্ঞতায় তাঁর চিত্ত তিক্ত হ'য়ে উঠলো। সন্ধ্যাবেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবে নিয়মিত যেতেন তিনি—অর্থাৎ দুপুরে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বক্তৃতা দিয়ে তাঁর সাধ মিটতো না, সন্ধ্যাবেলা শিক্ষকদের কাছে বক্তৃতার কলের

ছিপি খুলে দিতেন। বড়োদরের প্রোফেসররা হয় তাস খেলেন, নয় আন্তর্জাতিক, ভারতীয় কিংবা বৈশ্ববিদ্যালয়িক কূটনীতি আলোচনা করেন—বাচ্চা শিক্ষকদের মধ্যে কাউকে পাকড়াও ক'রে, একশো লোককে শোনাবার মতো উচ্চস্বরে তিনি নানা প্রমাণসহযোগে এই কথাটাই বুঝিয়ে যেতেন যে রবীন্দ্র-অভ্যুদয়ের পরে বাংলা সাহিত্যের মৌল স্রোত রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। বাচ্চা প্রোফেসররা যখন একটা আত্মরক্ষা-সমিতি গঠন করবার উদ্যোগ করছেন, হঠাৎ একদিন তাঁরা অবাক হ'য়ে দেখলেন যে ললিতচন্দ্র আর ক্লবে আসছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ুমণ্ডলে যে একটা হাস্যতরঙ্গ উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে সেটা তিনি অনুমান করতে পারলেন, এবং বাড়িতেই সন্ধ্যাযাপন করতে লাগলেন।

নীলশ্বেত রমনার পশ্চিম প্রান্তে। মৈমনসিংএর রেল-লাইন গোল হ'য়ে এখান দিয়ে চ'লে গেছে, তারপরেই মাঠের পর মাঠ একেবারে ঘনশ্যামল দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। সেই প্রান্তরের দিকে মুখ ক'রে সারি-সারি কয়েকটি অধ্যাপকীয় বাংলো, তার শেষ বাড়িটি ললিতচন্দ্রের। মনীষী কবির পক্ষে এর চেয়ে ভালো আবাস কী হ'তে পারে? কিন্তু ঐ বিশাল দিগন্ত, প্রতি সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের বর্ণবিলাস ললিতচন্দ্রের কবি-চিত্তকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারলো না। ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের বই হাতে নিয়ে বাগানে ব'সে তাঁর নিঃসঙ্গ বোধ হ'লো। তিনি বহুকাল বিপত্নীক ; দুটি কন্যাকে তেরো না-পেরোতেই পার করেছেন, ছেলে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায় কাজ করে। কলকাতায় তাঁর নিজের দল ছিলো, ভক্তসম্প্রদায় ছিলো, আড্ডার ঘাঁটি ছিলো। সোনা-জ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কলকাতা ছেড়ে এসেছেন ব'লে তিনি প্রায় অনুতপ্ত বোধ করলেন।

রমনাওলারা নিজেদের মধ্যেই মেলামেশা করেন, জিনিশ কেনা কিংবা সিনেমা দেখা ছাড়া শহরের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই। তাঁরা সন্ধ্যাবেলা রাস্তায় ভ্রমণ করেন, কিংবা ক্লবে যান, কিংবা ছেলেদের কোনো সভায় গিয়ে বসেন, এবং কদাচ পরস্পরের গৃহে সস্ত্রীক পদার্পণ ক'রে রমনার ব্যয়বহুলতা ও ভৃত্যদের চৌর্যবৃত্তি সম্বন্ধে প্রশান্ত গম্ভীর আলাপ-আলোচনা করেন। ললিতচন্দ্রও দু'একদিন কোনো-কোনো সহকর্মীর গৃহে আবির্ভূত হ'য়ে দেখেছেন, তাঁরা খুব যে খুশি হয়েছেন তা মনে হয়নি, তাঁদের আলোচনার বিষয়গুলিও মনঃপূত হয়নি তাঁর। তাঁর ডান দিকের বাড়িতে একজন ইংরেজির অধ্যাপক সমস্ত সন্ধ্যা ক্রসওঅর্ডে মত্ত থাকেন, তার পরের বাড়িতে একজন প্রৌঢ় দার্শনিক চিৎ হ'য়ে শুয়ে গোয়েন্দা-নভেল পড়েন। ললিতচন্দ্র জীবলোকে তাঁর সমস্তরের কাউকে খুঁজে না-পেয়ে বইয়ের পাতায় অমর আত্মার সঙ্গভোগ করতে লাগলেন,

এবং নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা প্রকাশ ক'রে কয়েকটি কবিতা লিখে ফেললেন।

এমন সময় সুরেশ্বর সেন নামে এক ভদ্রলোক এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়ে ঢাকায় এলেন, এবং রমনার একটি মনোহরতম ভবনে অধিষ্ঠিত হ'লেন। কবি ললিতচন্দ্র তাঁর প্রতিবেশী, এই খবর পেয়ে সেন সাহেব নিজেই তাঁকে খুঁজে বের করলেন, এবং কবিকে তাঁর বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ বার-বার জানিয়ে গেলেন।

সেনের বাড়ি গিয়ে ললিতচন্দ্রের ভালোই লাগলো। ভদ্রলোক যথার্থ সাহিত্য-রসিক, শেক্সপিয়রের সনেট অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন, নিজেও একটু-একটু ইংরেজি কবিতা লেখার চেষ্টা করেন। ডেপুটি হয়েও সিবিলিয়ানদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলা তাঁর অভ্যাস, একবার ছুটি নিয়ে বিলেতও ঘুরে এসেছেন, মহামূল্য স্যুট পরেন, এবং ম্যাক্রোপোলার দোকান থেকে ভি. পি.তে পাইপের তামাক আনান। তাঁর স্ত্রী সবিতা দেবী জলরঙে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকেন, পিআনো বাজান, সকালবেলা বাগানে ব'সে আধুনিক বাঙালি কবির বই পড়েন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই মুক্ত মনের মানুষ, কারো সঙ্গে পরিচয় হ'লেই লোকটা কত মাইনে পায় এ-চিন্তা তাঁদের মনে হয় না, এবং সিভিল লিস্ট-এর বাইরেও যে মানুষ আছে, এমনকি বেশির ভাগ মানুষ যে সিভিল লিস্ট-এর বাইরেই, সে-বিষয়ে তাঁরা সচেতন।

ফিলিস্টাইন শহরে সভ্যতার আলো জ্বললো: সেনদের পেয়ে ললিতচন্দ্র বেঁচে গেলেন। ওঁদের সবই যে তাঁর ভালো লাগলো তা নয়। বঙ্কিমের আনন্দমঠের মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত, উনিশ শতকের হিন্দু পুনরুজ্জীবনের তিনি পুরোহিত; সেনের পাজামা ড্রেসিং গাউন পাইপ, সবিতা দেবীর খাটো চুল, ঠোঁটের রাসায়নিক রং—এ-সব তিনি পছন্দ করলেন না। তবু তাঁদের মধ্যে যথার্থ কলচরের পরিচয় পেলেন তিনি। চোখ বুজে চীৎকার ক'রে নিজের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতা পড়েন, রুপর্ট ব্রুক ও উইলফ্রিড ওএনকে নিয়ে আলোচনা করেন, এবং আধুনিক ইংরেজ কবিদের বই সেনের কাছ থেকে ধার নেন। এই আলোচনা-সভায় সবিতা দেবী সর্বদাই উপস্থিত, মন দিয়ে সব কথা শোনেন, মাঝে-মাঝে কিছু বলেনও: ললিতচন্দ্র ধ'রেই নেন যে সে-সব কথা তাঁর স্বামীর কাছে শেখা, নয়তো অবাক হতেন। এদিকে সেন-দম্পতীও তাঁকে প্রসন্নচিত্তেই গ্রহণ করলেন···তাঁর প্রচণ্ড শব্দ ক'রে চা খাওয়া, পা তুলে চেয়ারে বসা, সমসাময়িক বাঙালি কবিদের সম্বন্ধে অনর্গল কটূক্তি, এ-সবই কবির ছোটোখাটো উৎকেন্দ্রিকতা ব'লে মার্জনা করলেন তাঁরা।

ভালো জিনিশের ধর্মই এই যে তা একটা সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না,

তার সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অল্পদিনের মধ্যেই সেনদের বাড়িতে আরো অনেকের আনাগোনা আরম্ভ হ'লো। তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন আছেন, ইংরেজ পাদ্রি-প্রোফেসর আছেন, আবার মাসিকপত্রে দুটো গল্প ছাপিয়েছে এমন ছাত্র, কি দুটো গান রেকর্ড করেছে এমন মেয়েও আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে শিল্পকলার অনুরাগী যে-অল্প কয়েকটি লোক ঢাকা শহরে ছিলো, তারা সকলেই একে-একে সেখানে এসে জুটলো। এতে ললিতচন্দ্রের একাধিপত্য নষ্ট হ'লো বটে, কিন্তু তাঁর প্রতিপত্তি রমনার এলাকা ছাড়িয়ে সমস্ত শহরে রাষ্ট্র হ'তে লাগলো। তাতে তিনি দুঃখিত হলেন না।

ল্যাণ্ডরের অনুসরণে আকবর আওরংজেবের মধ্যে একটি কাল্পনিক কথোপকথন তেজস্বী অমিত্রাক্ষরে রচনা ক'রে এক সন্ধ্যায় গুটি পাঁচ-সাত শ্রোতার সামনে তিনি প'ড়ে শোনাচ্ছেন, এমন সময় কর্ণবিদারক শব্দ করতে-করতে একটি মোটর-সাইকেল ফটক দিয়ে ঢুকে বাগান পার হ'য়ে একেবারে বারান্দার সিঁড়ির তলায় এসে দাঁড়ালো। ললিতচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্তমুখে পাণ্ডুলিপি থেকে চোখ তুলে দেয়ালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। একটু পরে সেনদের ছ' বছরের মেয়েটির হাত ধ'রে যে-ছেলেটি ঘরে ঢুকলো তাকে দেখে তাঁর মুখ ঘোর কালো হ'য়ে গেলো। মাইকেল-পড়ানোর ক্লাশে সেই দুর্ঘটনার নায়ককে এখানে দেখতে তিনি আশা করেননি।

সবিতা দেবী বললেন, 'এসো, অরণি। তোমাদের মাষ্টার মশাইর নতুন কবিতা পড়া হচ্ছে—শোনো। আপনি পড়ুন, ললিতবাবু।'

ললিতচন্দ্র অরণির দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন। মোটা গলায় বললেন, 'থাক, আজ আর না।'

সেন একটু অবাক হ'য়ে বললেন, 'বাঃ, পড়ুন। আমরা শোনবার জন্য তৃষিত হ'য়ে আছি।'

সবিতা দেবী বললেন, 'তুমি বোসো, অরণি।'

'নাঃ, ঘরে বড্ড গরম, যাই বাগানে বেড়িয়ে আসি। চলো, চিত্রা।' স্যাণ্ডেল চটপট করতে-করতে চিত্রাকে সঙ্গে ক'রে বেরিয়ে গেলো অরণি। সেই চটপট শব্দ ললিতচন্দ্রের স্নায়ুমণ্ডলীকে মুচড়িয়ে দিয়ে গেলো। একটি সিগারেট ধরিয়ে তিনি জিগেস করলেন, 'এর সঙ্গে আপনাদের আলাপ হ'লো কবে?'

'কে? অরণি?' সবিতা দেবী মৃদু হাসলেন। 'সেদিন জগন্নাথ হল্-এ নাটক দেখতে গিয়ে আলাপ হ'লো। ভারি ভালো ছেলে।'

'ওকে যদি ক্লাশে দেখতেন, তাহ'লে অন্যরকম ধারণা হ'তো।'

এবারে একটু শব্দ ক'রে হাসলেন সবিতা দেবী।—'তাতে আর কী হয়েছে। আপনি তো জানেন, বোকা ছেলেরাই প্রোফেসরের বক্তৃতা মন দিয়ে শোনে।'

ললিতচন্দ্র একটু ভেবে বললেন, 'প্রোফেসরের বক্তৃতা যারা শোনে না তাদের মধ্যে দুটো শ্রেণী আছে। প্রথমত, যারা পরীক্ষায় ফর্স্ট হয়, দ্বিতীয়ত যারা পরীক্ষায় ফেল করে। ঐ ছেলেটি দ্বিতীয় শ্রেণীর।'

সেন পাইপের ধোঁয়া বের ক'রে বললেন, 'এটা আপনার যোগ্য কথা হ'লো না, ললিতবাবু। পাশ করাটাই তো মানুষের মূল্য নয়। ছেলেটি একটু গিফটেড ভালো ফোটোগ্রাফ তোলে, কারো কাছে শেখেনি, অথচ সুন্দর ছবি আঁকে। কই, আপনার কবিতা পড়ুন।

নিজে এম এ পাশ করেননি ব'লে পাশ সম্বন্ধে ললিতচন্দ্রের মনে একটু দুর্বলতা ছিলো, তিনি আর বাক্‌বিস্তার না-ক'রে কবিতাটি প্রথম থেকে আবার পড়লেন। কিন্তু সে-রকম যেন আর জমলো না।

পড়া শেষ হবার একটু পরেই সবিতা দেবী বললেন, 'আমি একটু আসছি।' বাইরে বেরিয়ে দেখলেন অরণি ঘাসের উপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে আছে, আর চিত্রা তার মাথার কাছে ব'সে দ্রুতস্বরে ব'কে যাচ্ছে। একটু যা কথা কানে এলো তা থেকে বুঝলেন যে চিত্রা নক্ষত্রতত্ত্বের অবতারণা করেছে—মানুষ তো ম'রে গিয়ে আকাশে তারা হ'য়ে জ্বলে, কিন্তু পৃথিবীতে যত মানুষ মরেছে, আকাশে কি তত তারা?

এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর অরণি যখন চিন্তা করছে, সবিতা দেবী তাকে ডাকলেন, 'অরণি, ওঠো।'

অরণি মুখ ঘুরিয়ে তাকালো, কিছু বললে না। সবিতা দেবী আবার বললেন, 'ঘরে চলো, চা খাবে না?'

'আমি এখানেই বেশ আছি।'

'ললিতবাবুর ক্লাশে দুষ্টুমি করেছিলে বুঝি একদিন? আর তিনি বুঝি খুব বকেছিলেন?'

অরণি চিত্রার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বুঝেছো, চিত্রা, তোমাদের বাড়িতে আমি আর আসবো না। সারাদিন তো প্রোফেসরদের চ্যাঁচানি শুনি, তার উপর সন্ধেবেলায় আবার তাঁদেরই মুখ যদি দেখতে হয় তাহ'লে আর বেঁচে সুখ কী। আমি চললুম।' অরণি তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে তার মোটর-বাইকের দিকে যেতে লাগলো।

অরণির আসন্ন বিরহসম্ভাবনায় কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ না-ক'রে চিত্রা বললে, 'আমাকে তোমার মোটর-সাইকেলের পিছনে একটু চড়াবে, অরণি-দা।'

'না, না, আমার সঙ্গে গিয়ে তোমার কাজ নেই। আমি তো ভালো ছেলে নই—বরং ঐ ললিতবাবুকে ঘোড়া বানিয়ে তুমি হেঁট-হেঁট খেলো গে', ব'লে অরণি মোটর-বাইকে চ'ড়ে বসলো।

সবিতা দেবী অরণির মাথায় হাত রেখে বললেন, 'কী পাগল ছেলে! চলো শিগগির, চা বুঝি ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো।'

সবিতা দেবীর চোখের দিকে একবার তাকিয়ে অরণি বললে, 'আমি কিন্তু ও-ঘরটায় যাবো না।'

'না—না—তুমি খাবার ঘরে ব'সে খাবে।'

'আপনি ওখানে থাকবেন তো?

'আমি থাকবো। চলো।'

অরণিকে খাবার ঘরে নিয়ে এসে সবিতা দেবী চা আর রেফ্রিজরেটরে ঠাণ্ডা-করা সন্দেশ খাওয়ালেন। ড্রয়িংরুমে ফিরে এসে দেখলেন, ললিতবাবু চ'লে গেছেন।

এর পরে ও-বাড়িতে ছাত্র-শিক্ষককে ঘন-ঘন দেখা হ'তে লাগলো। পরস্পরের প্রতি প্রবল বিরুদ্ধ ভাব কেউই গোপন করবার চেষ্টা করে না, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না, কিন্তু সবিতা দেবীর প্রভাবে বিদ্বেষের কোনো অশোভন বিস্ফোরণও কখনো হয় না। ললিতচন্দ্র অধ্যাপকীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে অরণির অস্তিত্বই সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে চলেন, আর অরণি তার ছোটো সঙ্গিনীটিকে নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ায়, রেডিও শোনে ছবির বই দেখে, বাগানে ঘাসের উপর শুয়ে-শুয়ে তারা গোনে।

একদিন দুপুরবেলায় হঠাৎ অরণি তার মোটর-বাইক ফটফট করতে-করতে এসে উপস্থিত। দিনটা মেঘলা ছিলো, সবিতা দেবী বাগানে গাছের ছায়ায় ব'সে ছবি আঁকছিলেন। অরণি কাছে আসতেই বললেন, 'তোমার মোটর-বাইকটায় প্রায় মেশিনগানের মতোই আওয়াজ হচ্ছে, অরণি।

অরণি দু' হাতের উপর মাথা রেখে চিৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে বললে, 'আঃ!'

'ক্লাশ পালিয়ে এলে বুঝি?'

'ললিতবাবু এখন যত খুশি চ্যাচাতে পারেন—আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'তুমি কি কেবল ললিতবাবুর ক্লাশেই ফাঁকি দাও, না সব ক্লাশেই?'

'এ-সব কথা জিগেস করা ঠিক না। যদি সব সময় ক্লাশেই ব'সে থাকবো তাহ'লে এমন মস্ত-মস্ত ফাঁকা মাঠ আর আকাশে মেঘ আছে কিসের জন্য?'

'এইরকম মেঘলা দিন আমার খুব ভালো লাগে', অনেকটা নিজের মনে সবিতা দেবী বললেন।

'আমারও!' অরণি সোৎসাহে ব'লে উঠলো। 'এই দেখুন না—একটু আগে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে কমনরুমের দিকে যেতে-যেতে হঠাৎ আমার চোখে পড়লো যে আকাশটা মেঘলা হয়েছে। তক্ষুনি মনে হ'লো, একবার তো ওখানে গেলে হয়। আমার মোটর-বাইকটার যত নিন্দেই করুন ওটার স্পীড আছে, দু' মিনিটে নিয়ে এলো।'

'অত জোরে চালিয়ো না, অরণি। একদিন একটা বিপদ ঘটাবে।'

সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে অরণি বললে, 'এখন আপশোষ হচ্ছে এই কথা ভেবে যে এতদিন কথাটা মনে হয়নি কেন। আমি ক্লাশ পালাতে পারি, ললিতবাবু পারেন না। ওখানে আমার মস্ত জিৎ!' অরণি উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। 'এখন থেকে দুপুরবেলাই আসবো আমি।'

'সন্ধেবেলা তুমি না-এলে আমার যে ভালো লাগবে না।'

'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই! সন্ধেবেলা এসে আজকাল দেখা পাই কিনা আপনার!'

'কেন, আমি কি বাড়ি থাকি না?'

'ওরে বাবা! ও-সব জ্ঞানীগুণীর মধ্যে আমি নেই।'

'তোমাকে ললিতবাবুতে পেয়ে বসেছে। ও-সব ছাড়ো তো। উনি একজন জ্ঞানী লোক, ওঁকে তোমার শ্রদ্ধা করা উচিত।'

'মেয়েদের সম্বন্ধে যা-তা বললেই বুঝি জ্ঞানী হয়?

'এ আবার কী কথা?'

'বাঃ, সেদিন শুনলেন না উনি কী-রকম বললেন? "বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা নারীর স্বভাবকে বিনাশ করে। নারীর স্থান অন্তঃপুরে, তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ রন্ধনশালায়, তার সার্থকতা—" '

'ওমা! তুমি ও-সব শুনলে কখন?'

'বারান্দা দিয়ে যেতে-যেতে কথাগুলো কানে এলো। উঁকি দিয়ে দেখলুম, আপনি চুপ ক'রে ব'সে আছেন। আপনি প্রতিবাদ করলেন না? আপনার রক্ত গরম হ'লো না?'

'উনি ব'লে নিয়েছিলেন যে দু'একজন ব্যতিক্রম কদাচ পাওয়া যায়, এবং আমি ধ'রে নিয়েছিলাম যে আমি ঐ ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ি।'

'কিন্তু আমি আপনাকে ব'লে দিচ্ছি, উনি যদি আবার কখনো ও-রকম বলেন—' অরণি হঠাৎ থেমে গেলো।

'কী করবে তাহ'লে?'

'কী করবো বলুন তো ? সামনের দাঁত দুটো ভেঙে দেবো, না ডান হাতের কবজির হাড়টা ফ্র্যাকচর ক'রে দেবো ?'

'ছি !'

'আপনি যা-ই বলুন, আপনার সামনে ফের যদি ওকে ও-রকম কথা বলতে শুনি, তাহ'লে একটা-কিছু আমি করবোই !'

সবিতা দেবী একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কী খাবে ?'

কাং হ'য়ে বাঁ হাতের উপর মাথা উঁচু ক'রে অরণি বললে, 'কিছু না।—বেশ সুন্দর হচ্ছে ছবিটা। আপনি আঁকুন, আমি দেখি।'

'তুমি এর মধ্যে আর ছবি আঁকোনি ?'

'এঁকেছি।'

'একদিন নিয়ে এসো, দেখবো।'

'এখনই দেখতে পারেন।' অরণি মোটা একটা খাতা হাতে ক'রে এসেছিলো, সেটা এগিয়ে দিলো সবিতা দেবীর দিকে।

সবিতা দেবী খাতাটির পাতা উল্টিয়ে দেখতে লাগলেন। ক্যালকুলসের অঙ্ক, রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন, হিজিবিজি আঁকিবুঁকি, পাশের ছেলের সঙ্গে পেন্সিলের নিঃশব্দ কথোপকথন—এই সবের ফাঁকে-ফাঁকে ফাউন্টেন পেনে আঁকা কয়েকটি ছবি পাওয়া গেলো। একটি মেয়ের ছবি। কখনো ব'সে, কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো মুখ ফিরিয়ে। সবিতা দেবী নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে নিজেকেই যেন দেখতে পেলেন।

'এই সব করো বুঝি ক্লাশে ব'সে ! দুষ্টু !'

'ভালো করি না ? আপনাকে চেনা যাচ্ছে ?'

'ছবি আঁকায় সত্যি তোমার হাত আছে, অরণি। ভালো ক'রে শেখো।'

অরণি গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বললে, 'ও। দিন আমার খাতা।'

'রাগ বুঝি ? এগুলো ভালো হয়নি তা তো বলিনি, বলছিলুম যে—'

'থাক, থাক, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমার খাতা দিন।'

'দিচ্ছি।' সবিতা দেবী এক-এক ক'রে ছবি ক'টা ছিঁড়ে নিয়ে খাতাটা ফিরিয়ে দিলেন।

'আমার ছবি আপনি রাখলেন যে ?'

সবিতা দেবী বললেন, 'ও তো আমার ছবি। এখন ঘরে চলো। কিছু খাবে।'

অরণি প্রায়ই কলেজ কামাই করতে লাগলো ; এদিকে সবুজ সুন্দর রমনা কখনো বর্ষাশেষের জলধারায় আচ্ছন্ন, কখনো মেঘ-ছেঁড়া তেজি রোদ্দুরে উজ্জ্বল।

সেদিন দুপুরে খুব ঘটা ক'রে বৃষ্টি নেমেছিলো। দোতলার বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুয়ে-শুয়ে সবিতা দেবী বৃষ্টি দেখছিলেন এমন সময় বেয়ারা এসে জানালো যে একজন বাবু এসেছেন।

এই বৃষ্টিতে! কী পাগল ছেলে, ভিজে-টিজে একাকার হ'য়ে এসেছে নিশ্চয়ই। আবার এত ভদ্রতা! এমনি তো হুড়মুড় করতে-করতে সোজা উপরেই উঠে আসে!

সবিতা দেবী বললেন, 'বাবুকে এক্ষুনি উপরে নিয়ে এসো।'

কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দটা কেমন অচেনা লাগলো সবিতা দেবীর। হয়তো কোনো ভুল করেছেন এ-কথা তাঁর যখন মনে হ'লো তখন আর ভ্রমসংশোধনের সময় নেই। ভিজে জুতো আর ছাতা নিয়ে ললিতচন্দ্র তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'ও, আপনি!' ব'লেই সবিতা দেবী বুঝতে পারলেন যে কথাটায় নৈরাশ্যের সুর লেগেছে। তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন। বড্ড বৃষ্টি—না? ভিজে যাননি তো?'

ভিজে ছাতাটি দেয়ালে ঠেশ দিয়ে রেখে ললিতচন্দ্র বললেন, 'একটা ঘোড়ার গাড়ি পেয়ে গেলুম, নয়তো আসা আর হ'তো না।' কথাটা এমন শোনালো যেন এই সময়ে তাঁর এখানে আসাটা আগে থেকেই ঠিক ছিলো।

'আপনার ক্লাশ বুঝি আজকের মতো হ'য়ে গেলো?'

'আজ আমার অফ-ডে। আমি বাড়ি থেকেই আসছি।'

সবিতা দেবী চকিতে একবার অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকালেন।

'আপনি বোধহয় আমার কথা শুনে অবাক হচ্ছেন?'

'না, না, আপনি এসেছেন এ তো আনন্দের কথা। বসুন।'

ললিতচন্দ্র একটি চেয়ারে ব'সে বললেন, 'নতুন কয়েকটা কবিতা লিখেছি—আপনাকে শোনাতে এলুম।'

'আমার সৌভাগ্য!' বললেন সবিতা দেবী। একটু পরে আবার বললেন, 'কিন্তু নিজেকে ভারি স্বার্থপর মনে হচ্ছে। সন্ধেবেলা সবাই একসঙ্গে ব'সে শুনলে হ'তো না? উনি সম্প্রতি আপনার লেখার যে-রকম ভক্ত হ'য়ে পড়ছেন—'

সবিতা দেবীর কথায় বাধা দিয়ে ললিতচন্দ্র বললেন, 'সে পরে হবে। এখন শুধু আপনাকেই শোনাতে চাই। আপনার আপত্তি আছে?'

'না—না—আপত্তি কিসের। আপনি পড়ুন।'

বাইরে ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, দিনের আলো ম্লান। ললিতচন্দ্র তিনটি সুগঠিত আঁটোসাঁটো সনেট পড়লেন। তাঁর ছন্দের রেশ বৃষ্টির সুরের সঙ্গে মিশে গেলো।

পড়া শেষ ক'রে ললিতচন্দ্র জিগেস করলেন, 'কেমন লাগলো ?'

সবিতা দেবী বললেন, 'আমি যদি লেখক হতুম, আমি কিন্তু কখনো ও-প্রশ্ন করতুম না।'

'কেন ?'

'ভালো যদি না লাগে, তাহ'লে মানুষকে বিপদে ফেলা হয়। আর ভালো যদি লাগে, তাহ'লে লোকে তো নিজের গরজেই বলবে, জিগেস করতে হবে কেন ?'

'তার মানে—আপনার ভালো লাগেনি ?'

কথাটার সোজা জবাব না-দিয়ে সবিতা দেবী বললেন, 'আপনার লেখার ধরন বদলেছে মনে হ'লো। আপনার মতো নারী-বিদ্বেষীর মুখে নারী-বন্দনা !'

'নারী-বিদ্বেষী ! আপনিও আমাকে ভুল বুঝলেন, সবিতা দেবী !' একটু চুপ ক'রে থেকে ললিতচন্দ্র হঠাৎ আবার বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে প্রথম যখন আলাপ হ'লো, মনে-মনে এ-কথাই ভাবতুম যে সেন-সাহেব তাঁর যোগ্য স্ত্রী পেয়েছেন বটে। কিন্তু এখন দেখছি যে ওঁরই অনেক ভাগ্য যে আপনার মতো স্ত্রী পেয়েছেন।'

'আজ বুঝি আপনার সুশ্রাব্য কথা বলার দিন ?'

'আমাকে ক্ষমা করবেন—ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলতে আমি শিখিনি। আমার যখন যেটা মনে হয় সেটাই ব'লে ফেলি—অপ্রিয় হ'লেও বলি, এমনকি প্রিয় হ'লেও বলতে ভয় পাই না। আপনার কাছে স্বীকার করতে আমার একটুও কুণ্ঠা নেই যে আপনার মতো মেয়ে যে বাংলাদেশে হ'তে পারে, এ আমি কখনো সম্ভব মনে করিনি।'

'এত সম্মানের যোগ্য আমি নই, ললিতবাবু।'

'না, না, আমি ঠিক বলছি। আপনি যে কী, তা আপনি কেমন ক'রে বুঝবেন ? কেন আপনার সঙ্গে আমার আগে দেখা হ'লো না ? কেন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হ'লো ? আমি ছেলেমানুষ নই, চল্লিশের উপরে আমার বয়স, দশ বছর বিবাহিত জীবন কাটিয়েছি, দাদামশাই হয়েছি। নিজের মনকে শাসন করবার চেষ্টাও তো কম করিনি, কিন্তু তাকে বেঁধে রাখতে পারলাম না তো। এই বৃষ্টির মতোই আমার মন আজ আত্মহারা। সবিতা !'

সবিতা দেবী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি বড্ড ভিজেছেন—এখন বাড়ি যান, নয়তো অসুখ করবে।'

ললিতচন্দ্র শূন্য চোখে সবিতা দেবীর দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।

সবিতা দেবী আবার বললেন, 'আপনি এখন বাড়ি যান।'

ললিতচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন, দেয়ালের কোণ থেকে ছাতাটি তুলে নিয়ে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। ভিজে ছাতা থেকে ঝ'রে-ঝ'রে একটা ক্ষীণ জলস্রোত বারান্দা পার হ'য়ে সিঁড়ির প্রান্ত দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো, সেই দিকে তাকিয়ে সবিতা দেবী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এর পরে অরণি অবাক হ'য়ে দেখলো যে ও-বাড়িতে ললিতবাবুর যাতায়াত বন্ধ। তার এত ফুর্তি হ'লো যে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারলো না। কয়েকদিন পর সে মুখ ফুটে মনের কথাটা ব'লেই ফেললো, 'আচ্ছা, ললিতবাবু কি আর আসছেন না?'

সবিতা দেবী বললেন, 'তাই তো দেখছি।'

'হঠাৎ তাঁর এত সুমতি?'

সবিতা দেবী চিন্তিত মুখে বললেন, 'তুমি ওঁকে কিছু বলোনি তো?'

'আমি? ব'য়ে গেছে আমার ওঁর সঙ্গে কথা বলতে!'

'কী জানি—যে গোঁয়ার ছেলে তুমি—আমার ভয় হচ্ছিলো সত্যিই বুঝি একদিন কিছু ব'লে বসো।'

অরণি পিঠের তলায় গোটা তিনেক কুশান সাজিয়ে সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে বললে, 'আঃ! বাঁচা গেলো!'

কিন্তু অরণির সুখ স্থায়ী হ'লো না। একদিন সেন-সাহেব স্ত্রীকে বললেন, 'ছাখো, ললিতবাবু অনেকদিন আসেন না। কোনো অসুখ-বিসুখ করলো না তো ভদ্রলোকের?'

সবিতা দেবী বললেন, 'না, উনি ভালোই আছেন।'

'তাহ'লে আসেন না কেন?'

'ওঁর আর আমাদের এখানে না-আসাই ভালো।'

'কেন?' সেন চমকে উঠলেন।

'আমার তা-ই মনে হয়।'

স্ত্রীর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে সেন বললেন, 'কী বলতে চাও তুমি বলো তো?'

ঈষৎ হেসে সবিতা দেবী বললেন, 'যদি বলি উনি আমার প্রেমে পড়েছেন?'

সেন হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, 'Don't be silly.'

'ঠাট্টা নয়—সত্যি।'

সেন একটু উদ্বিগ্নস্বরে জিগেস করলেন, 'তুমি—তুমি কি ওঁকে কিছু বলেছো?'

'আমি আর কী বলবো।'

দু' চার বার পাইপে টান দিয়ে সেন বললেন, 'ও কিছু না—বিপত্নীক মানুষ, একা-একা থাকেন, অসতর্ক মুহূর্তে একটু না-হয় দুর্বলতাই প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন। আর তুমিও তো চিত্তহারিণী কম নও। I am not surprised.'

সবিতা দেবী সংক্ষেপে বললেন, 'আমার ভালো লাগেনি।'

'কী যে বলো। ওঁকে এ-রকম একটা লজ্জার মধ্যে রাখা কি উচিত? না কি এই সামান্য কারণে আমরাই একজন গুণীজনের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হ'তে পারি? চলো আজই ওঁকে ডেকে নিয়ে আসি।'

'আমি যাবো না।'

'তাহ'লে আমি একাই যাই।'

সেদিনই কোর্ট থেকে ফেরবার পথে সেন ললিতবাবুকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বাড়ি এলেন। আবার যাওয়া-আসা সাহিত্যচর্চা শুরু হ'লো। সবিতা দেবী অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ড্রয়িংরুমে এসে বসেন, আলাপ-আলোচনায় যোগ দেন। অনুষ্ঠানে কোনো ত্রুটি হয় না, অন্যান্য অতিথিরা কিছুই লক্ষ্য করে না, কিন্তু তিনজন লোক বুঝতে পারে যে যেমনটি ছিলো ঠিক তেমনটি আর হচ্ছে না।

কয়েকদিন পরে অরণি লাফাতে-লাফাতে এসে বললে, 'ঐ রাবণটাকে আবার দেখছি যে?'

সবিতা দেবী হেসে বললেন, 'ভয় কী! লক্ষ্মণই তো আছে।'

'লক্ষ্মণকে ফাঁকি দেয়াই তো রাবণের পেশা। ওকে আপনি বিদেয় করুন!'

'তুমি এখানে আসো ব'লে কি আর-কেউ আসতে পারবে না?' একটু কঠোর স্বরে বললেন সবিতা দেবী।

অরণি তক্ষুনি বেরিয়ে গেলো, এবং রাগ ক'রে তিন দিন এলো না। সবিতা দেবী নিজে ওর বাড়ি গেলেন, সেনকে সুদ্ধু নিয়ে গেলেন, তবে ওর মান ভাঙলো।

রাত্রে খাবার টেবিলে সবিতা দেবী বললেন, 'অরণিটা ভারি ছেলেমানুষ।'

সেন বললেন, 'ওর বয়েসটাও তা-ই।'

'এটা ওর বয়েস নয়, ওর স্বভাব। আমার মনে হয় ওর ছেলেমানুষি কোনোদিনই ঘুচবে না।'

'ওর চেঁচামেচি লাফালাফি আমার বেশ লাগে। কিন্তু আমাকে ও লজ্জা করে। তোমার সঙ্গেই ওর মনের কথা।'

'এখানে ওকে এ-রকম গ্যাখো তো—বাড়িতে ও একেবারে অন্য মানুষ। কারু

সঙ্গে কথা বলে না, চোখ-মুখ গম্ভীর। আসলে ওর বাড়িটা একটু সেকেলে কিনা, তার হালচাল ওর পছন্দ নয়।'

'সেইটেই তো জীবনের আদি সমস্যা যে আমাদের বাপ-মা আমরা বেছে নিতে পারি না। এত বড়ো একটা ঘটনার জন্য অন্ধ অদৃষ্টের উপরেই নির্ভর করতে হয়।'

'জানো, ওর বাবা ওর বিয়ে দিতে চাচ্ছেন!'

'বিয়ে! এইটুকু বয়সে!'

'ওর ইচ্ছে বি. এ. পাশ ক'রে ছবি আঁকা শিখতে প্যারিসে যায়—ওর বাবার তাতে মত নেই।'

'কেনই বা থাকবে? ছবি এঁকে কি পয়সা হয়?'

'শেষ পর্যন্ত ওর বাবা কোন-এক জমিদারের বারো বছরের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের প্রস্তাব এনেছেন—শ্বশুর নাকি দশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত। ছেলে শ্বশুরের টাকা নিয়ে যা খুশি করুক তাতে ওঁর আপত্তি নেই, ওঁর নিজের রক্ত-জল-করা পয়সা নষ্ট হ'তে দেবেন না উনি।'

'এ-বিষয়ে অরণির কী-মত?

'ও বলছে যে আবার যেদিন বিয়ের কথা ওর কানে আসবে, তার পরের দিন ওকে বাড়িতে আর দেখা যাবে না।'

'এসে এখানে উঠবে তো?'

সবিতা দেবী হেসে ফেললেন।—'আমি ভাবছিলাম আমরাই তো ওকে প্যারিসে পাঠাতে পারি।'

আইসক্রীমের স্ফটিকপাত্রে রুপোর চামচেটা বার দুই ঠুকে সেন বললেন, 'সত্যি বলছো?'

'ছবি জিনিশটা ওর প্রাণের মধ্যে আছে, প্যারিস তো ওরই জায়গা। আমাদের ছেলে থাকলে তাকে তো আমরা ইওরোপে পাঠাতাম।'

সেন দু'চামচে আইসক্রীম খেয়ে বললেন, 'দেখা যাক।'

বর্ষা কেটে গিয়ে শরৎ এলো, পুজোর ছুটিতে সেনেরা পনেরো দিনের জন্য দারজিলিং গেলেন। অরণিকে সঙ্গে নিলেন সবিতা দেবী। সেন ঠাট্টা করলেন—'ওরে বাবা! অরণিকে ছাড়া দেখি আর এক দণ্ড চলে না আজকাল।' সবিতা দেবী বললেন, 'তুমি তো ন'টার আগে লেপের তলা থেকে উঠবে না, ও থাকলে ওর সঙ্গেই আমি আর চিত্রা বেড়াতে পারবো—তোমাকে বিরক্ত করতে হবে না।'

দারজিলিং-এ অরণির এই প্রথম আসা। পাহাড় আছে, তুষার আছে, বেড়াবার অফুরন্ত রাস্তা আর অবসর আছে, ললিতবাবু নেই। তার আনন্দের সীমা রইলো না।

পনেরো দিনে পাঁচ সের ওজন বাড়িয়ে সে চেহারা এত ভালো ক'রে ফিরে এলো যে তার বাপ-মা অবাক হ'য়ে গেলেন।

শীত প'ড়ে এলো, সামনের এপ্রিলে অরণির পরীক্ষা। সবিতা দেবী বললেন, 'একটু-আধটু পড়াশুনো করছো তো?'

অরণি বললে, 'আপাতত অ্যানুএল স্পোর্টস-এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।'

খেলাধুলায় নাম ছিলো অরণির। গেলো বারের স্পোর্টস-এ পাঁচটা প্রাইজ একাই নিয়েছিলো। সবিতা দেবী তার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'এবারে আটটা প্রাইজ নেয়া চাই।'

বড়োদিনের ছুটির আগে স্পোর্টস-এর দিন পড়লো। আকাশ ঝকঝকে নীল, শীতের সোনালি রোদ্দুরে সমস্ত রমনা হেসে উঠেছে। ইউনিভর্সিটির মস্ত মাঠে তাঁবুর তলায় শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসেছেন, তাঁদের সঙ্গে বসেছে ছাত্রীরাও। ছেলের দল ছবির ফ্রেমের মতো মাঠটিকে চারদিকে ঘিরেছে, তবে সে-ফ্রেম নিশ্চল নয়, অত্যন্ত সচল, সজীব ও সরব।

পনেরোটা প্রতিযোগিতার মধ্যে বারোটাতেই নাম দিয়েছিলো অরণি। খেলা আরম্ভ হবার সময় হ'লো, সবিতা দেবী উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছেন কখন অরণি তার লম্বা ছিপছিপে বেতের মতো নমনীয় দেহটি নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবে। এমন সময় একটা বিস্মিত গুঞ্জন মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঢেউ খেলিয়ে গেলো—অরণি অনুপস্থিত।

জগন্নাথ হল্‌-এর প্রভস্ট ডক্টর সরকার ব্যস্ত হ'য়ে অরণির বাড়িতে সাইকেল দিয়ে লোক পাঠালেন। কুড়ি মিনিট পরে লোকটি হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে এসে জানালো অরণি বাড়ি নেই।

খেলা আরম্ভ হ'লো। মাঠের সমস্ত আলো ম্লান হ'য়ে গেলো সবিতা দেবীর চোখে। নির্জীবের মতো চুপ ক'রে ব'সে তিনি দেখতে লাগলেন, এবং আধ ঘণ্টা পরেই উঠে দাঁড়ালেন।

—'আমার শরীরটা ভালো লাগছে না, আমি বাড়ি যাই।'

সেন ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।—'আর-একটু বসবে না? এই sack race ভারি মজার।'

'না। আমার মাথা ধরেছে। রোদ্দুরে তাকাতে পারছি না,' ব'লে সবিতা দেবী হাত-ব্যাগ খুলে একটি কালো চশমা চোখে পরলেন।

'খুব খারাপ লাগছে তোমার ? তাহ'লে চলো আমিও যাই।'

'না না, তোমাকে আসতে হবে না। বাড়ি গিয়ে একটু শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে। চিত্রা থাক তোমার কাছে। আমি গিয়েই গাড়িটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বাড়ি এসে সবিতা দেবী দেখলেন, দোতলার বারান্দায় একটি চেয়ারে ব'সে এবং আর-একটি চেয়ারে পা তুলে দিয়ে অরণি খবর-কাগজ পড়ছে।

'দুষ্টু ছেলে! এই তোমার কাণ্ড!'

অরণি কাগজটা ফেলে দিয়ে বললে, 'আপনি চ'লে এলেন যে ?

'তুমি যাওনি কেন ?

অরণি গম্ভীর গলায় বললে, 'ইচ্ছে।'

'বদ্ধ পাগল! তোমার হয়েছে কী ?'

'আপনার সামনে হাফ-প্যান্ট আর গেঞ্জি প'রে আমি বেরোতে পারবো না।'

'কী বললে ? সবিতা দেবীর সন্দেহ হ'লো কথাটা তিনি ঠিকমতো শুনতে পাননি।

'যা বললুম তা-ই। কেটে ফেললেও পারবো না। বাড়িতে থাকলে ওরা নিশ্চয়ই ডেকে পাঠাতো – তাই এখানে পালিয়ে আছি।'

সবিতা দেবী স্তব্ধ হ'য়ে অরণির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অরণি আস্তে-আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

যে-পরীক্ষাক্ষেত্রে অরণি সগৌরবে উত্তীর্ণ হ'তে পারতো সেটা সে হেলায় হারালো, কিন্তু যে-পরীক্ষায় তার ভাগ্য অনিশ্চিত, সেই বি এ. পরীক্ষা দিতে কয়েক মাস পরে কর্জন হল্‌-এ ঢুকলো সে। ললিতচন্দ্রের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হ'লো না, অরণি ফেল করলো।

ফেল ক'রে তার মন-খারাপ হ'য়ে গেলো এই কথা ভেবে যে তার বাবা হয়তো আরো একবার তাকে ঐ ঘৃণ্য বি. এ. পরীক্ষার দরজায় কপাল ঠুকতে বাধ্য করবেন। কিন্তু বেশিদিন সে এ নিয়ে ভাববার সময় পেলো না, কারণ ঠিক এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটলো যা যেমন আকস্মিক তেমনি মর্মান্তিক। সেন-সাহেব হার্টফেল ক'রে মারা গেলেন। তাঁর জীবনযাত্রার নিত্য সঙ্গী তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রটি ভিতরে-ভিতরে বিকল হ'য়ে আসছিলো –বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায়নি, হঠাৎ একদিন তাঁকে বৈতরণীর পরপারে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে চিরকালের মতো স্তব্ধ হ'য়ে গেলো।

সমস্ত রমনা ভেঙে পড়লো সবিতা দেবীর বাড়িতে, ললিতচন্দ্রও এলেন। সবিতা দেবীর চোখে জল নেই, তাঁর দেহটি পাথরের মূর্তির মতো। কিছু বলবার নেই, চুপচাপ খানিকক্ষণ ব'সে থেকে সবাই একে-একে বিদায় নিতে লাগলেন। ইউনিভর্সিটির

কয়েকটি জোয়ান ছেলে ফুল দিয়ে খাট সাজালো, তারপর বিকেলের আলো যখন লাল হ'য়ে এসেছে, সেন-সাহেবকে কাঁধে ক'রে বেরিয়ে পড়লো। সবিতা দেবী বাড়ির গেট থেকেই স্বামীকে বিদায় দিলেন, ছেলেরা যখন কাঁধে তোলবার আগে কোমরে গামছা বাঁধছে তখন শুধু একটি কথা বললেন, 'হরিধ্বনি দিয়ো না।' তারপর উপরে ফিরে তাঁদের যুগল-শয্যার একটি খাটে ব'সে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। দিনের আলো মিলিয়ে এলো।

এতক্ষণ অরণিকে কোথাও দেখা যায়নি। দোতলারই একটি ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে চিত্রাকে নিয়ে সে ব্যস্ত ছিলো। এতক্ষণে চিত্রাকে সে এক পেয়ালা দুধ খাইয়ে কথা ব'লে-ব'লে ঘুম পাড়াতে পেরেছে। একটু ব'সে থেকে যখন বুঝলো যে চিত্রার ঘুম বেশ গভীর হয়েছে, আস্তে দরজা খুলে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এসে সবিতা দেবীর ঘরে ঢুকলো। আবছা অন্ধকারে দেখা গেলো সবিতা দেবী গালের উপর হাত রেখে পাশ ফিরে শুয়েছেন, দক্ষিণে হাওয়ায় তাঁর কপালের চুলগুলি নড়ছে। অরণি কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললো, 'ওঠো, এখন কিছু খাবে।'

এই প্রথম সে সবিতা দেবীকে তুমি বললো।

সে-রাত্রে অরণি দোতলার বারান্দাতেই শুয়ে থাকলো, পরের দিন বেলা একটায় সবিতা দেবী আধখানা কলা ও এক পেয়ালা কফি খেলেন, তবে সে বাড়ি ফিরলো। ফিরলো বটে, কিন্তু চারটে না-বাজতেই আবার বেরিয়ে পড়লো সাইকেল নিয়ে। মোটর-সাইকেলটি নিলে না, ওতে বড়ো শব্দ হয়।

দিন-রাত্রির বেশির ভাগ সময় ও-বাড়িতেই কাটাতে লাগলো অরণি। তার যে এত শক্তি, এত নৈপুণ্য তা কি সে নিজেই কোনোদিন জানতো! চিত্রাকে ভুলিয়ে রাখা তার মস্ত কাজ। তারপর ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে চিঠি লেখা, আত্মীয়দের খবর পাঠানো, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করা, সক্সেশন সার্টিফিকেট পেতে যাতে দেরি না হয় তার যথসাধ্য চেষ্টা – সবই সে নিজের ঘাড়ে তুলে নিলে। সবিতা দেবীও তাঁর শোকাচ্ছন্ন অবসন্ন দেহ-মন নিয়ে অরণির উপর একান্ত নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত হলেন।

অরণির বাবা ও বিধবা পিসিমা এতটা মেশামেশি ভালো চোখে দেখলেন না। জানা গিয়েছিলো যে সবিতা দেবী বৈধব্যের কোনো নিয়মই পালন করছেন না ; তাঁর পরনের শাড়িটি এখনো রঙিন, গায়ে এখনো গয়না শোভা পাচ্ছে, এবং খুব সম্ভব তিনি মাছমাংসও খাচ্ছেন। যে-মেয়ে বিধবা হ'য়েও বিধবা হয় না, সে যে কিছুতেই ভালো 'জাতের' নয়, এবং তার সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশার ফল অরণির মতো মূঢ় বালকের পক্ষে যে বিষময়

হ'তে বাধ্য, এ-বিষয়ে অরণির বাবার সঙ্গে তাঁর দিদির প্রায়ই সারগর্ভ আলোচনা হ'তে লাগলো। অরণির মা একদিন তাঁদের কথার মধ্যে বলতে গিয়েছিলেন, 'আহা—তাতে আর কী হয়েছে—আজকাল ও-সব নিয়ম-টিয়মের দিন আর আছে নাকি—আর জপতপ উপোশ করলেই যে মানুষ ভালো হয় তাও তো নয়।' কথাটা শেষ হওয়ামাত্র বাবা খেঁকিয়ে উঠলেন 'ও, তোমারও বুঝি মডর্ন হবার শখ হয়েছে, আমি ম'রে গেলে তুমিও কুমারী সেজে বেড়াবে বুঝি!' আর কথাটার শেষ অংশ নিজের প্রতি প্রয়োগ ক'রে নিয়ে পিসিমা কোমরে দু'হাত রেখে মোটা শরীরটি দোলাতে-দোলাতে এমন একটি ওজস্বী বক্তৃতা আরম্ভ করলেন যে মা ভয় পেয়ে সেই যে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন, রাত দশটার আগে আর বেরোলেনই না।

কিন্তু ছেলেকে কিছুতেই ঘরে বেঁধে রাখা গেলো না। ক্রমে এমন হ'লো যে বাড়িতে সে আর প্রায় থাকেই না। সবিতা দেবীর বাড়িতেও তার চাল-চলন একটু অদ্ভুত। যখন সবিতা দেবীকে সমবেদনা জানাতে কেমিস্ট্রির প্রোফেসর কিংবা ফিলজফির রীডর সস্ত্রীক আসেন, তখন সে নিঃশব্দে অন্তর্হিত হয়; সেনের ড্রয়িংরুমে নিয়মিত যাঁরা আড্ডা জমিয়েছেন তাঁরা যখন আসেন তখনও তাকে চোখে দেখা যায় না। সে সব সময় ও-বাড়িতেই আছে, অথচ অন্য-কেউ এলেই নিজেকে একবারে মুছে ফেলে; যে-বিরাগ এতদিন তার শুধু ললিতচন্দ্রের উপরেই ছিলো, আজ যেন তা সবিতা দেবীর পরিচিত যে-কোনো ব্যক্তির প্রতি সংক্রমিত হয়েছে। এদিকে সবিতা দেবীর সঙ্গেও সে যেটুকু কথা বলে, তা নিতান্তই কাজের কথা। দুপুরবেলা সবিতা দেবী শুয়ে থাকেন, হয়তো ঘুমোন, হয়তো ঘুমোন না; বারান্দার এক কোণে চিত্রার সঙ্গে সমবয়সির মতো পুতুল নিয়ে খেলা করে, তারপর খেলতে-খেলতে ক্লান্ত হ'য়ে চিত্রা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তাকে কোলে ক'রে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সবিতা দেবীর ঘরের দরজার কাছে একটি চেয়ার টেনে চুপ ক'রে ব'সে থাকে। ঘুমের মধ্যে সবিতা দেবীর জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়ে, কান পেতে তা-ই শুনে-শুনে তার বেলা কেটে যায়।

অরণির তৎপরতায় দিন পনেরোর মধ্যেই সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেলো। সবিতা দেবী বললেন, 'এবার তোমাদের ছেড়ে যাবার দিন এলো, অরণি।'

'কোথায় যাবে?'

'কলকাতা।'

'আমিও যাবো।'

'তুমি যাবে কেন?'

'বাড়ির সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নেই। একটা কাজও পেয়ে গেছি কলকাতায়।'

'আর পাগলামি কোরো না, অরণি।'

'বাঃ, সত্যি আমি যাবো যে।'

আর-কোনো কথা হ'লো না। সবিতা দেবীর মনে হ'লো, আরব্যোপন্যাসের পাতা থেকে কোনো জিন উঠে এসে যাত্রার সমস্ত আয়োজন চোখের পলকে সম্পূর্ণ ক'রে দিলো। অরণিকে কিছু বলতেও হয় না, চোখের দিকে তাকিয়ে সে মনের ইচ্ছা বুঝতে পারে, কলের মতো ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করে। যে-কাজ করতে দশ জন বলবান পুরুষের হাঁপিয়ে পড়বার কথা, তার সমস্ত ভার একা বহন ক'রেও তার ক্লান্তি নেই।

যাত্রার দিন এলো। সকালবেলা বাপ রাগ ক'রে বললেন, 'দূর হ, দূর হ আমার বাড়ি থেকে।' মা গোপনে তার হাতে দু'খানা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে চোখের জল মুছলেন। অরণি বললে, 'আমার মোটর-সাইকলটা বেচে দিয়ো মা, টাকাটা তুমি নিয়ো।' তারপরে একটি স্যুটকেস ও একটি শতরঞ্চি-মোড়া বিছানা ঘোড়ার গাড়ির মাথায় চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। মা জানলার শিক ধ'রে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন।

সবিতা দেবীকে বিদায় দিতে স্টেশনে এসেছিলেন ললিতচন্দ্র এবং আরো দু'চারজন। পাদ্রি প্রোফেসর তাঁদের গাড়িটা শস্তা দামে কিনে নিয়েছিলেন, ট্রেন ছাড়বার মিনিট দশেক আগে সেই গাড়ি চ'ড়ে তিনিও এসে হাজির। সবিতা দেবী সকলের সঙ্গেই কথা বললেন, সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞতা জানালেন। ললিতচন্দ্র ছাতাটি হাতে নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন যে তাঁর যে নতুন সনেটের বইটি ছাপা হচ্ছে সেটি সুরেশ্বর সেনের স্মৃতিতেই উৎসর্গ করবেন। পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা বাজলো—অরণি এতক্ষণ হুইলরের স্টলে দাঁড়িয়ে বই দেখছিলো, এইবার আস্তে-আস্তে এসে গাড়িতে চ'ড়ে বসলো। এই শেষের ক'মিনিট বলবার মতো কোনো কথা খুঁজে পাওয়া শক্ত। পাদ্রি সাহেব একটু কাশলেন, হাওয়ায় একটু ধুলো উড়লো। ললিতচন্দ্র এগিয়ে এসে গাড়ির জানলা ধ'রে দাঁড়ালেন। সবিতা দেবী তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, চলি।'

উল্টোদিকের বেঞ্চিতে অরণি ব'সে ছিলো চিত্রাকে নিয়ে—দু'জনের মাঝখানে চকোলেট, বিস্কুট, ছবির বই ইত্যাদি শিশুলোভন বিচিত্র সামগ্রী ছড়ানো। আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখিয়ে ললিতচন্দ্র আস্তে বললেন, 'ওকে নামতে বলুন, গাড়ি এক্ষুনি ছাড়বে।'

'ও-ও যাচ্ছে।'

'ও, নারানগঞ্জে একেবারে স্টিমারে তুলে দেবে বুঝি?'

'না, কলকাতাতেই যাচ্ছে।'

ললিতচন্দ্র আর-কিছু বললেন না না। গাড়ি ছেড়ে দিলো। এর পরে কিছুদিন

পর্যন্ত সবিতা দেবীর সঙ্গে অরণির নাম জড়িয়ে একটা পরম রমণীয় পরচর্চার কণ্ডুয়নে রমনার অনেক রসনা ঈষৎ আলোড়িত হ'লো। তারপর সবিতা দেবীর স্মৃতি ফিকে হ'য়ে এলো, রমনার সেই বাড়িটি একজন ফিরিঙ্গি পুলিশ-সাহেব দখল করলেন, গ্রীষ্মের ছুটির পরে বিশ্ববিদ্যালয় খুললো এবং ললিতচন্দ্র ও অন্যান্য অধ্যাপকেরা আবার তারস্বরে চীৎকার করতে লাগলেন।

কলকাতায় এসে সবিতা দেবী তাঁর মামাতো বোনের বাড়িতে উঠলেন। অরণি সে-বাড়িতেই চা খেয়ে, স্নান ক'রে, তারপর ভাত খেয়ে বেরিয়ে গেলো, কাছাকাছি একটি মেস ঠিক ক'রে এবং আরো দু'একটি কাজ সেরে দু'তিন ঘণ্টা পরেই ফিরে এলো। সবিতা দেবী নিচে বসবার ঘরেই ব'সে ছিলেন, তাকে দেখে পাখার স্পীড একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললেন. 'তুমি এখন কী করবে?'

অরণি ধুপ ক'রে একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললে, 'চাকরি ঠিক ক'রে এলাম।'

'কোথায়?'

'একটা মোটরের কারখানায়। ঢাকাতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, তিনি কথা রেখেছেন যা হোক। এখন অ্যাপ্রেনটিস ক'রে নিচ্ছে, চল্লিশ টাকা ক'রে মাইনে দেবে। বেশ ভালো—না?' অরণির চোখ-মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

সবিতা দেবী চুপ ক'রে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দৃষ্টি যদি স্পর্শ করতে পারতো, তাহ'লে অরণির রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত শরীর সেই মুহূর্তে অমৃত হ'য়ে উঠতো।

অরণি বলতে লাগলো, 'একটা মেস্‌ও ঠিক ক'রে এসেছি—আমার আর-কোনো ভাবনা নেই। ঢাকায় আর ফিরতে হবে না।'

'বাড়িতে চিঠি লিখেছো?'

'মা-কে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিলাম। কলকাতায় পা দিতে-না-দিতেই চাকরি—মা যা অবাক হবেন।' পাঞ্জাবির পকেটে সেই একশো টাকার নোট দু'খানা একবার অনুভব ক'রে অরণি আবার বললে, 'এখন তোমার কী ব্যবস্থা করবো, বলো।'

'আমার ব্যবস্থা—তুমি করবে?'

'আমি ছাড়া আপাতত আর-কেউ নেই যখন—' সবিতা দেবী লক্ষ্য করলেন যে কলকাতায় এসেই অরণির কথাবার্তা চালচলন অনেক সহজ হ'য়ে এসেছে।—'প্রথম কাজ হ'লো তোমাকে একটা বাড়ি খুঁজে দেয়া। কোন পাড়ায়, কত টাকা ভাড়ার মধ্যে, কী-রকম বাড়ি চাই, বলো।'

সবিতা দেবী জবাব দিলেন, 'পাড়া ল্যান্সডাউন রোড, ভাড়া দেড়শোর বেশি নয়, সামনে জমি চাই, একটি বসবার ঘর, একটি খাবার ঘর ও তিনটি শোবার ঘর চাই।'

'শোবার ঘর তিনটি কেন?'

'একটি তোমার।'

অরণি মাথা নেড়ে বললে, 'হুঁ'।'

'উহুঁ মানে?

'উহুঁ মানে না। আমি এখন স্বাধীন, স্বাবলম্বী।'

'তুমি তাহ'লে মেস্‌-এই থাকবে?'

অরণি কথাটার কোনো জবাব দেয়া দরকার মনে করলো না। পকেট থেকে সিগারেট বের ক'রে বললে, 'অনুমতি করো তো একটা খাই। অনেকদিন লজ্জা করেছি তোমার কাছে—আর পারি না।'

'বাঃ, এ-বিদ্যেটিও শিখে নিয়েছো?'

অরণি হাঁটুর উপর হাঁটু তুলে বয়স্ক ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালো।

সবিতা দেবী বললেন 'তোমার পকেট থেকে কী প'ড়ে গেলো যেন।'

অরণি নিচু হ'য়ে একশো টাকার নোট দু'খানা কুড়িয়ে নিলে। হাত বাড়িয়ে বললে, 'এ দুটো রাখো না তোমার কাছে।'

'কী?'

'টাকা। দেখলে তো কাণ্ড, কখন হারিয়ে-টারিয়ে ফেলবো—তোমার কাছেই থাক।' একটু পরে আবার বললে, 'চ'লে আসবার সময় মা দিয়েছিলেন।'

রয় স্ট্রিটে সুন্দর একটি একতলা বাড়ি খুঁজে বের করলো অরণি। সবিতা দেবীর বর্ণনার সঙ্গে অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেছে। সামনে পিছনে জমি, চারদিক খোলা, খান পাঁচেক ঘর, তিনটে বাথরুম, দুটো বারান্দা। বেশি হ'তে পারতো, কিন্তু ভাড়া ঠিক দেড়শো। ঢাকার আসবাবপত্র কিছু ছিলো সরকারি, নিজের জিনিশ সব বেচে দিয়েছিলেন সবিত দেবী। তার জন্য অরণি এত ভালো দাম আদায় করেছিলো যে প্রায় সেই টাকাতেই নতুন সব ফার্নিচার কেনা হ'য়ে গেলো। কলকাতায় পৌঁছবার ঠিক দশ দিন পরে সবিতা দেবী চিত্রাকে নিয়ে সুসজ্জিত গৃহে উঠে এলেন। হাঙ্গামাটা সব অরণি মাথা পেতে নিলে, সবিতা দেবীর গায়ে একটু আঁচও লাগলো না।

সেন সাহেব দারুণ খরচ করতেন, প্রভিডেন্ট ফণ্ড আর ইনশিওরেন্স পলিসি দুটোই দেনার কামড়ে অনেকটা কাহিল হ'য়ে ছিলো, সবসুদ্ধু পঁচিশ হাজারের বেশি পাওয়া গেলো না। খরচ করতে হ'লে ও-টাকা আর ক'দিন। সবিতা দেবী জীবনযাপনের উচ্চ স্বরগ্রাম একটুও নামালেন না, তাঁর কন্যা জন্ম থেকে যে-রকম জীবনযাপনে অভ্যস্ত, ঠিক সেইভাবে তাকে বড়ো ক'রে তুলবেন, মনে-মনে এই তাঁর পণ। জীবনে শক্তিপরীক্ষার

আহ্বান যখন এসেইছে, ভয় পাবেন না তিনি, পালিয়ে যাবেন না, গ্রহণ করবেন সেই আহ্বান, তার সমকক্ষ অন্তত হবেন। রোদ্দুরে ঘুরে-ঘুরে একটা মেয়েদের ইশকুলে আড়াই-শো টাকা মাইনের চিত্রাঙ্কন-শিক্ষয়িত্রীর কাজ জোগাড় ক'রে ফেললেন। ড্রয়িংক্লাশ হয় সপ্তাহে মাত্র দু'দিন, বাকি সময়টা নানারকম বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকা অভ্যাস করতে লাগলেন। ক্রমে বিজ্ঞাপনওলাদের নজর তাঁর উপর পড়তে লাগলো। মাস ছয়েকের মধ্যে মাসিক পাঁচশো টাকা আয়ের ব্যবস্থা যখন হ'লো, তখন নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। অরণিকে বললেন, 'এবার তোমার কারখানা ছেড়ে দিয়ে আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হও।'

'পাগল!' চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে অরণি হেসে উঠলো।

সবিতা দেবী অনেক সাধ্য-সাধনা করলেন, কিন্তু অরণি কথাটা কানেই তুললো না।

ওভরঅল প'রে উদয়াস্ত মোটরের ফ্যাক্টরিতে কুলির মতো খাটে, তারপর সন্ধ্যাবেলা মেস্-এ ফিরে স্নান ক'রে, ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে আসে রয় স্ট্রিটে। তার চা আর রাত্তিরের খাবার ওখানেই বরাদ্দ। মেস্-এ খেতে তার ঘেন্না করে, ওটা শুধু তার শোবার জায়গা, আর কিছুই নয়। সকালে উঠে এক পেয়ালা চা আর দুই খণ্ড ক্ষীণকায় মাখন-ছোঁয়ানো তোস-রুটি দোকান থেকে আনিয়ে খেয়ে নেয়, তারপর স্নান ক'রে বেরিয়ে যায় কাজে। একবার কারখানার মধ্যে ঢুকলে বাইরের বিশ্বজগতের কথা কিছু আর তার মনে থাকে না। লাঞ্চের ছুটির সময় জঠরানল দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে, শিখের দোকানের মোটা-মোটা দুটো রুটি আর সেই সঙ্গে কিছু মাংস বা আলুর দম দ্রুতবেগে পাকস্থলীকে চালান ক'রে দেয়, ভালো ক'রে চিবোবারও সময় হয় না। চারটের সময় আবার এক পেয়ালা চা। তারপর সন্ধের কিছু আগে কারখানার মাতৃগর্ভ থেকে মুক্ত জীবলোকে তার পুনর্জন্ম হয়। একটি সিগারেট ধরিয়ে রয় স্ট্রিটের দিকে যখন সে হাঁটতে আরম্ভ করে, সারা দিনের মধ্যে তখনই সে প্রথম অনুভব করে যে সে মানুষ এবং সে বেঁচে আছে।

সবিতা দেবীর গৃহে ভোজের আয়োজন যেমন স্বাদু, তেমনি বিচিত্র। সুসজ্জিত ঘরে টেবিলে ব'সে খেতে-খেতে তার দিনের জীবনের সঙ্গে রাতের জীবনকে অরণি যেন মেলাতে পারে না। খাবার পরে গল্প করতে-করতে এগারোটা বেজে যায়, কোনো রাতে বারোটা। সবিতা দেবী বলেন, 'এখানেই শুয়ে থাকো', কিন্তু অরণি কিছুতেই রাজি হয় না। সে স্বাধীন হয়েছে, কলকাতার শহরে একখানা ছোটো ঘরের অর্ধাংশের জন্য মাসে-মাসে রীতিমতো ভাড়া দেয়, তার এই গৌরব কোনোরকমেই ক্ষুণ্ণ হ'তে দেবে না সে। যত রাতই হোক, বাইরে ঝড়বৃষ্টি যা-ই থাক, তার মেস্-এ সে ফিরে

যাবেই। এক মাইল মতো রাস্তা, অথচ ট্র্যাম-বাসের সুবিধে নেই, রিকশ নেবার পয়সা থাকে না, হেঁটেই ফেরে। কোনো-কোনো রাত্তিরে হাঁটতে-হাঁটতে প্রায় ঘুমে ঢ'লে পড়ে, মেস্-এর ঘরে ঢুকে বালিশে মাথা ঠেকানোমাত্র তলিয়ে যায়। সবিতা দেবী এক-একদিন বলেন, 'তোমার জন্যেই আমাকে একটা গাড়ি কিনতে হবে, দেখছি।' অরণি গম্ভীরভাবে বলে, 'কয়েক বছর পর আমিই কিনবো।'

তার কথাটা প্রলাপবাক্য নয়। উচ্চাশা তার হৃদয়কে দংশন করেছিলো। নিজেকে সে বিকিয়ে দিয়েছিলো ঐ কারখানায়। বিদ্যুৎবেগে সে কাজ শিখতে লাগলো, কোনো বাঙালি ছেলেকে কখনো বোধহয় এমন আসুরিক খাটুনি খাটতে দেখা যায়নি। শীতকালে বম্বাই থেকে কম্পানির বড়ো কর্তা ফ্যাক্টরি দেখতে এলেন। তিনি মার্কিন, সকলের সঙ্গেই গণতান্ত্রিক করমর্দন ক'রে বিদায় নিলেন। অরণির সঙ্গে কথা বললেন মিনিটখানেক। সাতদিন পরে খবর এলো যে অরণির আশি টাকা মাইনে হয়েছে, এবং এই মুহূর্তে তাকে বম্বাই যাত্রা করতে হবে।

পরের দিনই অরণি চ'লে গেলো। সবিতা দেবী চিত্রাকে নিয়ে স্টেশনে এলেন। থর্ড ক্লাশের ভিড়ের মধ্যে অরণি ব'সে আছে। সবিতা দেবীকে দেখেই অনেক কসরৎ ক'রে প্ল্যাটফরমে নেমে পড়লো। আগের রাত্রেই সে বিদায় নিয়ে এসেছিলো, এবং বার-বার ব'লে এসেছিলো সবিতা দেবী স্টেশনে যেন না যান।

—'তুমি স্টেশনে এলে যে ?

'কী ক'রে তুমি ভাবতে পারলে যে আমি আসবো না ?'

'আমি না তোমাকে বারণ ক'রে এলুম ?'

'তুমি বারণ করলেই আমি শুনবো নাকি !'

'মিছিমিছি এই রোদ্দুরে—!'

সবিতা দেবী বললেন, 'এতটা পথ যাবে, থর্ড ক্লাশে কষ্ট হবে না ? সেকণ্ড ক্লাশ ক'রে নাও।'

'কোম্পানি থর্ড ক্লাশের ভাড়াই দিচ্ছে।'

'তাতে কী ? তোমার মালপত্র নামাও, ঐ সেকণ্ড ক্লাশটা খালি আছে।'

ঠেলাগাড়ি নিয়ে একটা ফেরিওলা তাদের সামনে দাঁড়ালো। মস্ত এক বাক্স চকোলেট কিনে অরণি দিলে চিত্রার হাতে। চিত্রা বললে, 'অরণি-দা, কবে আবার আসবে ?'

'আসবো একদিন।'

'শিগগিরই এসো।'

'তোমার জন্য কী নিয়ে আসবো, বলো তো ?'

'কিছু আনতে হবে না, তুমি এসো,' চিত্রার চোখ ছলছল ক'রে উঠলো।

সবিতা দেবী বললেন, 'সেকণ্ড ক্লাশে যাবে না তুমি ?'

'না।'

'তোমার সেই দু'শো টকো—' সবিতা দেবী হাত-ব্যাগের মুখ খুলতে উদ্যত হলেন।

অরণি দু'পা স'রে গিলে বললে, 'তোমার কাছেই থাক, ফিরে এসে নেবো।'

সবিতা দেবী হঠাৎ একটু হালকা সুরে বললেন, 'বেশ, ওটা আমার কাছেই রইলো। আপাতত এইটে রেখে দাও দেখি তোমার কাছে। কখন কী দরকার হয় বলা যায় না তো—' বলতে-বলতে ব্যাগ থেকে একটা মোটা খাম বের করলেন।

'আমার জন্যে ভেবো না।'

'এটা নাও, বলছি।'

'না।'

'না ?'

হাওড়া স্টেশনের গতিশীল মুখর ব্যস্ততার মধ্যে তিনটি প্রাণী নিঃশব্দে একটু দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর অরণি বললে, 'যদি কখনো দরকার হয় তোমাকেই তো লিখবো। যদি হঠাৎ ফিরে আসতে ইচ্ছে করে তোমার কাছেই তো ফিরবো। আমার পাওনা জমা হোক তোমার কাছে, ঠিক সময়ে আদায় ক'রে নেবো।' নিচু হ'য়ে চিত্রাকে অনেকক্ষণ আদর করলো। ঘণ্টা বাজলো।

কলকাতায় সারাদিনের পর রাত্তিরে সে বাঁচতো, বম্বের বিরাট কারখানা তাকে দিন-রাত্তির ভুলিয়ে দিলে। আশি থেকে একশো, একশো থেকে দেড়শো, দেড়শো থেকে আড়াইশো, আড়াইশো থেকে চার শো, হু-হু ক'রে বাড়তে লাগলো তার আয়ের অঙ্ক। কোম্পানির প্রতিনিধি হ'য়ে সমস্ত ভারতবর্ষ চ'ষে বেড়ালো, বার চারেক কলকাতাতেও এলো। এসে সবিতা দেবীর বাড়িতেই উঠলো, কিন্তু সে-ওঠা নামমাত্র। সারাদিন কাজ, দু'দিন পরেই মান্দ্রাজ কি হয়দ্রাবাদ কি রাওলপিণ্ডি যাত্রা। ভালো ক'রে তাকে যেন চোখেই দেখা গেলো না। একবার এক নেটিভ রাজ্যের রাজার সঙ্গে সে কোম্পানির এমন একটা লাভকর যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলে যে এক লাফে তার মাইনে ডবল হ'য়ে গেলো, কারখানা থেকে আপিশে বদলি হ'লো সে। এখন সে কাগজপত্রে সই করে, তার বাপের বয়সি ভদ্রলোকেরা তার সামনে ফাইল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তার সঙ্গে দেখা করবার আশায় কাটা দরজার বাইরে অপেক্ষা

করে কত গণ্যমান্য। এখন ইচ্ছে করলে সে একটু আরাম করতে পারে, হাত-পা ছড়াতে পারে, ছুটি নিয়ে উটকামণ্ড যেতে পারে। কিন্তু কাজই তার জীবন, কাজ ছাড়া সে বাঁচে না, আর সে আপিশে আসবার ছ'মাসের মধ্যে এমন হ'লো যে তাকে না-হ'লে আপিশ যেন চলেই না। কর্তারা ভাবলেন এ-রকম লোকের মনে যাতে কখনো অসন্তোষের বিষ না ঢোকে, তার ব্যবস্থা করা চাই। অরণি ধাপে-ধাপে উঠতে লাগলো, কোম্পানির একজন বড়োদরের অফিসর হয়েছে সে, মাসান্তে তার পাওনা ষোলো শো টাকা। ততদিনে দশ বছর কেটে গেছে।

বড়ো কর্তার সঙ্গে দেখা ক'রে সে বললে, 'আমি আপনার কাছে একটা ফেভর চাই।'

'নিশ্চয়ই। সামনের মাসে আবার আমাদের জেনরেল ইনক্রীমেণ্ট হবে, তখন—'

'সে-কথা নয়। আমাকে কলকাতায় বদলি করুন।'

'কলকাতায়! সেখানে কী আছে! সেখানে গেলে তোমার সব প্রসপেক্ট নষ্ট।'

'আমার অনেক হয়েছে। এতটা আশা করিনি। এখন আমি কলকাতায় যেতে চাই।'

'ইয়ং ম্যান, আমিই তোমাকে কলকাতার কারখানায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আমার ইচ্ছে তোমাকে পিটসবর্গে পাঠাবো। দেখে আসবে কাকে বলে লার্জ-স্কেল প্রোডকশন, তারপর ভারতবর্ষের স্টীল দিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে আমরা যখন গাড়ি বানাতে আরম্ভ করবো—সরকার, তুমি মিলিঅনেআর হ'য়ে যাবে। রুপীর অঙ্কে নয়, ডলারের অঙ্কে! এখানে থাকো, কলকাতায় গেলে আর-কিছু হবে না।'

'আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কিন্তু কলকাতায় বদলি না-করলে আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।'

অরণি বদলি হ'য়ে কলকাতায় এলো। শেষ যেবার এসেছিলো, সে কতদিন আগে? ছ'বছর? ভালো যেন মনে পড়ে না। হাওড়া স্টেশনে যখন নামলো ঠিক তেমনি একটি মুক্তির হাওয়া এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো, যে-হাওয়া তার প্রাণে বইতো যখন, দশ বছর আগে, কারখানা থেকে বেরিয়ে সে রয় স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করতো।

সবিতা দেবী এখনো রয় স্ট্রিটে। তাঁর আসবাবপত্র তেমনি আছে, তিনি নিজে প্রায় সেইরকমই আছেন। আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে শুধু চিত্রার। যাকে ছোট্ট ফ্রকপরা-মেয়ে দেখে গিয়েছিলো, সে আজ পরিপূর্ণ যুবতী। কত রঙের শাড়ি পরে, কত নতুন ভঙ্গিতে চুল বাঁধে। বম্বেতে তার জীবন স্ত্রীলোকবর্জিত ছিলো, চিত্রাকে দেখে

অবাক হ'লো অরণি। এ যে সেই মেয়ে, যাকে সে কোলে ক'রে বেড়াতো যার চকোলেট-মাখা আঙুল তার শুভ্র জামাকে প্রায়ই কলঙ্কিত ক'রে দিতো, তা যেন বিশ্বাস করাই যায় না। একটু কেমন লজ্জা করলো তার। চিত্রা যে তার কাছে এসে দাঁড়ালো সেই ভঙ্গিটাও যেন বাধো-বাধো।

কিন্তু এই লজ্জা কাটিয়ে উঠতে অরণির দেরি হ'লো না। দেখতে-দেখতে নতুন চিত্রার সঙ্গে ভাব জ'মে উঠলো তার। উপহারে-উপহারে আচ্ছন্ন ক'রে দিলো চিত্রাকে, তার ভাবখানা এমন যে সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারলেও যথেষ্ট হয় না।

একদিন প্রকাণ্ড একটা গাড়ি হাঁকিয়ে এলো সে। সবিতা দেবী বললেন, 'কিনলে বুঝি ?'

'হ্যাঁ, কিনলুম। ট্যাক্সিগুলো অতি বাজে। আর শিখ ড্রাইভরদের গায়ে যা গন্ধ!'

'এত বড়ো গাড়ি কেনবার কী দরকার ছিলো ?'

'আমি ভালো জিনিশই ভালোবাসি। চলো।'

'পাগলের মতো খরচ করছো কেন বলো তো ?

'করবো না ?'

'পার্ক স্ট্রিটে ফ্ল্যাটটাই বা নিতে গেলে কেন ? আমার এখানেই তো থাকতে পারতে।'

'আমি খুচরো কাজ ভালোবাসি না।'

'আমিও না! তাহ'লে এ বাড়িটা তুমিই নিয়ে নাও।'

'তোমরা ?'

'আমরাও থাকবো।'

'বেশ। যথাসময়ে হবে। এখন চলো। চিত্রা কোথায় ?'

'আসছে।'

পরির মতো সেজে চিত্রা বেরিয়ে এলো বারান্দায়। অরণি বললে, 'চিত্রা, আমি ভেবে দেখলাম যে কোনো ভদ্রমহিলার ট্যাক্সিতে চড়া উচিত নয়। এই ছাখো— দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, আর—' অরণি বোঁ ক'রে একবার ঘরের ভিতরে ঢুকে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে এলো—'আর এই হচ্ছেন শ্রীযুক্ত ড্রাইভর। বিশ্বাস করতে পারো, এই লোকটি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মোটরচালক। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে আশি মাইল স্পীডেও এর হাতে নির্ভয়ে আত্মসমর্পণ করতে পারো।'

চিত্রা খিলখিল ক'রে একটু হেসে উঠলো।

মা মেয়ে গাড়ির ভিতরে উঠে বসলো। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে অরণি বললে, 'একজন এখানে এসে বসলে হ'তো না ?'

চিত্রা ব'লে উঠলো, 'আমি যাই, মা ?'

অরণি চুপ ক'রে রইলো। সবিতা দেবী বললেন, 'যাও না, সামনে গিয়েই বোসো।'

অরণি পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিলে। চিত্রা এসে তার পাশে বসলো।

টাকাগুলো যেন নোংরা কোনো জিনিশ, হাত থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেই সে বাঁচে, অরণির মনের ভাবখানা এইরকম। অল্প-ভালোয় তার চলে না, সবচেয়ে ভালোও তার পক্ষে যথেষ্ট ভালো নয়। যেটা শস্তা, যেটা চলনসই, আর যেটা কাজে লাগে, এই তিনরকম জিনিশের 'পরেই তার অসীম বিতৃষ্ণা। একদিন হয়তো গাড়ি বোঝাই ক'রে পঁচিশ টাকার ফুলই নিয়ে এলো। চিত্রার ঘরের পরদার রং একটু বুঝি ফ্যাকাশে হয়েছে, তক্ষুনি এলো দশ টাকা গজের বিলিতি নেট। একদিন চিত্রার হাত থেকে প'ড়ে একটা চায়ের পেয়ালা ভেঙে গেলো, পরের দিনই একটি শেলি সেট সবিতা দেবীর চায়ের টেবিলে ঝকঝক করতে লাগলো। সেটের রঙের সঙ্গে টেবলক্লথের রঙের কোথায় একটু সূক্ষ্ম বৈষম্যের ফলে অরণি মর্মপীড়া অনুভব করলো, ঐ পেয়ালার সঙ্গে শোভনতম যে-কাপড়টি সে কল্পনার চোখে দেখতে পেলো, যতদিন না তার কাছাকাছি একটা-কিছু কিনতে পেলো, ততদিন শেলি পেয়ালায় চা-ই খেলো না সে।

একদিন সবিতা দেবী বললেন, 'তুমি কি খেপে গেলে, অরণি ?'

'খেপে যাবার কী দেখলে ?'

'তোমার মা-বাবার খবর কী ?' আপাত-অবান্তরভাবে জিগেস করলেন সবিতা দেবী।

'ভালোই আছেন তাঁরা।'

ওঁদের সঙ্গে তো তোমার কতকাল দেখা হয় না।'

'না তো। বম্বে থেকে এসেই একবার ঢাকা ঘুরে এসেছি।'

সবিতা দেবী চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েই অরণি তাঁর মনের কথা বুঝতে পারলে। 'তুমি ভেবো না,' সিগারেট ধরিয়ে সে বললে, 'পুত্রের কর্তব্য পালন করছি আমি। মাসে আড়াইশো ক'রে টাকা পাঠাই মা-কে। এর বেশি তাঁদের দরকারও নেই, এর বেশির যোগ্যও নন তাঁরা।'

'সুখের যোগ্য সকলেই অরণি।'

'ভুল! খুব বেশি সচ্ছলতা সকলকে মানায় না। কেউ টাকার গোলাম হ'য়ে পড়ে, কেউ বা টাকা জাহির করবার চেষ্টায় কেবলই খাবি খায়। টাকা ভোগ করাটা যে একটা আর্ট সে-কথা ক'টা লোক জানে!'

'সে-আর্টের তুমিই বুঝি চরম নিদর্শন?'

অরণি হা-হা ক'রে হেসে উঠলো।—'এবার দেখলাম বাবা শাস্ত্র-টান্ত্র নিয়ে খুব মেতেছেন। আমার আড়াইশো টাকা নিশ্চয়ই কতগুলো মূর্খ বামুনের হাতে গিয়ে পড়ছে—ভাবতে আমার গা জ্ব'লে যায়।'

'তোমাকে বিয়ে করতে বলেন না তাঁরা?'

'আমাকে মুখ ফুটে কেউ বলবে, এত সাহস!'

'ওরে বাবা!' সবিতা দেবী হেসে ফেললেন।

পকেট থেকে মুঠো ভ'রে কতগুলো নোট বের ক'রে চোখের সামনে তুলে ধ'রে অরণি বললে, 'কী মোহিনী জানো, বন্ধু, কী মোহিনী জানো! তুমি যার আছো, সকল ভয়ের সে উর্ধ্বে!' অরণি নোটগুলো নির্দয়ভাবে হাতের মধ্যে মোচড়াতে লাগলো।

'আঃ, কী করো।'

নোটগুলি পকেটে ফিরিয়ে রেখে অরণি বললে, 'এবারে চা হোক।'

প্রসঙ্গের জের টেনে সবিতা দেবী বললেন, 'সত্যি এখন তোমার বিয়ে করা উচিত।'

'তাহ'লে তোমাকেও একটা উচিত কথা বলি। চিত্রার এখন বিয়ে হ'লে ভালো হয়। তুমি কি সে-বিষয়ে কিছু ভেবেছো?'

'এবারে প্রাজ্ঞজনের মতো কথা বলছো বটে! সবিতা দেবী অস্ফুটে হাসলেন।

'তুমি হয়তো ভাবছো ওর এখনো বিয়ের বয়েস হয়নি?'

'না, তা ভাবছি না। ওর সতেরো হ'লো—বিয়ের পক্ষে এ বয়েসটা ভালোই। আর—আর—ওর বিয়ে হ'য়ে গেলেই আমার শেষ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাই।'

অরণি বললে, 'কিছু ভেবো না, সবিতা, ঠিক সময়ে ওর বিয়ে হবে।'

সবিতা দেবী অরণির পিঠে চড় মেরে বললেন, 'দিন-দিন তোমার সাহস বেড়ে যাচ্ছে! আমাকে নাম ধ'রে ডাকছো!'

'কেন? আগে কি কখনো ডাকিনি?'

'কই, না।'

'তাহ'লে আজ থেকে ডাকবো।'

সবিতা দেবী বললেন, 'চলো, চা দিয়েছে।'

শিফনের শাড়ি প'রে চায়ের টেবিল আলো করেছে চিত্রা। অরণি বেশ

চেঁচিয়ে বললে, 'তোমার মেয়ে বড্ড রূপসী হয়েছে, সবিতা। চোখ ধাঁধিঁয়ে যাচ্ছে।'

চিত্রা যথোচিত লজ্জিত ভঙ্গিতে মুখ নিচু করলো। সবিতা দেবী খুব মন দিয়ে কেক কাটতে লাগলেন।

চায়ের পরে সবিতা দেবী বললেন, 'আজ তোমরা কোনদিকে বেড়াতে যাচ্ছো?'

'তোমরা মানে? আমরা বলো।'

'না। আমি আজ আর যাবো না।'

'এটা আবার কখন ঠিক করলে?'

'আমার ভালো লাগে না রোজ-রোজ। তোমরা ঘুরে এসো।'

অরণি উঠে এসে সবিতা দেবীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বললে, 'তাহ'লে আজ বাড়ি ব'সেই সন্ধ্যাযাপন করি।'

'তোমরা যাও, ঘুরে এসো।' সবিতা দেবীর কথাটা আদেশের মতো শোনালো।

মা-র কাঁধের উপর দিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে অরণি বললে, 'চিত্রা, আজ আমরা বাগানে বসবো। তুমি গান করবে। আকাশে একটা বাঁকা চাঁদ চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকবে। এমন সন্ধ্যা মোটরে চ'ড়ে হু-হু ক'রে নষ্ট করা বর্বরতা। রাজি?'

চিত্রা একটি চামচে তুলে নিয়ে চায়ের বাটিতে ঠুনঠুন আওয়াজ করতে লাগলো।

সবিতা দেবী বললেন, 'চিত্রা, তোর সেই জর্জেটটায় যে পাড় বসাতে দিয়েছিলি, আজ না আনবার কথা?'

সবিতা দেবীর চেয়ারের মাথায় দু'হাতে ভর দিয়ে অরণি বললে, 'চলো তাহ'লে জর্জেট-উদ্ধারে বেরিয়ে পড়ি। তারপর চাঁদটাকে ধরা যাবে লেকপাড়ে। আশা করি সে ততক্ষণে পালিয়ে যাবে না।'

'আমাকেও যেতে হবে?'

'তাহ'লে বেতের চেয়ারগুলো বাগানে দিতে বলি?'

'তুমি স'রে এসো না, অরণি। বার-বার ঘাড় ফিরিয়ে-ফিরিয়ে কথা বলা যায় না।'

চেয়ারেব দুই হাতল ধ'রে সবিতা দেবীকে সুদ্ধ ইঞ্চিকয়েক শূন্যে তুলে অরণি বললে, 'ওঠো।' তারপর ধুপ ক'রে চেয়ারটি নামিয়ে দিয়ে বাইরে চ'লে গেলো। একটু পরে মা-মেয়ে যখন বেরিয়ে এলো, অরণি গম্ভীরভাবে বললে, 'চিত্রা, আজ তুমি ভিতরে বোসো।'

চিত্রা শাড়ি সামলে গাড়িতে উঠে একটি লাবণ্যস্তূপের মতো কোণ ঘেঁষে বসলো।—'এসো, মা।'

অরণি তার বাঁ দিকের দরজাটা খুলে দিয়ে বললে, 'তোমার মা এখানে বসবেন।'

'সামনে তো তিন জনেই বসা যায়', কথটা বলতে গিয়েও থেমে গেলো চিত্রা। গাড়ির বিরাট গহ্বরে একা ব'সে-ব'সে তার মনটা হঠাৎ খারাপ হ'য়ে গেলো।

শাড়ির দোকান থেকে বেরিয়ে সবিতা দেবী বললেন, 'আমি এবার পিছনেই বসি—সামনে বসলে আমার সর্দি হয়। তুই সামনে যা, চিত্রা।'

অরণি হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'ওঃহো! শৈলেশ আমাকে আজ চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলো যে!'

'কে শৈলেশ?'

'আমাদের আপিশের একটি ছেলে—কয়েকদিন হয় আমেরিকা থেকে ফিরেছে। বেচারা এখনো হয়তো চা না-খেয়ে ব'সে আছে।'

'কী অন্যায়! এখনই যাও তুমি ওর কাছে।'

অরণি গাড়িতে উঠে বললে, 'তোমরা গাড়িতে একটু ব'সে থেকো—আমি এই মিনিট পাঁচেক ওর সঙ্গে একটু কথা ব'লেই চ'লে আসবো।'

'না, না, তা কেন? আমাদের নামিয়ে দিয়ে তুমি বরং চ'লে যাও।'

অরণি কথাটার কোনো জবাব দিলে না। ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে গাড়ি কেবলই দক্ষিণে এগোতে লাগলো। একেবারে লেকের কাছাকাছি এসে একটি দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লো অরণি।—'একটু বোসো তোমরা, আমি এক্ষুনি আসছি,' ব'লে বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

ফিরে এলো পাঁচ মিনিট না হোক মিনিট দশেক পরেই। শাদা প্যান্ট আর গলা-খোলা শার্ট পরা একটি যুবক তার সঙ্গে এলো। অরণি তার কাঁধে চাপড় দিয়ে বললে, 'কিছু মনে কোরো না, কেমন? কাল মনে থাকে যেন।' তারপর গাড়ি চালাতে-চালাতে বললে, 'কাল ফারপোতে ওকে ডিনারে ব'লে দিলুম। তোমরাও আসবে।'

মা মেয়ে দু' জনেই এবার পিছনে বসেছিলো। সবিতা দেবী বললেন, 'আমরা আর কেন?'

'কী বললে?'

'বলছিলুম যে আমাদের যাবার কী দরকার?'

'অ্যাঁ?'

'তোমার ডিনার থেকে আমাদের বাদ দিলে ভালো হয় না ?'

'কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না', ব'লে অরণি গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলে। একটু পরে বললে, 'ঐ যা! ওর সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়েই দেয়া হ'লো না! আচ্ছা, কাল হবে।'

পরের দিন শৈলেশের সঙ্গে আলাপ হ'লো। ছেলেটি ভারি শান্ত, খুব আস্তে কথা বলে, গলার আওয়াজ সিল্কের মতো। দেখে সেই ধরনের ছেলে মনে হয় যে বিয়ে করলে সিনেমা-ফেরৎ স্ত্রীর পরিত্যক্ত মূল্যবান শাড়িটি সযত্নে ভাঁজ ক'রে বিছানার তলায় রেখে দেবে, এবং পরের দিন সকালেই আলমারিতে তুলে রাখবে।

প্রথম পরিচয়ের পরে শৈলেশ একদিন অরণির সঙ্গে সবিতা দেবীর বাড়িতে এলো, তারপর নিজেই একদিন এলো, তারপর ঘন-ঘন আসতে লাগলো।

সবিতা দেবী বললেন, 'তোমার বন্ধু দেখছি এ-বাড়িতে কায়েমি হ'লো, অরণি।'

'তোমার আপত্তি আছে ?'

'আমি একটু নিরিবিলিই ভালোবাসি।'

'তাহ'লে আমাকে সহ্য করো কেমন ক'রে ?'

'তুমি একাই একশো, তাই তোমার উপর আর-কেউ হ'লে একটু বেশি হ'য়ে পড়ে।'

'আহা—ছেলেমানুষ! তোমাদের একটু করুণা না-পেলে ও বাঁচে কেমন ক'রে ?'

সবিতা দেবী হেসে বললেন, 'নিজেকে বুড়ো ভাবতে খুব ভালো লাগে, না ?'

'ওর তুলনায় বুড়ো বইকি। ওর তো মাত্র পঁচিশ।'

'এত কম!'

'দেখে বোঝা যায় না। ওর ধারণা, গম্ভীর হ'য়ে থাকলে চাকরিতে দ্রুত উন্নতি হয়।'

সবিতা দেবী বললেন, 'চিত্রা ওকে নিয়ে ভারি ঠাট্টা-তামাশা করে।'

'কেন ? ঠাট্টা করবার কী হয়েছে ?'

'বলে, ওর দিকে যখন তাকায় মনে হয় এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে।'

'কী অন্যায়!' অরণি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'সবিতা, চিত্রাকে তুমি শাসন করো না ?'

'ও আমার হাতের বাইরে চ'লে গেছে। ত্যাখো তুমি যদি কিছু করতে পারো।'

'নিশ্চয়ই পারি! কালই আমি তোমার হ'য়ে শৈলেশকে নেমন্তন্ন করবো রাত্তিরে।'

'বাঃ! জুলুম?'

'তোমাদের খাবার সময় হ'লেই বেচারাকে উঠে চ'লে যেতে হয়—ওর খারাপ লাগে না? মাঝে-মাঝে ওকেও না-হয় খেতে বললে।'

সবিতা দেবী ঈষৎ ক্লান্তস্বরে বললেন, 'তোমাকে নিয়ে আর পারি না।'

শৈলেশ আসতে লাগলো। সান্ধ্যভ্রমণেও সে নিত্য সঙ্গী। সে চিত্রার সঙ্গে গাড়ির ভিতরে বসে, সবিতা দেবী অরণির পাশে বসেন। বেশি কথা শৈলেশ বলে না, কিন্তু মাঝে-মাঝে চিত্রার চাপা হাসির শব্দ শোনা যায়। শৈলেশ যে গান গাইতে পারে এ-খবরটা হঠাৎ একদিন জানাজানি হ'য়ে গেলো লেকের ধারে রাত বারোটায়। সে-রাতে জ্যোছনা ছিলো। শৈলেশ দুটো গান গাইলো, তারপর চিত্রা একটা গাইলো। তারপর থেকে গান শেখায় চিত্রার খুব বেশি উৎসাহ দেখা যেতে লাগলো।

কয়েক মাস পরে অরণি জিগেস করলে, 'চিত্রার এখন কেমন লাগছে শৈলেশকে?'

সবিতা দেবী বললেন, 'কই, এখন তো আর কিছু বলে না।'

'তাহ'লে সব জোগাড়যন্তর ক'রে ফেলি?'

'তুমি বলছো কী?'

'ভেবো না—তোমার মেয়ে সুখী হবে।'

সবিতা দেবী মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে রইলেন। একটু পরে বললেন, 'আজ তোমাদের ললিতবাবুর একটা চিঠি এসেছে।'

'ললিতবাবু?'

'ললিতবাবুকে মনে নেই তোমার?'

'ও—ও, সেই ললিতচন্দ্র! ঢাকার ললিতচন্দ্র! তিনি এখনো বেঁচে-ব'র্তে আছেন?'

'ঢাকা ইউনিভর্সিটি থেকে রিটায়ার করেছেন—কলকাতায় চ'লে আসছেন। সামনের সোমবারেই এসে পৌঁছবেন। শুনে খুব খুশি হ'লে তো?'

অরণি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'কলকাতা যথেষ্ট বড়ো জায়গা।'

'তিনি সোমবারেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।'

'ও, আসবেন বুঝি? আবার চিঠি লিখে সে-কথা জানিয়েও দিয়েছেন?'

'মাঝে-মাঝে তিনি চিঠি লিখতেন আমাকে। তুমি যখন বম্বে ছিলে, বার দুই কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেছেন।'

'ওঃ, তুমি এত ভালোমানুষ! সোমবার আমার বরানগরের বাগানবাড়িতে তোমাদের নিমন্ত্রণ রইলো।'

'সেটা আবার কবে হ'লো?'

'এইমাত্র। বাগানবাড়ি না থাক, গঙ্গার ধার তো আছে।'

সবিতা দেবী হেসে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি আমার শোবার ঘরে ব'সে থেকো, তাহ'লেই তো হবে? ললিতবাবুকে তাড়াতাড়ি বিদেয় ক'রে দেবো।'

'তবু ওর সঙ্গে তোমার দেখা করা চাই?'

'এখনো কি ওঁর উপর তোমার রাগ পড়েনি?'

'আমার রাগের কথা তুলছো কেন? তোমাকে একটা লোক এসে বিরক্ত করবে, সেটা কি কিছু নয়?'

'বিরক্ত কিসের—পুরোনো বন্ধু, দেখা করতে চান—ভালোই তো।'

'বন্ধু! ও তোমার বন্ধু!' অরণি হাসতে-হাসতে পেটে হাত চেপে সোফায় শুয়ে পড়লো।

সোমবার এসে দেখলো ললিতচন্দ্র ড্রয়িংরুমে ব'সে আছেন। সেই লাল মোজা, সেই পাকানো চাদর, হাতে সেই ছাতা। চুলটা কিছু পেকেছে, কিন্তু তারই মধ্যে তৈলচিক্কণ শিং দুটি অক্ষুণ্ণ। অরণি গটগট ক'রে ঢুকতেই সবিতা দেবী বললেন, 'একে চিনতে পারছেন? আপনার সেই নটোরিয়স ছাত্র, অরণি।'

ললিতচন্দ্র বললেন, 'চিনতে পেরেছি বইকি। তুমি নাকি আজকাল মস্ত লোক হয়েছো - শুনে খুব আনন্দ হ'লো। আসবার আগে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, তিনি বলছিলেন—'

অরণি ললিতচন্দ্রের কাছে এগিয়ে গিয়ে লম্বা সিগারেট-কেসটি খুলে ধ'রে বললে, 'Have one'.

ললিতচন্দ্র সিগারেট নিয়ে দেশলাইয়ের জন্য পকেট হাৎড়াতে লাগলেন। অরণি ফশ ক'রে দেশলাই ধরিয়ে তাঁর মুখের কাছে নিলে, তারপর নিজের সিগারেটটি ধরিয়ে বললে, 'Excuse me, আপনার ছাতাটি—'

ছাতাটি তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে গেলো। বারান্দার হ্যাট-র‍্যাকে সেটি দাঁড় করিয়ে বাগানে পাইচারি করতে-করতে সিগারেট খেতে লাগলো। মিনিট কুড়ি পরে দেখা গেলো, ললিতচন্দ্র বেরিয়ে এসে যথাস্থান থেকে ছাতাটি উদ্ধার ক'রে আস্তে-আস্তে চ'লে গেলেন।

অরণি ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে বললে, 'অসম্ভব! ভদ্রতা, সহনশীলতা, আত্মত্যাগ

—এই মহৎ গুণগুলির একটা সীমা থাকা দরকার, সবিতা। তুমি যে এমন বড়ো-মানুষের মতো সময় নষ্ট করছো, একবারের বেশি কি বাঁচবে তুমি?'

সবিতা দেবী বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেরুবে নাকি?'

'শৈলেশ আসুক।'

'সে এখন আসবে না। চিত্রাকে আর তার কলেজের দুটি বন্ধুকে নিয়ে সে সিনেমায় গেছে।

'সিনেমা যখন কথা বলতো না, তখনই ভালো ছিলো। নিজেরা বলা যেতো।'

'বোবা ছবি মনে আছে তোমার?'

'মনে আছে মানে! আমি কি শৈলেশের মতো ছেলেমানুষ নাকি যে কথা-কওয়া ছবি ছাড়া কিছু দেখিইনি জীবনে! ঢাকার পিকচার হাউসে কত সিকিই ঢেলেছি!—তাহ'লে চলো আমরাই ঘুরে আসি একটু।'

গঙ্গার ধারে খুব নির্জন একটা রাস্তা দিয়ে আস্তে গাড়ি চালাতে-চালাতে অরণি বললে, 'সবিতা, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে সবিতা দেবী বললেন, 'বলো।'

'না। এখন না। কিন্তু শিগগিরই বলবো। আর দেরি করা চলে না।'

'বেশ। যেদিন তোমার খুশি।'

'কথাটা কী তা কি তুমি বুঝতে পারোনি?'

'আমি বড়ো কম বুঝি।'

অরণি চকিতে একবার সবিতা দেবীর আধখানা মুখের দিকে তাকালো, তারপর গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আঃ! ভালো একখানা গাড়ি চালাবার মতো সুখ আর-কিছু নেই। কত বড়ো একটা শক্তি আমার হাতের মুঠোয়! আমার এক-এক সময় এরোপ্লেনের কাজ শিখতে আমেরিকা চ'লে যেতে ইচ্ছে করে। এতদিনে চ'লে যেতুমও, যদি না—'

'যদি না?'

'যদি না তুমি থাকতে।'

সবিতা দেবী কিছু বললেন না। অরণি আবার বললে, 'আমার জীবনকে তুমিই মূল্যবান করেছো। যদি একা থাকতুম, তাহ'লে একদিন এমনি গাড়ি চালাতে-চালাতে হয়তো গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগতো, তারপর—হাসপাতাল থেকে আর বাড়ি ফিরতুম না — তাতেই বা কী হ'তো?' বলতে-বলতে গাড়ির স্পীড আরো বাড়িয়ে দিলে, দু'ধারের গাছগুলি যেন পাগল হ'য়ে উল্টোদিকে ছুটলো।

সবিতা দেবী অরণির হাতে হাত রেখে বললেন, 'আস্তে !'

'আস্তে কী ! ঝড় উঠেছে শুনতে পাচ্ছো না !'

তখন বৈশাখের শেষ। সূর্যাস্ত হ'য়ে গেছে, কিন্তু বায়ুমণ্ডল তখনো সবুজ-সোনালি। হঠাৎ সেই স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডলকে মথিত ক'রে হাওয়া উঠলো, আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেলো, শোঁ-শোঁ শব্দে ঝড় আসছে এগিয়ে। অরণি বললে 'ভারি ভালো লাগছে।'

'তুমি স্পীড কমাও—নয়তো পুলিশে ধরবে।'

চৌরঙ্গির কাছাকাছি এসে অরণি আবার গাড়ি ঘুরিয়ে নিলে। ময়দানের পশ্চিমে গঙ্গার ধারে-ধারে নির্জন রাস্তাগুলি ধ'রে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে লাগলো। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি।

সে-রাত্রে খুব বৃষ্টি হ'লো, এবং পরের দিনও বৃষ্টির ভাব কাটলো না। তার পরের দিন কলকাতার শহরে এমন হাওয়া দিলে যে দক্ষিণদিকে মুখ ক'রে হাঁটলে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আপিশের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অরণি দেখলো পাৎলা মেঘ আকাশে হু-হু ক'রে উড়ে চলেছে। হাওয়ায় উড়ছে টেবিলের কাগজপত্র। অরণি বেয়ারাকে বললে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিতে। একটার সময় যখন লাঞ্চ খেতে উঠলো, জানিয়ে গেলো সে আজ আর ফিরবে না। তার গাড়ি গ্রেট ঈস্টার্নকে উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেলো।

গিয়ে দেখলো সবিতা দেবী ড্রয়িংরুমে ললিতচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলছেন। কোনোদিকে না-তাকিয়ে সে বাড়ির ভিতরে চ'লে গেলো। কয়েক মিনিট পরেই সবিতা দেবী এলেন।

'ও গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'এ-সময়ে এসেছিলো কেন ?'

'তুমি আপিশে যাওনি ?'

'আপিশ থেকেই আসছি। তোমাকে সেই কথাটা বলতে এলাম।'

সবিতা দেবী চোখ তুলে তাকালেন। অরণি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আর দেরি ক'রে লাভ কী। আমাদের বিয়েটা হ'য়ে যাক।'

সবিতা দেবীর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হ'লো।

'তোমার কাছে বলতে সাহস পায় না—শৈলেশ কাল আমাকেই তার মনের কথা বললে। চিত্রার মত সে পেয়েছে, এখন তুমি রাজি হ'লেই—'

'তুমি বলছো কী, অরণি !'

'এক্ষুনি সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলি, কেমন ? ওদের বিয়ে হ'য়ে গেলেই তো আমরা মুক্ত ! তারপর—তুমি কলকাতায় থাকতে না চাও—আমরা বম্বে চ'লে যাবো। সেখান থেকে ইওরোপ –আমেরিকা—প্যাসিফিকের যে-কোনো দ্বীপ সব রাস্তা আমাদের খোলা। আমার অনেক ছুটি জমেছে, টাকার জন্য আটকাবে না। মনে হয় সেটাই ভালো হবে—কাছাকাছি থাকলে চিত্রা হয়তো প্রথমটায়— ' অরণি কথাটা শেষ করলো না।

সবিতা দেবী স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে তার সব কথা শুনলেন, তারপর মৃদু গলায় বললেন, 'এইটেই আমার ভয় হচ্ছিলো।'

'কোনটা ?'

'ভয় হচ্ছিলো যে একদিন তুমি এ-কথা বলবে।'

'ভয় কেন ?'

সবিতা দেবী হঠাৎ অরণির দু' হাত চেপে ধ'রে ব'লে উঠলেন, ' অরণি, আমাকে তুমি ছেড়ে যেয়ো না।'

তাঁর হাত দুটি নিজের মুখের উপর রেখে অরণি বললে, 'এ-কথা কেন বলছো ?'

'তুমি যা চাচ্ছো তা তো হ'তে পারে না।'

'কেন ?'

'তোমার বয়স তিরিশ, আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ।'

'তাতে কী ?'

'তোমাকে দেবার আমার কিছুই নেই, অরণি। তোমাকে ঠকাতে আমি পারি না। কেন তুমি কথাটা মুখ ফুটে বললে ? কেন নিজের শেষ আব্রুটুকু রাখলে না ? যা ছিলো সেটাকে নষ্ট করলে কেন ?'

'যা হবে সেটা আরো ভালো হবে ব'লে।'

সবিতা দেবী ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাথা নাড়লেন।—'না—না ! তুমি ভুল করলে, অরণি, যা ছিলো তা-ই নিয়েই জীবন কেটে যেতো আমার।'

'আর আমার ?'

'তুমি চিত্রাকে বিয়ে করো না', অত্যন্ত সহজ সুরে বললেন সবিতা দেবী।

'চিত্রাকে !' অরণি প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠলো। 'চিত্রাকে ! এ-কথা কী ক'রে তুমি ভাবতে পারলে, সবিতা !'

'কেন, চিত্রার সঙ্গেই তো তোমাকে মানায়।'

অরণি গম্ভীরভাবে বললে, 'চিত্রার সঙ্গে শৈলেশের বিয়ে হ'য়ে গেলেই ওদের

নৈনিতালে পাঠিয়ে দেবো। সেখানে বাড়ি ঠিক ক'রে রেখেছি—শৈলেশের এক মাসের ছুটিও মঞ্জুর।'

'তুমি তাহ'লে অন্য-কোনো মেয়েকে বিয়ে করো।'

অরণি এমনভাবে সবিতা দেবীর দিকে তাকালো যে তাঁর বুকের ভিতরটা ব্যথায় টনটন ক'রে উঠলো। অনুতপ্ত স্বরে বললেন, 'অরণি, আমার দিকটা ভেবে ত্যাখো। আমাকে তুমি অপরাধী কোরো না। আমার জন্যই তোমার জীবন যদি নষ্ট হয়—'

'নষ্ট! তুমি কি জানো না যে তুমিই আমার জীবন?'

'অরণি, আমাকে ভুল বুঝো না। তোমাকে যত ভালোবাসি, আমার স্বামীকে ছাড়া কোনো মানুষকে তত ভালোবাসিনি। কিন্তু তুমি যা বলছো—সে অসম্ভব।'

'তাহ'লে আমাকে না-হ'লেও তোমায় চলে?'

'তুমি না-থাকলে আমার জীবন অন্ধকার হ'য়ে যাবে।'

'তবে?'

'আর তো বুঝিয়ে বলতে পারি না। যে-বয়সে মনে হয় ভালোবাসা মানেই বিয়ে, সে-বয়স আমি অনেকদিন পেরিয়ে এসেছি, অরণি। আমি যে বুড়ি হয়েছি সে-কথা তুমি ভুলো না।'

'বুড়ি! তুমি!' অরণি মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে সবিতা দেবীর হাঁটুর উপর মাথা রাখলো।

তার চুল নিয়ে খেলা করতে-করতে সবিতা দেবী বললেন, 'একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। ললিতবাবু আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন।'

'অ্যাঁ!' অরণি হাসতে-হাসতে মেঝেয় গড়াতে লাগলো।

'কথাটা কি এতই হাসির?'

'নয় বুঝি?' অরণির মুখ মুহূর্তে শক্ত হ'য়ে উঠলো।

'না। ভালোবাসা ঠাট্টার জিনিশ নয়।'

'ভালোবাসা!'

'তুমি জানো না, অরণি—যখন ঢাকাতে ছিলুম তখন থেকে আরম্ভ ক'রে, এই বারো বছর ধ'রে তিনি অসীম ধৈর্য নিয়ে মনে-মনে আমাকে—'

অরণি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'তাই বুঝি? তাঁর উপর খুব দয়া দেখছি তোমার!'

'ভালোবাসা গ্রহণ করতে না পারি, তাকে অপমান করতে পারি না।'

'গ্রহণ করতেও তোমার বিশেষ আপত্তি নেই, মনে হচ্ছে?

সবিতা দেবী একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমার দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার

কথাই ওঠে না। তোমাকে আর কতবার বলবো যে বিয়ে থেকে আমার আর কিছুই পাবার নেই।'

'ঐ ললিতচন্দ্রই আমার জীবনের অভিশাপ, দেখছি। ওটাকে একদিন হাতে-পায়ে বেঁধে ডাস্টবিনে ফেলে দেবো।'

'তার দরকার হবে না। তিনি কালই দেশে চ'লে যাচ্ছেন।'

'প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক! গিয়ে একটি অমর কাব্য রচনা করবেন, আশা করি।'

'ভদ্রলোক কবিতা লেখেন ভালোই।'

অরণি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'হায় অরণি, তুমি কবি নও, কুলির সর্দার!'

সবিতা দেবী বললেন, 'লজ্জা করে না তোমার ললিতবাবুর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে!'

'কেন?

'মূর্খ! তাও বুঝিয়ে বলতে হবে! আমার কাছে তুমি আর ললিতবাবু কি এক?'

'আপাতত দু'জনেই এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। দু'জনেই পাণিপ্রার্থী—দুজনেই প্রত্যাখ্যাত।'

'তুমি ছাড়া আমার আছে কে?'

'তাহ'লে ?' অরণির চোখ-মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

'না—না। জানি, এই "না" বলবার জন্য হয়তো চিরজন্মের মতো তোমাকে হারাতে হবে। তবু আমি ছলনা করতে পারবো না। তবু আমাকে বলতে হবে—না, না, না।'

দু' হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে অরণি স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। তারপর মুখ তুলে আস্তে-আস্তে বললে, 'তাহ'লে কেন আমি এত সব করলুম, কার জন্য করলুম? কী হবে আমার এখন? এখন আমি বাঁচবো কেমন ক'রে?'

সবিতা দেবী রুদ্ধস্বরে বললেন,' অরণি, আমি তো আছি।' ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই যে আমি—দেখতে পাচ্ছো না?'

অরণি শূন্যচোখে মেঝের দিকে তাকিয়ে মৃত স্বরে বললে, 'আমার জীবন! আমার সমস্ত জীবন!' তারপর আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

সবিতা দেবী দু' হাত বাড়িয়ে ডাকলেন—'অরণি!

'অরণি? অরণি আর নেই।'

সবিতা দেবী ছুটে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তাহ'লে সত্যি কি তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছো?'

'আমাকে যেতে দাও, সবিতা।'

'আর-কোনোদিন কি তোমার দেখা পাবো না?'

অরণি একটু দাঁড়িয়ে সবিতা দেবীর দিকে তাকালো। একটি আশ্চর্য আলো আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে পড়লো তার মুখে। সবিতা দেবীর মাথার উপর হাত রেখে বললে, 'সবিতা, তুমি কাঁদছো কেন? আমি ভুল বলেছিলাম, অরণি আছে। সে পেয়েছে, তোমাকে পেয়ে গেছে। এর পর যদি জন্ম-জন্মান্তর দেখা না হয়, তবু আমি তোমাকে হারাতে পারি না। আমার মধ্যেই তুমি আছো। আমি যে বেঁচে আছি, সেই তো তুমি—সেই তো তুমি।'

সবিতা দেবী আর্তস্বরে ব'লে উঠলেন, 'তোমার মতো শক্তি আমার নেই - আমি দুর্বল—অরণি, আমাকে বাঁচাও।'

তাকিয়ে দেখলেন, অরণি চ'লে গেছে। চোখের জলে পৃথিবী অন্ধকার হ'য়ে গেলো।

১৯৪৪ অপ্রকাশিত

অসমাপ্ত গল্প

সকালবেলা বাইরের ঘরে ব'সে আমার 'সাহিত্য ও নৃতত্ত্ব' বইয়ের প্রুফ দেখছি, এমন সময় কে একজন দ্রুত নিঃশব্দে পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কাছে এসেই নিচু হ'য়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে সেই হাত নিজের মাথায়, কপালে, জিভে ঠেকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। এতক্ষণে তাকে আমি ভালো ক'রে দেখলুম।

সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে, গায়ের রং কালো, মাথার চুল গোল ক'রে ছাঁটা, ঠোঁটের উপর পাৎলা গোঁফের রেখা। খাটো ধুতি কোমরে গিঁট বেঁধে পরেছে, মস্ত খালি পায়ে রাজ্যের ধুলো, গায়ে একটি শাদা মোটা চাদর এমন ক'রে জড়ানো যে ভিতরে জামা-টামা কিছু আছে কি নেই, বোঝা যায় না।

আমি চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বললুম, 'কী চাই?'

'আমি—আমি—আমি কলেজে পড়তে এসেছি,' চাদরের ভিতরে কোনো এক দুর্জ্ঞেয় গহ্বরে হাত দিয়ে সে একতাড়া ময়লা কাগজ বের ক'রে টেবিলের উপর রাখলো।

তাকিয়ে দেখবার দরকার ছিলো না, ব্যাপারটা আমার মুখস্থ। প্রতি বছরই জুলাই-অগস্ট মাসে এ-রকম দু'টি চারটি পল্লীবালকের অভ্যুদয় হয়—তাদের সহায় নেই, কোনোরকম সামর্থ্যই নেই, অথচ বিদ্যালাভে উৎসাহ অপরিমিত। প্রতি বছরই যথাসম্ভব সংক্ষেপে এবং সস্নেহে তাদের বিদায় ক'রে থাকি। একেও যে তা-ই করলুম না তার কারণ কেউ জিগেস করলে কিছুই বলতে পারবো না।

হেডমাষ্টার মশায়ের চিঠি, লোকাল-বোর্ডের প্রেসিডেন্টের আবেদন, স্থানীয় জমিদারের পত্র—এইগুলির উপর একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললুম, 'কলেজে ভর্তি হয়েছো?'

'আজ্ঞে।'

'কোন কলেজে?'

যে-কলেজের নাম করলে, আজ পনেরো বছর হ'তে চললো সেখানে আমি ইংরেজি পড়াই।

'এ-কলেজে কেন?'

'আপনি আছেন ব'লে।'

'তোমার বাবা কী করেন?'

'সামান্য চাষবাস করেন—কিছু নেই আমাদের, একেবারে নিঃস্ব আমরা।'

'তাহ'লে কী ক'রে চালাবে ?'

ছেলেটি চোখ নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো।

'কোথায় থাকবে এখানে ?'

'জানি না।'

'এখন কোথায় আছো ?'

'বড়োবাজারে আমাদের দেশের একটি লোকের দোকান আজে—কিন্তু সে ব'লে দিয়েছে আর বেশি দিন আমাকে রাখবে না।'

'কী ক'রে কলেজে ভর্তি হ'লে ?'

'আমাদের জমিদারবাবুর দয়ায়।'

'তিনি আর দয়া করবেন না ?'

'তাঁর অবস্থাও বেশি ভালো না ।'

'তোমার বাবা ?'

'বাবা কিছুই পারবেন না।'

'একেবারে কিছুই না ?'

'না।'

বলতে যাচ্ছিলাম, 'তাহ'লে তো তুমি ভুল করেছো', কিন্তু হঠাৎ সে টেবিলটাকে দু'হাতে চেপে ধ'রে আমার দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বললে, 'আমাদের হেডমাষ্টার মশাই বলেছেন আপনার কাছে গেলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে—আপনাকে তিনি খুব ভক্তি করেন—আমি তাই এসেছি।'

তাকিয়ে দেখলাম, তার চোখে আশা জ্বলজ্বল করছে। কপালে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমেছে, নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত। এখান থেকে বেরোতে পারলে সে বাঁচে, অথচ বেরোতে পারে এমন উপায় তার কই। দুটি উজ্জ্বল চোখ, একটি কম্পমান হৃদয় আর অন্যায় অবাধ্য ইচ্ছা—এইটুকু মাত্র সম্বল ক'রে এই চাষার ছেলে তার গ্রামের কুঁড়ে ঘর ছেড়ে এসেছে এই বিপুল, বিক্ষুব্ধ উদ্‌ভ্রান্ত ও উদ্‌ভ্রান্তকারী মহানগরীতে। সে কিছু জানে না, কিছু বোঝে না, যেটুকু বলে তার চেয়ে অনেক বেশি কথা তার দু'চোখে ভ'রে ওঠে। আর-একবার তাকিয়ে তার মুখখানা আমার ভালোই লাগলো।

'কী নাম তোমার ?'

'গণেশ মণ্ডল। ঐ কাগজে লেখা আছে সব।'

'হুঁ। কোন ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছো ?'

'থর্ড ডিভিশনে। মা-র অসুখ ছিলো, ভালো ক'রে পড়তে পারিনি।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'শোনো—প্রিন্সিপালকে ব'লে আমি হাফ-ফ্রী ক'রে দেবো, থর্ড ডিভিশনে পুরো ফ্রী হবে না। তাতে কি সুবিধে হবে ?'

'আমি কিছু জানি না—আপনি যা বলবেন তা-ই হবে।'

'তোমার কলেজের ব্যবস্থা একরকম হ'য়ে যাবে হয়তো কিন্তু তাহ'লেই তো সব হবে না ?'

'আমি আপনার ঐ নিচের ঘরটায় প'ড়ে থাকবো—আর দু' বেলা দু'টি খাবো। আর কিছু লাগবে না আমার—হেঁটেই যাওয়া-আসা করবো—শুধু বই-টইগুলো আপনি দেবেন। আমি আপনার ভরসা ক'রেই দেশ থেকে এসেছি। হেডমাষ্টার মশাই বলেছেন—'

ঠিক এই মুহূর্তে আমার স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখামাত্র গণেশ কথা বন্ধ ক'রে ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে গড় হ'য়ে প্রণাম করলে। মনে হ'লো, মস্ত মোটা শাদা একটা বেড়াল পায়ের কাছে লোটাচ্ছে।

সরমার চোখের প্রশ্নের উত্তরে আমি বললুম, 'আমার একটি ছাত্র…নতুন কলকাতায় এসেছে—'

'ও!' উল্লিখিত ব্যক্তির দিকে আর দৃক্‌পাতমাত্র না-ক'রে সরমা আমার কাছে এসে বললে, 'তুমি যে-কোটেশনটা খুঁজছিলে পেয়েছি। কোথায় বসাবে ?' হাতের মোটা বইখানা টেবিলের উপর রেখে সরমা একটি চেয়ারে বসলো।

প্রুফগুলোর পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে গণেশের দিকে এক পলক তাকিয়ে বললুম, 'তা—তুমি তাহ'লে আর-একদিন এসো।'

'আচ্ছা', ব'লে সে দাঁত বের ক'রে হাসলো। কী মনে ক'রে হাসলো জানি না, কিন্তু লক্ষ্য করলুম, দাঁতগুলো তার ভারি সুন্দর। আমাদের দু'জনকেই আরো একবার ঐ-রকম সুবিস্তৃত প্রণাম ক'রে সে বিদায় নিলে।

সরমার দিকে প্রুফের একটা পাতা এগিয়ে দিয়ে আমি আবার মুদ্রাযন্ত্রের রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলুম। সরমা তার সুন্দর সুগোল হস্তাক্ষরে প্রুফশীটের তলায় কোটেশনটা লিখতে-লিখতে বললে, 'ছেলেটা কী চায় ?'

'ভারি গরিব—কলকাতায় থাকবার জায়গা নেই—'

'গরিব ছাত্রদের জন্য কোথায় একটা হস্টেল খুলেছে শুনছিলাম।'

'ঠিক তো জানি না—তবে ও বোধহয় এই ধারণা নিয়েই গেলো যে আমার এখানেই থাকবে।'

সরমা তার চশমা-পরা চোখ তুলে বললে, 'তুমি ওকে কিছু বলোনি তো ?

'না, না, আমি বলবো কেন—ও-ই বলছিলো। ওর গ্রামের হেডমাষ্টার ওর মাথায় ঢুকিয়েছে যে কলকাতার শহরে আমার কাছে এলেই ওর সকল সমস্থার সমাধান হবে।'

সরমা চাপা গলায় অল্প হেসে উঠলো।

আমি চেয়ারে একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে অত্যন্ত বেশি উৎসাহের ভাবে বলতে লাগলাম, 'ছেলেটি কিন্তু বেশ, না ? একেবারে তরুণ বলতে যা বোঝায়। যাত্রার দলে ওকে পেলে কৃষ্ণ সাজাবার জন্য লুফে নিতো—কী বলো ?'

প্রুফ থেকে চোখ না-তুলে সরমা বললে, 'ও-রকম কত আছে।'

'তা আমি ভাবছিলুম কী—নিচের ঐ ছোটো ঘরটা তো খালিই প'ড়ে থাকে—ও না-হয় থাকলোই ওখানে—আর দু' বেলা দু'টি খাওয়া আর এমন-কী কথা—'

সরমা তিন আঙুলের মধ্যে কলমটি ধ'রে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'কী যে পাগলের মতো বলো !'

'কেন, পাগলের মতো কেন ? একটি ছেলেকে খেতে দিতে হ'লে আমরা তো আর ফতুর হ'য়ে যাবো না, সত্যি ! আর ছেলেটি কত আশা নিয়ে এসেছে ! কলেজে পড়বে—এ তার কত বড়ো স্বপ্ন ! আমরা না-রাখলে বেচারার পড়াই হয়তো হবে না—আবার সেই দেশেই ফিরতে হবে।'

'তা-ই ফিরলো না-হয়। পাশ ক'রে কী-ই বা হবে তবু চাষ-বাস করলে খেতে পাবে।'

'সে-কথা ঠিক। কিন্তু ওর ইচ্ছেটা যদি দেখতে তোমারও আমার মতোই মনে হ'তো। ও থাকলে আমাদের তো কোনো অসুবিধে হবে না, অথচ ওর—'

সরমা তার প্রবল পূর্ববঙ্গীয় ভাষা প্রয়োগ ক'রে বললে, 'যত আকাম !' সাধুভাষায় যার মানে হচ্ছে, 'ওরে মূর্খ ! চুপ।'

তখনকার মতো কথাটা সেইখানেই চাপা পড়লো, কিন্তু দিন দুই পরেই গণেশ আবার এলো—এবার একেবারে তল্পিতল্পা নিয়ে। তল্পির মধ্যে এক হাতে একটা শাদা কাপড়ের বোঁচকা, ধোপার বস্তার মতো দেখতে, তবে আকারে অনেক ছোটো, আর তল্পার মধ্যে আর-এক হাতে একটি কাগজের ঠোঙা। হাত দুটোকে মুক্ত করতে যা একটু দেরি, তার পরেই ভূলুণ্ঠিত প্রণাম, থাক থাক বলবার সময়টুকু পর্যন্ত দিলে না। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি এলাম।'

ভাবতেই পারিনি যে শুদ্ধু ওর হেডমাষ্টারের কথার উপর নির্ভর ক'রে ও হুট ক'রে

একেবারে বাড়িতে এসে উঠবে। বিষয়টা মহারানির দরবারে পেশ ক'রে মঞ্জুর করিয়ে নেবার সময় তো অন্তত দিতে হয়! ওকে দেখে আমার মুখের চেহারাটা নিশ্চয়ই প্রাজ্ঞজনোচিত হয়নি, তাই মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললুম, 'তা--তা --তুমি বোসো—আমি একটু ভিতর থেকে আসছি!'

গণেশ তার কাগজের ঠোঙাটি হাতে তুলে নিয়ে বললে, 'এটি মা-র জন্য এনেছি।' তার ভঙ্গিটা এইরকম যেন যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আমাকে সেটি দিতে চায়, অথচ মুখে সে-কথা বলতে পারে না।

'কী আছে এতে ?'

'দুটি আম। পাশেই ফলের দোকান --চেয়ে আনলুম। মা-র জন্য', ব'লে সে একগাল হাসলো।

মনে-মনে ভাবলুম যে বর্তমানে এই বালকের যিনি মাতৃস্থানীয়া, আম তাঁর বিশেষ প্রিয় বটে, কিন্তু আম্রবহকে দেখে ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর পুত্রমুখদর্শনের আনন্দ হবে কি ? 'এ তুমি ওঁর হাতেই দিয়ো,' কথাটা আমার নিজের কানেই ফ্যাকাশে শোনালো।

গণেশ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো, তারপর ব'সে পড়লো মেঝের উপরেই।

'আহা-হা, ওখানে কেন, চেয়ারে বোসো না।'

মলিন কাপড়ের খুঁটে মুখের ঘাম মুছে গণেশ বললে, 'বেশ আছি।' তার চোখে-মুখে খুশি ঝ'রে পড়ছে দেখলুম।

ঈষৎ দুরু-দুরু বুকে উপরে উঠে এসে সরমাকে বললুম, 'সেই ছেলেটি এসেছে।'

সরমা তার সুদৃশ্য টেবিলে সুদৃশ্য হ'য়ে ব'সে চিঠি লিখছিলো, মুখ না-তুলে বললে, 'বসতে বলো।'

'সে ব'সেই আছে।'

'মেয়েদের জন্য একটা হাতের কাজের স্কুল খোলা হচ্ছে বালিগঞ্জে। আমাকে উদ্বোধনের দিনে প্রবন্ধ পড়তে বলেছে। আমি ও-সব পারবো না বলেছি, কিন্তু ওরা না-ছোড়। কী করি বলো তো ?'

'আমি তো তোমাকে সে-কথাই জিগেস করতে এলুম। ও যে একেবারে জিনিশপত্র নিয়ে এসেছে।'

'কে ? সেই—' সরমার মুখের ভাব বদলে গেলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না।'

'আহা—এসে পড়েছে যখন, এই অবেলায় তো আর তাড়িয়ে দেয়া যায় না। থাক দু' একদিন···তারপর ভেবে-চিন্তে একটা ব্যবস্থা করা যাবেই।'

'কী ব্যবস্থা করবে, শুনি ?'

'তুমিই বা এত ভাবছো কেন ? দয়া করা তো খুব শক্ত নয়—আর দয়া করতে ভালোও লাগে। একবার এসো নিচে—আমার আবার কলেজের বেলা হ'লো।'

দেয়ালে ঠেশ দিয়ে পা ছড়িয়ে ব'সে গণেশ গুনগুন ক'রে কী একটা গান গাচ্ছিলো, আমাদের দেখেই ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ালো। সরমার উদ্দেশে মেঝেতে একবার মাথা ছুঁইয়ে আম ছুটি পায়ের কাছে রেখে বললে, 'পূর্বজন্মে কত পুণ্য করেছিলাম—তাই আজ আপনার আশ্রয় পেলাম।'

সরমা ঐ আম ছুটির দিকে, কি ছেলেটার দিকে, ভালো ক'রে তাকিয়েও দেখলে না। আমি তাড়াতাড়ি আম ছুটি তুলে নাকের কাছে একবার ধ'রে বললাম, 'বাঃ, কী সুন্দর আম! এ-রকম আরো এনে দিতে পারবে তো ?'

গণেশের কান থেকে কানে হাসি ছড়িয়ে পড়লো।—'খুব পারবো। মস্ত দোকান—ফলের ছড়াছড়ি! মাঝে-মাঝে গিয়ে যদি ওর কয়েকটা ইংরিজি ঠিকানা লিখে দিই তাহ'লে যত ইচ্ছে আনতে পারবো—যত ইচ্ছে মানে কিছু তো দেবে।'

সরমা শাড়ির আঁচলে হাসি চেপে শুকনো গলায় বললে, 'তোমার জিনিশপত্র কোথায় ?'

'এই যে।' গণেশ ধাঁ ক'রে তার বোঁচকাটা খুলে ফেললো। ভিতরে দেখা গেলো একখানা ধুতি, একটি জামা, একটি সুজনি, খান দুই মলাট-ছেঁড়া পাঠ্য বই, সর্বশেষে কয়েকটি নিমের দাঁতন। যে-চাদরে বেঁধে এনেছে আর পরনে যা আছে সে-সব যোগ করলে তার সম্পত্তি এমন-কী মন্দ।

কিন্তু সরমা বললে, 'বিছানা তো নেই।'

'তা একটা ছেঁড়া মাদুর-টাদুর হ'লেই চ'লে যাবে আমার। এই চাদরটা দিনের বেলায় গায়ে দিই, আর রাত্তিরে ওটা ভাঁজ ক'রে নিলেই বালিশ হ'য়ে যায়। আর-কিছু লাগবে না আমার। সব আছে।'

তার কথা শুনে সরমার মুখে কেমন-একটা ভীত আর্ত ভাব ফুটে উঠলো। আমার দিকে সে এমন দৃষ্টিতে তাকালো যাকে ঠিক সুদৃষ্টি বলা চলে না। পুরুষমাত্রেই জানেন যে এ-রকম দুর্যোগে পলায়নই শ্রেষ্ঠ পন্থা, আমিও তাই অত্যন্ত দ্রুত বেগে স্নানের ঘরে আত্মগোপন করলুম। তারপর কোনোরকমে আহারপর্ব সমাধা ক'রে একেবারে কলেজের দিকে দৌড়।

২

গণেশের জন্য অন্য কী-ব্যবস্থা হ'তে পারে ভেবে পেলুম না। ব্যবস্থা করবার জন্য আমি যে উঠে-প'ড়ে লাগলুম তাও অবশ্য বলা যায় না। এদিক-ওদিক দায়-সারা গোছের একটু খোঁজ-খবর নিয়ে আমি ব্যাপারটাকে মন থেকে সরিয়ে দিলুম; আমার অনেক কাজ, এ-সব ভাবনা বেশিক্ষণ পোষায় না।

দশ-বারো দিন পরে একদিন রাত্রে স্ত্রীকে জিগেস করলুম, 'তোমার নবলব্ধ পুত্রটি কেমন আছে?'

সরমা বললে, 'তুমি তাহ'লে ঠিক করেছো ওকে এখানেই রাখবে?'

'তা তো নয়—বরং ও-ই ঠিক করেছে যে এখানে থাকবে। এখন একে যদি বে-ঠিক করতে হয়, সে তোমার হাত।'

'তোমারা পুরুষমানুষরা ভারি মজার—নিজেরা পরম ভালোমানুষ সেজে থাকবে, আর যত মন্দ কাজ তুলে দেবে স্ত্রীদের ঘাড়ে। এইজন্যই তো পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের এত বদনাম। আমি এখন কী ক'রে ওকে মুখ ফুটে চ'লে যেতে বলি।'

'বেশ তো—বলতে না চাও বলবে না।'

'ব্যস তোমার আর তাহ'লে ভাবনা কী।'

'তোমারই বা ভাবনাটা কী, শুনি?'

'ঐ নিচের ঘরটায় অভি পড়াশুনো করে—ওর মাষ্টার আসেন—'

'ও, এই ভাবনা। অভির কি খুব অসুবিধে হচ্ছে?'

'আহা—অভির আবার সুবিধে-অসুবিধের জ্ঞান হয়েছে নাকি? ও বরং গণশা-দার একটু ভক্তই হয়েছে, দেখছি। ভোরবেলা উঠে নিচে চ'লে যায়, তারপর গণেশের সঙ্গে হুশহাশ ক'রে এক্সারসাইজ করে।'

'সত্যি? ভালো তো।'

'ভালো কিনা কে জানে। ও মণ্ডল তো—তার মানে ওর জাত—'

'ছি, সরমা। তোমার মুখে এ-কথা! তুমি না একবার মহাত্মা গান্ধির শিষ্য হ'য়ে জেলে গিয়েছিলে!'

'তা যাই বলো, জাতে যারা ছোটো এখন পর্যন্ত সব বিষয়েই তারা ছোটো।'

'ঢাখো না। দু' চার বছর কলকাতায় থাকলেই এর জাত বদলে যাবে। চিনতে পারবে না তখন।'

'সেটাও আবার কী-রকম হবে কে জানে। জানো, ও যে কথা বলে, ঠিক আমাদের চাকরদের মতো।'

'তা তো হবেই। মেদিনীপুরের লোক তো।'

সরমা একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'কী দরকার কলেজে পড়তে আসবার! বি.এ-পাশ ক'রে তো সেই একটা কেরানি-টেরানিই কিছু হবে। তাতে ওর দারিদ্র্য ঘুচবে, না আরো বাড়বে? শুধু ঐ ভদ্রলোক উপাধিটার জন্যই এত!'

'কিছু কি বলা যায়। তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে বিদ্যাসাগরও মেদিনীপুর থেকেই এসেছিলেন।'

'বিদ্যাসাগর!' সরমা হেসে উঠলো।

সেই থেকে সরমার মুখে গণেশের নাম হ'লো 'তোমার বিদ্যাসাগর।' তোমার বিদ্যাসাগরের এই হয়েছে, তোমার বিদ্যাসাগর এই করেছে। সরমা তাকে বিছানা বালিশ মশারি সবই দিয়েছে, কিন্তু অভি-র খবর এই যে সে-বিছানায় সে শোয় না, মেঝের উপর মাদুরেই প'ড়ে থাকে। এ নিয়ে সরমা তাকে মৃদু র্ভৎসনা করেছে, উত্তরে সে বলেছে যে ওখানে শুলে তার ঘুম হবে না। সরমা বলেছে, 'হবে না কেন? নিশ্চয়ই হবে, অভ্যাস করো।'

আমি বললুম, 'তুমিই বা জোর করছো কেন? দেশে তো ও মাদুরেই শোয়।'

সরমা বললে, 'ছেলেটা যদি থাকেই, তাকে চাকরের মতো রাখতে পারবো না আমি।'

সরমার কথায় আরো প্রকাশ পেলো যে সে তাকে কলেজে যাবার ট্র্যামের পয়সা দিচ্ছে। আমি বললুম, 'কোনো দরকার ছিলো না—দেশে ওরা দশ-বারো মাইল অনায়াসে হাঁটে। ভালো অভ্যেসটা রাখতে দোষ কী।'

'পাগল নাকি!' বললে সরমা, 'ও-সব কি কলকাতায় চলে! অমন ক'রে সময় নষ্ট করাটা রীতিমতো ক্রিমিনাল।'

'ও কিন্তু রাজি ছিলো।'

'ওর আবার রাজি আর গর-রাজি। আমি ওকে পয়সা দিলে কী হবে—ও প্রায়ই সে-পয়সা বাঁচিয়ে একটু আঙুর কি একটা আপেল কি যা-হয় কিছু কিনে আনে। ওর ধারণা ও-সব দেখে আমি কতই খুশি হবো। বোকা।'

'তুমি কি ওর মধ্যে শুধু আঙুর-আপেলটাই দেখলে? ওর ত্যাগ, ওর আত্মোৎসর্গ, ওর আনন্দটাকে দেখলে না?'

'থাক, থাক, আমার উপর আর মাষ্টারি করতে হবে না তোমাকে। ছেলেটা

একেবারে বোকা। সকালে-বিকেলে খাবে না কিছুতেই বলে, আমাদের একবেলা খেলেই চলে—আর দু'বেলা হলো তো স্বর্গ।'

'আর তুমি বুঝি জোর ক'রে চার বেলা খাওয়াচ্ছো?'

'চেষ্টা করছি তো। ও এক-এক বারেই যা ভাত খায়—মাগো! বললে ভালো শোনায় না, কিন্তু চাকরদের ছাড়া আর-কাউকে অত ভাত খেতে আমি দেখিনি।'

'ভাত ছাড়া অন্য-কিছু ওরা বড়ো খায় না তাই ভাতটা পরিমাণে একটু বেশিই খায় - অবশ্যি জোটে যখন।'

'সেইজন্যেই তো বারে-বারে খেতে হয়, এবং নানারকম খেতে হয়। আর-কিছু না, একসঙ্গে অতগুলো খাওয়া দেখতে বড়ো বিশ্রী। দেখো তুমি, দু'দিনেই ওর অভ্যেস আমি ফিরিয়ে দেবো।'

আমি বললুম, 'তুমি করছো কী, সরমা। ও যে ভীষণ কষ্ট ক'রে কলকাতায় পড়তে এসেছে—তুমি কি সেই কষ্ট থেকেই ওকে বঞ্চিত করবে?'

'ওঃ! বিদ্যেসাগর বুঝি? তা তুমি যা-ই বলো, বিদ্যেসাগরের দিন আর নেই। শরীরটাকে আরামে রাখলেই মনের মুক্তি—নয়তো মনটা শরীর নিয়েই বিব্রত হ'য়ে থাকে।'

'কিন্তু তুমি আরাম বলতে যা বোঝো, ও তো তা বোঝে না।'

'তা জানিনে—আরাম সকলেরই ভালো লাগে। আর উপায় যখন আছে, কষ্ট ক'রে লাভ কী।'

আমি বললুম, 'ঐ কষ্ট করাটাই লাভ। ও যে অত্যন্ত কষ্ট করছে ঐ ধারণাটাই ওর পরম সম্পদ। পরে যখন ওর নিজের পায়ে দাঁড়াবার দিন আসবে তখন এই কষ্টের কথা মনে ক'রে জীবনে ও কতখানি জোর পাবে ভাবো তো।'

সরমা বললে, 'আমি ও সব মানিনে।'

সরমার তত্ত্বাবধানে আমাদের বিদ্যাসাগর বাড়তে লাগলো। সকলেই জানেন যে পুরুষমানুষ সংসারে সাইনবোর্ড মাত্র—তার নামেই সব হ'য়ে থাকে, কিন্তু করেন যিনি, এবং করান যিনি, যাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছায় দৈনিক বাজার থেকে কন্যার বিবাহ পর্যন্ত সমস্ত সম্পন্ন হ'য়ে থাকে, তিনি হচ্ছেন স্ত্রী। কোনো-কোনো পুরুষ দেখেছি, যারা নিজের বাড়িতে বেশ কড়ারকমের কর্তা, কিন্তু আমি মনে করি এ-বিষয়ে স্ত্রীর ডিক্টেটরশিপ স্বীকার ক'রে নেয়াই ভালো, তাতে অনেক সময় বাঁচে, হাঙ্গামা বাঁচে, খাটুনি বাঁচে, যথোচিত পরিমাণে টাকা এনে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। আমি নানা কাজের মানুষ, আমার উপনিষৎ-সমিতি আছে, ইংলিশ রিভিয়ু আছে, নব প্রাচ্য সম্মিলনী আছে,

সপ্তাহে তিনটে বক্তৃতা আছে, মাসে পাঁচটা প্রবন্ধ আছে- সংসারক্ষেত্রে তেমন বড়োরকমের একটা সংকট না-এলে কোনো কথা যে আমার কানেই ওঠে না, এ-ব্যবস্থাই আমার পক্ষে ভালো। এদিকে সরমা যদিও বিদুষী এবং জেল-ফেরতা, সংসার-পরিচালনায় তার গভীর আনন্দ, ওর ভিতর দিয়ে নিজেকে সে ফুটিয়েছে, সেখানে অন্য-কারো হস্তক্ষেপ সে সইতেই পারে না। এম.এ.-পাশ হ'য়েও সে মাষ্টারি করে না, নানা যোগ্যতা নিয়েও বাইরে তার বিশেষ আনাগোনা নেই। বাইরে থেকে তার ডাক আসে অনেক, কিন্তু সে ঘরে থাকতেই ভালোবাসে।

সেই প্রথম দিনের পরে গণেশের সঙ্গে আমার ভালোমতো আর দেখাই হয়নি। ক্লাশে ওকে দেখি, শাদা চাদরটি দিয়ে সর্বাঙ্গ মুড়ে খোলা বইয়ের উপর চোখ নত ক'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকে ; বাড়িতে মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে ওর কী-রকম একটা লজ্জা হয়েছে, আমাকে দেখলেই পালিয়ে যায়। মানুষটা যে বাড়িতে আছে তা-ই আমি টের পাই না।

দেখতে-দেখতে পুজো এসে পড়লো। অন্য সকলের সঙ্গে ওর জন্যেও একখানা নতুন ধুতি এলো বাড়িতে। সেই ধুতিখানা প'রেই ও দেশে গেলো, যাবার সময় দু' চোখ ভ'রে জল। আমি পিঠে হাত রেখে বললুম, 'কী হয়েছে—আসবে তো আবার, মা-বাবা কত ব্যস্ত হ'য়ে আছেন তোমার জন্য। আমাদের দারজিলিঙের ঠিকানা নিয়ে যাও, চিঠি লিখো।'

দারজিলিঙে ব'সে ওর চিঠি পেলাম। পেলাম বলাটা ঠিক হ'লো না, কারণ সেটা সরমাকে লেখা। পরম পূজনীয়া মাতৃদেবীর উদ্দেশে লেফাফাটা ভক্তি-বিহ্বল, ভিতরের চিঠিটা প্রায় বিগলিত। সঙ্গে অভিকেও ছোটো একটা লিখেছে।

সরমা চিঠির শেষের দিকের একটা লাইন আমাকে প'ড়ে শোনালো, 'পূজনীয মাষ্টার মশাইকে আমার প্রণাম।' তারপর বললে, 'তোমার বিদ্যাসাগরের বানান কিন্তু বড়ো ভুল হয়।'

আমি বললুম, 'কী যে বলো। ঐ ভুলগুলোই তো চিঠির লাবণ্য।'

সরমা গম্ভীরভাবে বললে, 'কী যে ছাই তোমরা লেখাপড়া শেখাও আজকাল। ওর বয়সে আমার যদি ওর অর্ধেক বানান-ভুল হ'তো লজ্জায় ম'রে যেতাম।'

'তুমি আমাকে বিয়ের পরে যে-চিঠি লিখেছিলে তাতে কিন্তু বানান ভুল ছিলো। আর সে-ভুল বেশ ভালোই লেগেছিলো আমার। মনে হয়েছিলো, বানানভুল না-থাকলে আর চিঠি কী। এদিকে আমি যখন চিঠি লিখতুম, মনে আছে তোমার নালিশ? চিঠি তো নয়, মাসিকপত্রের প্রবন্ধ। মার্জিত ভাষায়, নির্ভুল বানানে একটি ধোপদুরস্ত

ইস্ত্রি-করা ভদ্রলোক ড্রয়িংরুমে এসে বসলেন। এবং ড্রয়িংরুম থেকেই বিদায় হ'লেন। আর ময়লা কাপড়ে আগোছালো চুলে যে এলো, সে সোজা পৌঁছলো অন্তঃপুরে।'

'দারজিলিঙে এসে তুমি যে কবি হ'য়ে উঠলে,' ব'লে সরমা অভিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেলো।

কয়েকদিন পরে সরমাকে বললুম, 'বিদ্যাসাগরের চিঠিখানার একটা জবাব দিয়ে দিয়ো।'

'জবাব দেবার আর কী আছে।'

'আহা—বেচারা কত আগ্রহ ক'রে লিখেছে—দু' লাইন লিখে দিয়ো। অভিও লেখে যেন।'

'অভি! সে তার গণশা-দাকে রোজই একখানা ক'রে চিঠি চিত্রোচ্ছে। ডাকবাক্সে ধরলে হয়।'

'তবে ওরই একখানা ডাকে দিয়ে দাও। কত খুশি হবে।'

অভির চিঠি ডাকে গেলো, কিন্তু তার আর জবাব এলো না। আমাদের বিদ্যাসাগরের পক্ষে ডাক-মাশুল জোটানো সহজ নয় তো।

আমরা ফেরবার দিন দুই পরে ও এলো। দেশ থেকে আমাদের জন্য এনেছে একটি মাদুর আর একটি বেতের ঝুড়ি ভর্তি ক'রে কাজু বাদাম।

'মাদুরটি আমার মা নিজের হাতে বুনে দিয়েছেন, আর এই বাদাম আমাদের গ্রামে খুব হয়।'

মোটা, শক্ত মাদুর; এমন-কিছু শিল্পকর্ম নয়, যা সগৌরবে ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রাখা যায়। সরমার সংসারে এর শেষ পর্যন্ত কোথায় স্থান হবে তা পরিষ্কার দেখতে পেলুম আর গণেশের মা-র কথা ভেবে মনটা আমার হঠাৎ কেমন ক'রে উঠলো।

সরমা বললে, 'বাঃ, বেতের ঝুড়িটা তো বেশ।'

'আমাদের হাটে এ-রকম অনেক ওঠে, দু'আনা দাম। এর পরে যখন যাবো, অনেকগুলো নিয়ে আসবো।'

'অনেকগুলো দিয়ে আর কী হবে।' সরমার এই কথার সঙ্গে-সঙ্গে গণেশের মুখটা কেমন বোকা-বোকা ফ্যাকাশে-মতো হ'য়ে গেলো।

আবার অভ্যস্ত জীবন শুরু হ'লো। শীতের আভাসের সঙ্গে-সঙ্গেই কলকাতার কর্মজীবন প্রখর হ'য়ে ওঠে; সভা, সমিতি, অধিবেশন, এগজিবিশনের হিড়িক লেগে যায়। আমার একটা সন্ধ্যাও খালি নেই; ঘটনার ঢেউয়ে হাবুডুবু খেতে আমার ভালোই লাগে। আমার সঙ্গে-সঙ্গে সরমাকেও ওরা নিমন্ত্রণ করে, অর্থাৎ ডক্টর-এর সঙ্গে

মিসেসটুকু জুড়ে দেয়, কিন্তু সরমা কোথাও যায় না, ডক্টরের ল্যাজ হ'য়ে সে কোথাও যেতে প্রস্তুত নয় ; অমুকবাবুর স্ত্রী ব'লেই যে-সম্মান লোকে তাকে দিতে চায় সেটা তার অপমান ব'লে ঠেকে। আমার কোথাও-কোথাও ওকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, এও জানি যে গেলে ওর ভালো লাগবে, কিন্তু ও অনড়। একবার আমি যুক্তিপ্রয়োগ করেছিলুম :

'তুমি যে আমার স্ত্রী সে-কথা তো ঠিক।'

'তাতে কী। স্বামী-স্ত্রী হই, যা-ই হই, দুটো আলাদা-আলাদা মানুষ তো। তুমিই যেখানে আসল, সেখানে আমার যাওয়ার কোনো মানে হয় না। তোমার গলায় যদি মালা দেয়, সঙ্গে-সঙ্গে আমার গলায়ও তার চেয়ে একটু ছোটো একটা মালা পরাবে, ভাবতেই লজ্জা করে আমার।'

'তার মানে—আমার পরিচয়ে পরিচিত হ'তে তোমার লজ্জা করে ?'

'তোমার নাম ক'রে বাইরের জগৎ থেকে সুবিধে বা সম্মান নিতে লজ্জা করে বইকি।'

আরো অনেক তর্ক আমার মনে এসেছিলো, চেপে গিয়েছিলুম। এর পরে কোনোখানে ওকে আমার সঙ্গে যেতে বলিনি, সেদিন হঠাৎ মনে হ'লো আর্ট সোসাইটির এগজিবিশনটায় ওকে নিয়ে যাই।

'খুব ভালো একটা এগজিবিশন হচ্ছে ছবির। যাবে নাকি ?'

'কবে ?'

'আমি আজ যাচ্ছি।'

'আমিও আজ ছবি দেখতে যাচ্ছি।'

'কোথায় ?'

'আমাদের সঙ্গে একটি মেয়ে পড়তো—সে ফিল্মে নেমেছে। দেখে আসি একবার।'

'আজই যাচ্ছো ? টিকিট আছে ? আজকাল যা ভিড় শুনতে পাই—'

'মেয়েটি পাশ পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'বেশ, বেশ, দেখে এসো। সঙ্গে কেউ যাচ্ছে তো ?'

'সঙ্গে আবার কে যাবে—তোমার বিদ্যাসাগরকে নিয়ে নেবো। দুটো পাশ পাঠিয়েছে, তা তুমি তো আর—'

'না, না, আমার সময় কই। তাছাড়া তুমি তো জানো এ-সব ফিল্ম-টিল্ম—' কথা

শেষ না-ক'রে আমি তাড়াতাড়ি উঠে গেলুম কাপড় ছাড়তে। অনর্থক আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ কী।

রাত্রে সরমা বললে, 'তোমার বিদ্যাসাগরকে যদি আজ দেখতে! এর আগে তো কখনো সিনেমা ছাখেনি—একেবারে বিহ্বল। আমি ওকে দেখবো না ফিল্ম দেখবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। শেষ যখন হ'লো, ওকে প্রায় হাতে ধ'রে হাঁটিয়ে আনতে হয়েছে।'

'ভালো। নতুন অভিজ্ঞতা হ'লো একটা। আস্তে-আস্তে আরো কত হবে।'

'ওকে কয়েকটা শাদা পাঞ্জাবি করিয়ে দিতে হবে। ঐ একটা ছিটের শার্ট প'রে ব'সে ছিলো—এমন রেচেড দেখাচ্ছিলো! এই আধা-ভদ্রলোক ভাবটা মোটে সইতে পারিনে আমি।'

'কিন্তু পুরো-ভদ্রলোক ভাবটা ওর সইবে তো চট ক'রে?'

'তুমি ভেবো না—ভালো জিনিশ সকলেরই সয়।'

কিছুদিন পরে ক্লাশে একদিন দেখলুম, বিদ্যাসাগর ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবি প'রে ব'সে। দেখেই মনে হ'লো ওর ঐ বিদ্যাসাগরি চাদরই যেন ভালো ছিলো, ওর কুণ্ঠিত আত্মলোপকারী ভঙ্গির সঙ্গে এ যেন ঠিক মানাচ্ছে না। পরমুহূর্তে ভাবলুম, না, এই ভালো, যুগের পাওনা যুগকে দিতেই হয়।

গ্রীষ্মের ছুটির কিছুদিন আগে কড়া রোদ্দুরের দুপুরবেলায় শোবার ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে বি. এ. পরীক্ষার খাতা দেখছি, হঠাৎ চোখে পড়লো আমার টেবিলের উপর একটা সিনেমা-সাপ্তাহিক। ওটাকে দু' আঙুলে তুলে ধ'রে বললুম, 'এই বীভৎস বস্তুটাকে কে এনেছে এখানে?'

সরমা খাটের উপর পাশ ফিরে শুয়ে জন স্টাইনবেকের নভেল পড়ছিলো। (টাটকা-টাটকা নামজাদাদের বই ওর পড়াই চাই), আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'এইটে? অভির কাণ্ড না-হ'য়ে যায় না।'

'অভির কাণ্ড? সে আজকাল এ-সব প'ড়ে অবকাশরঞ্জন করছে নাকি?'

সরমা একটু হেসে বললে, 'জানো না বুঝি? তোমার বিদ্যাসাগর যে আজকাল সিনেমার পোকা! সেদিন ওর ঘরে গিয়েছিলুম—টেবিলের উপর তাল-তাল এই-সব! সঙ্গে-সঙ্গে অভিও একটু পাতা-টাতা ওল্টায়।'

'তুমি কিছু বলো না?'

'বলবো আবার কী। এ-বয়সে ছেলেদের সিনেমার ঝোঁক হয়ই।'

'গণেশ তাহ'লে সিনেমায় যাচ্ছেও মাঝে-মাঝে?'

'মাঝে-মাঝে মানে? সপ্তাহে অন্তত দু'বার না-গেলে ওর অন্ন রোচে না।'

'পয়সা পায় কোথায় ?'

'কোথায় আবার। আমি দিই।'

'ও।' দু' আঙুলের ফাঁক থেকে ঐ ছাপার কালি মাখা ন্যাতাটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ঝুপ ক'রে ফেলে আমি লাল পেন্সিল হাতে নিয়ে ঘাড় নিচু করলুম।

একটু পরে সরমা বললে, 'তুমি কি রাগ করলে ?'

মুখ না-তুলেই বললুম, 'রাগের কথা না। ছেলেটার আমরা উপকার করছি কিনা, তাই ভাবছিলাম।'

'তুমি পিউরিটান ব'লেই তো আর জগতের আমোদ-প্রমোদ বন্ধ থাকবে না।'

'আমি পিউরিটান নই, সুরুচির পক্ষপাতী। তাছাড়া, ও যে অত্যন্ত গরিব, সে-কথা ওকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়া আমার ভালো মনে হয় না।'

'ও যে অত্যন্ত গরিব সে-কথা ভুলতে না-পারলে ওকে আমার অসহ্য লাগে। তুমি তো মহানুভবতা দেখিয়েই নিশ্চিন্ত, বাকিটা তো সব আমাকেই সামলাতে হয়।'

আমি আর-কিছু না-ব'লে খাতাটাকে রক্তচিহ্নে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলুম। মনে পড়লো, ক'দিন ধ'রে বিদ্যাসাগরকে যখনই দেখেছি তখনই কেমন-একটু চমকে উঠেছি। তার কাপড়চোপড়, চলাফেরা সবই যেন অন্যরকম। মুখের চামড়ায় ক্ষুর চলেছে, মাথায় টেড়ি। তার গায়ের রঙের গ্রাম্য কালিমা কেটে গিয়ে চিক্কণ শ্যামল শহুরে হয়েছে। দেখতে ভালোই।

৩

সেকণ্ড ইয়ারে উঠে গুটিপোকা পুরোপুরি প্রজাপতি হ'লো। আটচল্লিশ ইঞ্চি বহরের মিহি ধুতি (ইতিমধ্যে সে বেশ লম্বা হ'য়েও উঠেছে) ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি, সমস্ত দেহে নবযৌবনের আভা। ক্লাশে ব'সে পিছনের উঁচু বেঞ্চির গায়ে হেলান দিয়ে এলানো ভঙ্গিতে কখনো লুকিয়ে নভেল পড়ে, কখনো জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। এ-কলেজটায় বেশির ভাগই গরিব ছেলে ; দীন তাদের বেশ, আড়ষ্ট তাদের চলাফেরা—তার মধ্যে ওর সুসম্পন্ন স্বাচ্ছন্দ্য বেশ একটু চোখে পড়বারই মতো। সেদিন যে-ছেলেটি এসেছিলো, ওর সঙ্গে তার কিছুই মেলে না—এর পরে ওর মা-বাবা ওর সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারবে তো ?

আমি জানি, গ্রাম থেকে অনেক ছেলে এসেই এ-রকম বদলে যায়। কিন্তু এ তো

বদলে যাওয়া নয়, এ বদল হ'য়ে যাওয়া। শুধু যে কলকাতার হাওয়ার গুণে এটা হয়নি তাও আমি জানি। এর পিছনে আছে আমার অর্থ আর সরমার ইচ্ছা।

কলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় ও বড়ো সুবিধে করতে পারেনি—টায়ে-টুয়ে পাশ করেছে। ওর ইংরেজি খাতা দেখে আমার একবার মনে হয়েছিলো যে সরমার কথাই হয়তো ঠিক—আমি যদি ওকে ওর দেশের খেত-খামারে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতুম সেটাই হয়তো ভালো হ'তো।

সন্ধের কিছু আগে সেদিন বাড়ি ফিরছি, বাইরের সিঁড়িতে ওর সঙ্গে দেখা। সুন্দর সেজে-গুজে বেরচ্ছে। আমি ওর পিঠ চাপড়ে বললুম, 'কী হে, বিদ্যাসাগর, এবার একটু পড়াশুনোয় মন দাও, পরীক্ষা তো এলো।'

মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো।

'পাশ তো করতে হবে—কী বলো ?'

রুমালে মুখ মুছে বললে, 'আমি খুবই চেষ্টা করবো ভালো ক'রে পাশ করতে।'

'বেশ বেশ—চেষ্টা করলেই পারবে। তারপর – আর কী-খবর ?'

কোনো-একটা প্রত্যুত্তরের জন্য আমার মনে একটা অস্পষ্ট প্রত্যাশা হয়তো ছিলো, তাই কয়েক সেকণ্ড দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আমি চ'লে গেলাম ভিতরে, ও-ও দ্রুত পায়ে রাস্তায় বেরুলো। হঠাৎ আমার মনে হ'লো যে বিদ্যাসাগর আমার বাড়িতেই থাকে, অথচ ওর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা মোটে হয়ই না। যা ব্যস্ত থাকি !

সেবারে পুজোর ছুটিটা কলকাতাতেই কাটালুম আমরা। গণেশ সপ্তমী পুজোর দিন দেশে গেলো, ফিরে এলো লক্ষ্মীপুজোর পরেই। আমি বললুম, 'কী হে, এত শিগগির ফিরে এলে ?'

কিছু বললে না।

'মা-বাবা ভালো ?'

'হ্যাঁ, ভালো আছেন।'

'কী বললেন তাঁরা ?'

'কী আর বলবেন।'

এক পক্ষে যতটা সম্ভব, ততটা উৎসাহ নিয়ে বললুম, 'এবার কিছু আনোনি দেশ থেকে আমাদের জন্য ?'

'মা কী সব দিয়েছেন,' বলতে গণেশ লাল হ'য়ে উঠলো।

'কই দেখি, দেখি।'

খানিকটা যেন অনিচ্ছায়, হোল্ডল খুলে ন্যাকড়ার পুঁটলি বের করলো। তাতে

চিঁড়ের মোয়া, তিলের নাড়ু, নারকোলের গঙ্গাজলি। 'মা এ সব জোর ক'রেই দিয়ে দিলেন,' তার ভাবটা এইরকম যেন একটা অপরাধ হ'য়ে গেছে।

আমি উৎসাহের মাত্রা আরো এক ডিগ্রি চড়িয়ে বললুম, 'বাঃ, চমৎকার! কতকাল এ-সব খাইনি।' তক্ষুনি আস্ত একটা নাড়ু খেয়ে ফেললাম, যদিও অসময়ে আমি কক্ষনো কিছু খাইনে।

'তোমার দেশে একবার আমাকে নিয়ে যাবে, গণেশ?'

গণেশ মুখ লাল ক'রে নখ খুঁটতে লাগলো।

'তুমি যে এত শিগগির চ'লে এলে, তোমার মা-বাবা কিছু বললেন না?'

'থাকতে বলেছিলেন।'

'তা তো বলবেনই—তোমার জন্য সব সময়েই ওঁদের মন কেমন করে তো। তা তুমি আর ক'টা দিন থেকে এলেই পারতে।'

প্রথম থেকেই আমার মনে হচ্ছিলো গণেশ কী-একটা বলতে চাচ্ছে, বলতে পারছে না। হঠাৎ সে-কথাটা তার মুখ দিয়ে একটু অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বেরিয়ে এলো—'বাবা চান না যে আমি আর পড়াশুনো করি।'

'তাই বুঝি?'

'আমি কিন্তু পড়বোই। আপনি আমাকে ফেলে দেবেন না—আমাকে পড়াবেন।' কথাটার মধ্যে সমস্ত মন ঢেলে দিলে গণেশ।

আমি বললুম, 'সেজন্য এখনই ভাবছো কেন? সামনের পরীক্ষাটা দাও তো—তার পরে দেখা যাবে। তোমাকে ছেড়ে থাকতে তাঁদের ভালো লাগে না, এই আরকি।'

'আমার ভাই-বোন তো আছে।'

'ক'টি না ভাই-বোন তোমরা?'

'আমাকে নিয়ে ছ' জন।'

'তুমিই তো বড়ো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহ'লে, গণেশ, তোমার উপরেই তো ভরসা—বাবা তো বুড়ো হলেন। এবার বেশ ভালো ক'রে পড়াশুনোয় মন দাও আরকি, দুদিন পরেই তো টেস্ট।'

কিন্তু টেস্ট পরীক্ষা সেবার হ'লো না; ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জাপানি যুদ্ধ বাধলো, আর বড়োদিনের ছুটি আসতে-না-আসতে সমস্ত কলকাতা যেন মৃত্যুভয়ে খেপে গেলো।

আমিও খেপে গেলাম। শিমুলতলায় ছ' মাসের জন্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে স্ত্রী,

পুত্র এবং আমার জঙ্গম সম্পত্তির মধ্যে যা কিছু মূল্যবান সব সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা কেমন ক'রে করেছিলাম এখন সে-সব কথা ভাবলে হাসিও পায় দুঃখও হয়। শুনতে পাই, প্রোফেসরদের ভীরু ব'লে দুর্নাম, কিন্তু সে-সময়ে অন্যান্য পেশার লোকেরাও খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন ব'লে তো মনে পড়ে না।

গণেশকে বললাম, 'তুমি কী করবে?'

'আমি থাকি।'

আমি ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বললাম, 'না, না, থাকবে কী। নেহাৎ বাধ্য না-হ'লে এ-সময়ে কেউ থাকে! কলকাতায় তোমার তো কোনো দরকার নেই এখন—বইপত্তর নিয়ে দেশে চ'লে যাও।'

'দেশে গেলে আমার পড়া হবে না।'

'কেন?' একটু অবাক হলাম।

'দেশে আলো নেই। সন্ধের পরেই অন্ধকার।'

হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম।—'ওহে বিদ্যাসাগর, তোমার পূর্ববর্তী প্রাতঃস্মরণীয়ের কথা ভেবে দ্যাখো।' তারপর বললাম, 'সারা দিন যদি পড়ো সারা রাত ঘুমোলেও ক্ষতি হবে না।'

আমার এক ভাগনে সেবার আই এ. দেবে—সে হস্টেলে থাকে—তাকে রাজি করাচ্ছিলাম যাতে সরমার সঙ্গে শিমুলতলায় গিয়ে থাকে। কিন্তু সরমা বললে, 'কী দরকার। শিমুলতলা আমার চেনা জায়গা—একাই থাকতে পারবো। আর তুমি তো মাঝে-মাঝে যাবেই।'

'না, না, তা হয় না। কখন কী দরকার হয় বলা কি যায়?'

'তাহ'লে তোমার বিদ্যাসাগরই চলুক।'

'সে কী কথা। ও দেশে যাবে না? ওর মা-বাবা ওর জন্যে কত ব্যস্ত হ'য়ে আছেন।'

'ও দেশে যেতে চায় না। আমার সঙ্গে যেতে চায়।'

'তোমাকে বলেছে?'

'চলুক না। সারা জীবন তো ঐ একটি গ্রামেই কেটেছে বেচারার—এখন দু'একটা নতুন দেশ দেখবার ইচ্ছে হওয়াটা অন্যায় নয়।'

'দেশভ্রমণের এই তো সময়! না, না, এখন যে যার আপন লোকের কাছে থাকাই ভালো। পরের ছেলের দায়িত্ব নিয়ে শেষটায় কি ফ্যাশাদে পড়বো।'

'ফ্যাশাদ কিসের! ওর বেজায় ভয় হয়েছে, দেশে গেলে ওর পড়াশুনো আর হবে না। ওখানে আমিই পড়াতে পারবো তোমার ছাত্রকে।'

সরমা এমন সুরে কথাটা বললে যেন মীমাংসা এখানেই হ'য়ে গেলো। আমি কিন্তু দৃঢ়ভাবেই বললুম, 'না, এ আমার ভালো মনে হয় না। ও দেশেই যাবে—কালই আমি ওকে পাঠিয়ে দেবো।'

অথচ আমাদের সঙ্গে শিমুলতলার গাড়িতেই ও চাপলো। আমি মানুষটা কেমন ভালোমানুষগোছের—দু'বারের বেশি তিনবার প্রতিবাদ করতে পারি না, একটু চাপ দিলেই রাজি হ'য়ে যাই।

ওদের রেখে শূন্য কলকাতায় ফিরে এলুম। সভা-সমিতি সব বন্ধ, লোকের মুখে লড়াই ছাড়া কথা নেই। দিনটা একরকম কাটে, সন্ধ্যার পর একলা বাড়িতে মিটমিটে আলোয় কিছু ভালো লাগে না।

কয়েকদিন পরেই বোমা-ঠেকানো দেয়াল তুলবে ব'লে কলেজ তিন সপ্তাহের জন্য আবার বন্ধ হলো। আর কথা কী। এক ছুটে শিমুলতলায়।

সরমা আমাকে দেখে বললে, 'বাঁচালে। যা-ই বলো বাপু, এ কিছু সুবিধের ব্যবস্থা নয়। এবার আমি তোমার সঙ্গেই ফিরবো।'

'পাগল নাকি!'

'তুমি যে-রকম ভিতু মানুষ, তোমাকে সামাল দেবার জন্যই আমার কাছে থাকা দরকার।'

'তুমি কাছে থাকলে ভয়ের কারণ বাড়বে বই কমবে না।'

'ও-সব তোমাদের জাঁক। তোমার জন্য আমার যত ভয়, আমার জন্য কি তোমার তত?'

যেখানে এক্ষুনি মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়বার আশঙ্কা নেই, এমন একটা জায়গায় এসে মনটা এত খুশি লাগছিলো যে হঠাৎ একটা রসিকতা ক'রে ফেললুম, 'আমার জন্য ভয় কী? কলকাতা এখন একেবারে স্ত্রীলোকবর্জিত।'

চশমা-পরা গম্ভীর চোখ তুলে ঈষৎ ঠোঁট বাঁকালে সরমা। 'আহা! খোকা হচ্ছো দিন-দিন!'

এতেও দমলুম না আমি, মুচকি হেসে বললুম, 'তা তুমি যা-ই বলো, বিরহে তুমি সুখেই ছিলে। এ-ক'দিনেই চেহারা বেশ ভালো হয়েছে।'

'শুধু-শুধু পেট ভ'রে খেলে আর প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমুলে কার না চেহারা ভালো হয়। এ-ভাবে আর-কিছুদিন থাকলে রীতিমতো মোটা হ'য়ে যাবো।'

'যাক, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তাহ'লে ?'

'কিসের ! তোমার বিদ্যাসাগর যেখানে আছে, সেখানে আবার অসুবিধে কী।'

'খুব বুঝি কাজের লোক হ'য়ে উঠেছে ও ?'

'ঝি আছে, চাকর আছে—বাসনও মাজতে পারে না, কাপড়ও কাচতে পারে না, এই যা ওর দুঃখ। আমি নিজের হাতে কিছু করতে গেলেই হাঁ-হাঁ ক'রে এসে পড়ে। লেখাপড়াই শেখাও আর জামাকাপড়ই পরাও, চাষার ছেলের চাষামি যাবে কোথায়।'

আহত হ'য়ে বললুম, 'আহা, ও-রকম বলো কেন। ভালোবাসে, তাই করে। ওর তো আর প্রকাশের অন্য ভাষা নেই।'

'এর মধ্যে একদিন গঙ্গার জ্বর হয়েছিলো—জল তোলবার জন্য লোক খুঁজছি—ও ছুটে গিয়ে শাঁইশাঁই ক'রে ইঁদারা থেকে পঁচিশ বালতি জল তুলে দিলে। গায়ে জোরও আছে।'

'তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়, সরমা। ঠিক লোক বেছে নিয়েছো। এ কি আর কেউ পারতো !'

'তুমি রাগ করো আর যা-ই করো, এ আমার ভালো লাগে না তা বলবোই। ও কি আমাদের চাকর ?'

সরমার সঙ্গে আর কথা না-কেটে আমি উঠে গেলুম গণেশের খোঁজে। এক কোণে একটি ছোটো ঘরে ওর আস্তানা। গিয়ে দেখি, ঘর ফাঁকা। সুদৃশ্য ছিটে ঢাকা বিছানা, টেবিলটি পরিপাটি গুছোনো। এ যে কার কাজ এক পলকেই বুঝলুম। সরমার হাত না-লাগলে কোনো ঘর কি এত সুন্দর হয়।

কোনো তাড়া নেই, কোনো ভাবনা নেই ; অত্যন্ত অলস এবং অত্যন্ত ভালো লাগছিলো। গণেশের বিছানাটায় শুয়ে পড়লুম লম্বা হ'য়ে। হাত বাড়িয়ে ওর টেবিল থেকে যে-কোনো একটা বই টেনে নিলুম।

একটা হালকাগোছের বই হ'লে মন্দ লাগতো না —কিন্তু বইটা দেখলুম পেঙ্গুইন সিরিজে হালফ্যাশনের পলিটিক্সের কপচানি। একটু অবাকই হলুম—গণেশ তাহ'লে ফিল্ম ছেড়ে পলিটিক্স ধরলো ? উঠে ব'সে তাকিয়ে দেখি, সাজানো বইগুলির মধ্যে বেশির ভাগই বালবোধ্য রাজনীতি—কোনোটা বিলেতে ছাপা, কোনোটা বম্বাইতে—আর তারই পাশে খান-কয়েক পাঠ্যবই বিমর্ষ মুখ ক'রে প'ড়ে আছে। সচিত্র সিনেমাপত্রগুলির চিহ্নমাত্র কোনোখানে নেই।

বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, এমন সময় গণেশ এলো ঘরে। তার চেহারা

কেমন শুকনো, চুল বড়ো-বড়ো হয়েছে। টিপ ক'রে একটু প্রণাম সেরে নিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি তার কাঁধে হাত রেখে বললুম, 'কেমন আছো, বিদ্যাসাগর।'

'ভালো আছি।' কথাটা যে বললে তাতে একটু রস নেই।

'এর মধ্যে তোমার বাবার একখানা চিঠি এসেছিলো।'

'বাবার চিঠি!' গণেশের মুখ টকটকে লাল হ'য়ে উঠলো, 'বাবা তো লিখতে পারেন না।'

'ঐ হ'লো। কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন আরকি। তাঁরা খবর পেয়েছেন যে বোমা প'ড়ে কলকাতা গুঁড়ো হ'য়ে গেছে—'

গণেশ বিদ্রূপের সুরে একটু হেসে উঠলো। এ-হাসিটা ঠিক আশা করিনি।

'দূরে ব'সে ও-রকম দুশ্চিন্তা হয়ই। আমি অবশ্যি বুঝিয়ে লিখে দিয়েছি যে তুমি নিরাপদেই আছো, তবু দেশ থেকে একবার ঘুরে এলে পারতে না?'

'এখন গেলে আমার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে।'

'দু চার দিনে আর এমন-কী ক্ষতি হবে-- পরীক্ষা তো পেছলো। এখানে এসে কোনো চিঠি লিখেছো ওঁদের?'

'লিখেছিলাম, ডাকে দেয়া হয়নি—তারপর কোথায় হারিয়ে গেছে।'

গণেশের মুখের দিকে আমি একটু তাকালাম। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিয়ে সে বললে, 'কালই আবার লিখবো।'

'হ্যাঁ, লিখে দিয়ো। ইচ্ছে না হয় এখন না-ই গেলে। সত্যিই তো, পরীক্ষার জন্য তৈরি হ'তে হবে। তা পরীক্ষার পড়া এক-আধটু পড়ছো, না কি এই সবই—' কাগজে বাঁধানো বইগুলো আমি তাসের মতো বিছানায় ছড়িয়ে দিলাম।

একবার বইগুলোর দিকে, একবার আমার দিকে তাকিয়ে গণেশ বললে, 'পরীক্ষার পড়াও পড়ছি বইকি। কিন্তু তাতে মন দিতে পারি না। পৃথিবী ভ'রে যখন আগুন জ্বলছে তখন একটা পরীক্ষা দেবার কথা ভাবতেও হাসি পায়।'

'সে কী! তাই ব'লে পরীক্ষা দেবে না?'

'দেবো না তা নয়, তবে—কেন এই যুদ্ধ, কোথায় পৃথিবীর গলদ, সেই কথাটাই আজ সবচেয়ে বড়ো কথা। অন্য-কোনো বিষয়ে মন দিতে না-পারাটা অন্যায় নয়।'

হেসে বললুম, 'সেইজন্যই এ-সব পড়ছো? বেশ, বেশ সে তো ঠিক কথাই। তবে পরীক্ষাও তো পাশ করতে হবে। তোমার মা বাবা, তোমার পাঁচটি ভাই-বোন তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। পরীক্ষাটা ভালো ক'রে দিয়ে নাও তারপর--সামনে

তো লম্বা ছুটি, যে-কোনো বিষয়ে যত ইচ্ছে পড়তে পারবে। মানুষের জ্ঞানের তো আর সীমা নেই।'

সকালের দিকে আমিই একটু বসতে লাগলুম ওকে নিয়ে। সব বিষয়েই কাঁচা, ইংরেজি বাক্যগুলো অশুদ্ধ ছাড়া লিখতেই পারে না। কুড়ি দিনে যতটা সম্ভব ঘ'ষে-মেজে দিলুম, কিন্তু ওর নিজেরই যেন গা নেই। আমার কাছ থেকে কোনোরকমে ছাড়া পেলেই ছুটে যায় সরমার কাছে—কী চাই, কী করতে হবে, কী আনতে হবে। বাজারে যাবে, দরকারির ফর্দ থেকে বাঁচিয়ে বেদরকারি একটা-দুটো আনবে; সরমা যদি কিছু-একটা রাঁধতে যায়, ও ব'সে থাকে চৌকাঠে; বিকেলবেলা সরমা যখন বাগানে বেড়ায় আগে-আগে চলে অভি, আর পিছনে গণেশ। চার বছরের ছেলে যেমন সব সময়ে মায়ের পায়ে-পায়ে হাঁটে এ যেন অনেকটা সেই রকম। কথাটা বললে খারাপ শোনায়, ভাবতেও ভালো লাগে না, কিন্তু সরমার প্রতি ওর তদ্‌গত ভাবটা অনেকটা চাকর কিংবা কুকুরেরই মতো। দুপুরে আর রাত্রে, যখন সরমাকে বাইরে দেখা যায় না, শুধু সে সময়টুকু গণেশ নিজের ঘরে আবদ্ধ থাকে, বোধহয় তখনই সে-সব বই পড়ে যাতে যুদ্ধের কারণ বুঝিয়ে বলা আছে।

একদিন সরমাকে বললুম, 'তোমার কথাই ঠিক। গণেশটা মানুষ হ'লো না।'

একটু যেন চমকে উঠে সরমা বললে 'কেন বলো তো?'

'পড়াশুনোয় মন নেই, এদিকে দেশেও যেতে চায় না।'

'মন নেই কেন? খুব তো পড়তে দেখি ওকে।'

'কী-সব ছাইভস্ম পড়ে।'

'না তো। অভিনেত্রীর ইতিবৃত্তে আর ওর মন নেই। ওর টেবিলটা যদি ছাখো—'

'দেখেছি। সেইজন্যই বলছি।'

আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে সরমা বললে, 'তুমিও কি বলবে যে পরীক্ষা পাশ করাটাই চরম মোক্ষ?'

'পাশ ক'রে যত অপদার্থ বেরিয়েছে, পাশ-না-করা অপদার্থের সংখ্যা তার চেয়েও যে বেশি সে-কথা আমাদের মনেই থাকে না। আর তাছাড়া—'

'যে-ছেলে পাঠ্যবই ছাড়া কিছু জানে না, তার মতো অপদার্থ আর কে।' আমার কথায় বাধা দিলে সরমা। 'আজকালকার নানা বিষয়ের দিকে ওর যে মন গেছে সেটা তো ভালোই।'

'ভালো নয় তা তো আমি বলিনি, তবে—'

আর-একবার আমার কথায় বাধা দিয়ে সরমা বললে, 'যুগে-যুগে ভালোও তো বদলায়। তোমরা রাসেল পড়তে, ওরা লাসকি পড়ছে। যখনকার যে হাওয়া।'

আমি বললুম, 'ভালো সব যুগেই ভালো।'

এর পরে যে-ক'দিন ছিলুম সরমার সঙ্গে আমার নানা বিষয়েই কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু গণেশের কথা একবারও ওঠেনি।

৪

কলকাতা ছেড়ে যারা পালিয়েছিলো একে-একে তারা ফিরতে লাগলো। গ্রীষ্মের শেষে আমরাও শিমুলতলার পাট তুলে দিলুম। কলকাতার বাড়ি ভ'রে উঠলো আবার।

গণেশ ফিরলো কলেজ খোলবার কয়েকদিন পরে। পরীক্ষা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশে গিয়েছিলো সে—ভাবিনি এত দিন থাকবে, কিন্তু সমস্ত ছুটিটাই কাটিয়ে এলো। ইতিমধ্যে তার পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। আমার মনে ভয় ছিলো ছেলেটা ফেলই করে বুঝি, কিন্তু সেকণ্ড ডিভিশনে উৎরে গেছে, যাই হোক।

তার সঙ্গে দেখা হ'তে বললুম, 'কী হে বিদ্যাসাগর, এবার অনেক দিন কাটিয়ে এলে দেশে।'

'শুধু দেশেই ছিলুম না—নানা জায়গায় ঘুরেছি।'

'বেশ, বেশ। এ সময়টা যা পারো বেড়িয়ে নেয়া ভালো। পরে আর সময় হয় না।'

গণেশ একটু কেশে বললে, 'আমি ঠিক বেড়াতে যাইনি। কাজে গিয়েছিলাম।'

'কাজ? কিসের কাজ?'

'আমাদের পার্টির কাজ। সঙ্গে আরো অনেকে ছিলো।'

'পার্টি? সে আবার কী?'

আমার কথাটার জবাব না-দিয়ে গণেশ বললে, 'মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, এই তিনটে জেলায় খুব ঘুরলুম। খুব ভালো কাজ হচ্ছে।'

আমি জিগেস করলুম, 'তোমার বাবা তোমার পাশের খবর পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলেন তিনি?'

'দেশে গিয়ে চাষবাস করতে বলেন।'

'এখন কি আর তুমি তা পারবে ?'

'আমি বি. এ -তে ভর্তি হবো।'

'তা বেশ তো—কিন্তু তার চেয়ে বরং একটা চাকরিতে ঢুকে পড়াই কি ভালো না ? যুদ্ধের জন্য চাকরির ছড়াছড়ি আজকাল। এ-রকম সুবিধে আর শিগগির আসবে না। তুমি যদি বলো আমি এক্ষুনি—'

'না। চাকরি আমি করবো না। পড়বো।'

'এখন যে কোনোটায় ঢুকে পড়লে দেখতে-দেখতে দু'শো-আড়াইশো মাইনে হ'য়ে যাবে তোমার। তখন ভাইবোনগুলিকে এখানে আনিয়ে মানুষ করতে পারবে। মা-বাবা সুখের মুখ দেখবেন। দেশে তো তোমাদের এমন কিছু নেই যার উপর ভরসা করতে পারো।'

তবু গণেশকে রাজি করাতে পারলুম না। চাকরি সে করবে না, বি. এ পড়বেই। অগত্যা সরমার শরণ নিলুম—সে যদি ছেলেটাকে বোঝাতে পারে। ওর বি এ পড়া যে একান্ত নিরর্থক এবং চাকরি করাই সবচেয়ে ভালো, এ-বিশ্বাস আমার মনের মধ্যে এমন দৃঢ় হ'য়ে উঠেছিলো যে এর একটা মীমাংসা না-হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না।

'কী হবে প'ড়ে। এমন-কিছু ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে তো নয়। বি এ. পাশ না-করলে যে-সব চাকরি হয় না, ওর শিডিউল্ড কাস্ট-এর জোরে এক্ষুনি তার একটা ওর হ'য়ে যায়। নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে ওর বাপ। ভাই-বোনগুলি মনুষ্যপদবাচ্য হবে, সেটা কি কম কথা।'

সরমা আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুনে বললে, 'কিন্তু তুমিই তো বলো যে পড়াশুনোর একটা নিজস্ব মূল্য আছে।'

'সে ওর যেটুকু হবার হয়েছে। আর খুব বেশি ওর কিছুতেই হবে না। শিক্ষিত হবার ক্ষমতা সকলের সমান থাকে না তো।'

'ওর জীবন তাহ'লে এখানেই খতম ?'

'জীবন খতম হবে কেন ? জীবন তো মোটে আরম্ভ। তুমি যদি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো—'

'আমি কিছু বুঝিয়ে বলতে পারবো না। ও হয়তো ভাববে, আমরা ওর ভার আর বহন করতে চাচ্ছি না। সে আমার ভারি লজ্জা করে।'

কথাটা শুনে চমক লাগলো। এ-প্রশ্নের যে এও একটা দিক আছে আমার তা কখনোই মনে হয়নি। এই দু' বছরে ওকে একান্ত আপন ব'লে ভাববার অভ্যেস হ'য়ে

গিয়েছিলো, কিন্তু যার উপকার করা হয়, সে বুঝি কখনোই আপন হয় না। যে দেয় সে-ই যে ঋণী হয়, যে নেয় তার কোনো দায় থাকে না, এ-কথা হঠাৎ উপলব্ধি ক'রে অবাক হলাম।

নিজের সঙ্গেই তর্ক ক'রে বললাম, 'পাছে ও কিছু মনে করে সে-ভয়ে ওর ভালোর জন্যও চেষ্টা করবে না তুমি ?'

সরমা বললে, 'ও আমি কিছু পারবো না। তুমি যা হয় করো।'

ইকনমিক্সে অনর্স নিয়ে থর্ড ইয়ারে ভর্তি হ'লো গণেশ। এবারে তার আর-এক চেহারা। লুটিয়ে-পড়া কোঁচাটা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কোমরে উঠেছে, গায়ে হাত-কাটা শার্ট, পায়ে ধূলি-মলিন স্যাণ্ডেল। জামা-কাপড় সর্বদা আধ-ময়লা, মুখ-চোখ সর্বদাই রুক্ষ, অপরিচ্ছন্ন অবিন্যস্ত চুল—দেখে মনে হয় কতদিন স্নান করেনি, কেমন একটা উড়ন্ত উদ্‌ভ্রান্ত অন্যমনস্ক ভাব। ক্লাশে আসে, সঙ্গে বইখাতা কিছুই আনে না, একেবারে পিছনের বেঞ্চিতে উদাস ভঙ্গিতে ব'সে থাকে, যখন ইচ্ছা উঠে বাইরে চ'লে যায়। ক'দিন পরে দেখলুম, ক্লাশে আর আসেই না, অথচ করিডোরে ওকে দেখতে পাই ছেলেদের নিয়ে জোট পাকিয়ে হৈ-চৈ করছে।

হৈ-চৈয়ের ঢেউ লাগলো এসে আমার বাড়িতেও। উপনিষৎ-সমিতির অধিবেশন সেরে বাড়ি ফিরতে সেদিন সন্ধে হ'য়ে গিয়েছিলো। ঢুকেই শুনি, বসবার ঘরে খুব কথাবার্তার আওয়াজ হচ্ছে। একতলায় যেটি আমাদের পোশাকি বসবার ঘর, বিশেষ-কেউ না-এলে সেটি প্রায় ব্যবহারই হয় না, হঠাৎ সেখানে কে এলো দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি সে-ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। সরমাকে ঘিরে ব'সে আছে সাত-আটটি ছেলেমেয়ে, গণেশ ছাড়া সকলেই আমার অচেনা।

আমি ঢুকতেই কথাবার্তার গুঞ্জন হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেলো। গণেশ হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, দেখাদেখি অন্য সবাই উঠলো। আমি কেমন-একটু অপ্রস্তুতভাবে হেসে বললুম, 'তারপর ? কী-রকম ? কী হচ্ছে-টচ্ছে ?'

কথাটার জবাব দিলে সরমা : 'ওদের ছাত্র-সমিতির বৈঠক বসেছে—আমাকেও টেনে নিয়ে এসেছে এর মধ্যে—কী কাণ্ড ছাখো তো।' ব'লে ঈষৎ লজ্জিতভাবে একটু হাসলো।

গণেশ বললে, 'এ-যুদ্ধে আমাদের কর্তব্য কী—এই নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা-সভা। এ-বিষয়ে আপনি যদি কিছু...'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'না, না, এ-সব যুদ্ধ-টুদ্ধ বিষয়ে আমি কিছু বুঝি না—'

ব'লেই মনে হ'লো ছেলেমেয়েদের মধ্যে কী-রকম একটা ইঙ্গিত চোখে-চোখে ঠোকর খেয়ে-খেয়ে অবশেষে সরমার শান্ত দৃষ্টির কাছে এসে অবসন্ন হ'য়ে মিলিয়ে গেলো।

যথেষ্ট বিনীতভাবে গণেশ বললে, 'আপনি একটু বসবেন না?'

'আমি? এ তো তোমাদেরই সভা, তোমরাই চালাবে। তোমাদের মধ্যে এ-রকম উৎসাহ দেখে ভারি আনন্দ হ'লো। বেশ, বেশ এই তো চাই।'

যথোচিত মাষ্টারি ধরনে যথাযোগ্য পিঠ চাপড়ানো সেরে পালিয়ে এলুম উপরে। একটু পরে সরমাও এলো।

'চা দিয়েছে তোমাকে? খাবার-টাবার সব করা আছে।'

'ঠিক আছে সব। তুমি আবার এলে কেন—ওদিকে ওরা সব -'

'ওদের মধ্যে ব'সে থাকতে আমারই কি ভালো লাগে, কিন্তু ওরা তো ছাড়বে না,' একটু লাল হ'য়ে একটু-খুশি-খুশি স্বরে সরমা বললে।

'ভালো তো। তুমি থাকলে ওদের উৎসাহ কত বাড়ে।'

'উৎসাহ!' টেবিলের উপর চায়ের বাসন সাজাতে-সাজাতে সরমা বললে, 'উৎসাহের আর প্রয়োজন নেই ওদের। তোমার বিদ্যাসাগর একাই একশো।'

'উৎসাহের আতিশয্যে তোমার সামনেই সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছিলো বুঝি?'

'সিগারেট খেতে হয় তো সামনাসামনি খাওয়াই ভালো। লুকোচুরি ভালো লাগে না আমার।'

'কিন্তু সিগারেট খাবার পয়সা ও কোথায় পায় বলো তো।'

'আমি ওকে যা হাতখরচ দিই তা-ই থেকেই চালায় বোধহয়। তাছাড়া আর পাবে কোথায়?'

'ওকে আলাদা ক'রে হাত-খরচ দাও নাকি আবার?'

'আহা—না-দিলে যেন চলে। এত বড়ো ছেলে—এট-ওটা কত কী আছে।'

সরমা চা ঢেলে আমার দিকে পেয়ালা এগিয়ে দিলে।

'তুমি?'

'আমি ওদের সঙ্গেই খেয়ে নিয়েছি। ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছে—একটু চায়ের ব্যবস্থাও করতে হ'লো। তুমি চা খেয়ে একবার যাবে নাকি নিচে?'

'না, আমি আর—'

'যাই একবার, দেখে আসি ওরা কী করছে। ঐ পেঁপেটুকু খেয়ো কিন্তু—কেষ্টনগর থেকে মাসিমা পাঠিয়েছেন।'

খানিক পরেই ওদের সভা বেশ জ'মে উঠলো দেখলাম। দেখলাম মানে শুনলাম।

সরু-মোটা গলায় মেশানো চেঁচামেচি হাসাহাসিতে বাড়িটা সরগরম হ'য়ে উঠলো। আমি টেবল-ল্যাম্প জ্বেলে ব'সে-ব'সে বৌদ্ধ শাস্ত্র পড়তে লাগলাম—কিন্তু কানটা, এবং সেই সঙ্গে মনটা, মাঝে-মাঝে একতলার দিকে বিক্ষিপ্ত হ'তে লাগলো।

প্রায় ন'টার সময় সরমা উপরে এলো। আমি বললুম, 'কী? সভা ভাঙলো তোমাদের?'

'আর বোলো না—যত ছেলেমানুষি কাণ্ড।'

'বিদ্যাসাগর কোথায়?'

'ওদের এগিয়ে দিতে গেছে। ছাত্রমহলে ওর কিন্তু বেশ প্রতিপত্তি।'

'তাই বুঝি?'

'ছেলেটার মধ্যে সার পদার্থ কিছু আছে। দেখো, ও বেশ নাম করবে একদিন।'

'তা হয়তো করবে, কিন্তু আপাতত ওর হয়েছে কী, বলতে পারো? বড্ড ক্লাশ কামাই করে—আর দেখে মনে হয় নিয়মিত স্নানাহারও করে না।'

সরমা গম্ভীরভাবে বললে, 'ওর দোষ কী—পার্টির কাজ ক'রে একেবারে সময় পায় না।'

'আমরা যাকে দল বলতুম আজকাল বুঝি তাকে পার্টি বলে? কিন্তু দলটা কিসের?'

'সে আছে ওদের। তা নিয়ে এত খাটতে হয় ওকে—'

'বেশ তো। কলেজ ছেড়ে দিক না তাহ'লে। কলেজে নাম রাখলে মাঝে-মাঝে তো ক্লাশে যাওয়া উচিত?'

সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে সরমা বললে, 'খিদে পায়নি তোমার? খাবে চলো।'

বিদ্যাসাগরকে এক-আধটু যা চোখে দেখা যেতো, এর পরে সে একেবারেই নিখোঁজ হ'লো। বাড়িতেও তার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। সরমার কাছে খোঁজ নিয়ে জানলুম সে আজকাল বাড়িতে প্রায়ই থাকে না: সকালে বেরিয়ে যায়, দুপুরে ভাত খেতে কোনদিন ফেরে, কোনোদিন ফেরে না, রাত্তিরে ফেরে কখনো এগারোটায় কখনো বারোটায়। একটু হেসে সরমা বললে, 'ও আজকাল ভীষণ ব্যস্ত।'

'কিন্তু এ রকম করলে শরীর টি'কবে তো?'

সরমা সগর্বে বললে, 'এ-সব কাজে যারা নামে তাদের আবার শরীরের ভাবনা।'

ইতিমধ্যে আমার বাড়িতে ছাত্রসমিতির সভা আরো দু'বার হ'য়ে গেছে। সরমাকে প্রেসিডেণ্ট করেছে ওরা, তাই সভার দিন ছাড়াও ছেলেমেয়েদের যাওয়া-আসা লেগেই আছে। একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে দেখি বাইরের ঘরে একটি ছেলে আর

দুটি মেয়ে ব'সে আছে। ওরা আমার কাছেই কোনো কাজে এসেছে মনে ক'রে জিজ্ঞাসু চোখে ওদের দিকে তাকালুম। ছেলেটি বললে, 'বসুন। সরমা দেবীকে খবর দেয়া হয়েছে। উনি আসছেন।'

মাথা নিচু ক'রে ঈষৎ লজ্জিতভাবে ভিতরে চ'লে এলুম। মনে-মনে ভাবলুম, এ-রকম ভুল ভবিষ্যতে আর আমার যাতে না হয় সে-বিষয়ে সতর্ক হ'তে হবে।

পুজোর ছুটির কিছু দিন আগে কলেজ থেকে গণেশের নাম কাটা যাবার উপক্রম হ'লো। অনেক ক্লাশে প্রক্সি দিয়ে চালিয়েও মোটের উপর কামাই হয়েছে বড্ড বেশি; তার উপর তিন মাসের মাইনে বাকি। এবার ওকে পুরো মাইনেতেই ভর্তি করেছিলাম—আমিই যখন ওর সমস্ত ভার নিয়েছি তখন আর ওর জন্য অনুগ্রহ চাওয়ার মানে হয় না।

সরমাকে বললুম, 'গণেশকে তুমি কলেজের মাইনে দাওনি?'

'হ্যাঁ, আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে তো মাসে-মাসে।'

'কিন্তু কলেজে এক পয়সাও দেয়নি। ওর নাম কাটা যাবে।'

সরমা অবিচলিতভাবে বললে, 'টাকাটা পার্টিতে দিয়েছে বোধহয়। তা ওটা আবার দিয়ে দিলেই হবে।'

স্তম্ভিত হ'য়ে বললুম, 'বলছো কী তুমি! আমাদের কি এতই টাকা?'

'আচ্ছা, আমিই না-হয় দিয়ে দেবো ওটা।'

'সে-কথা নয়। টাকাটা আমাদের পক্ষে বেশি কিছু নয় জানি, কিন্তু অবিরত এ-রকম প্রশ্রয় পেতে থাকলে ওর কী উপায় হবে? গরিবের ছেলে মারা পড়বে যে।'

'ও কার ছেলে সে-কথা ভুলতে পারো না কেন তুমি?'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'সেটা কি একটা ভোলবার মতো কথা।'

মাইনেপত্র চুকিয়ে প্রিন্সিপালকে ব'লে-ক'য়ে কলেজের খাতায় ওর নাম বহাল রাখলুম। ভেবেছিলুম এর পরে ওকে ক'ড়া ক'রেই দুটো কথা বলবো, কিন্তু এর মধ্যেই একদিন খবর এলো যে বাংলা দেশের সবচেয়ে দুর্গত জেলাকে নিয়ে ভাগ্যবিধাতার পরিহাস আরো-একবার সর্বনাশে উত্তাল হ'য়ে উঠেছে।

সেদিন কলকাতাতেও ঝোড়ো হাওয়া, আকাশে মেঘ, টিপটিপ বৃষ্টি। কলেজ থেকে আর-কোথাও না-গিয়ে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরলুম। বসবার ঘরে শুনলুম গণেশের গলা। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে ডাকলুম, 'গণেশ, শোনো।'

গণেশ বেরিয়ে এলো।

'তোমার দেশের খবর তো বড়ো ভালো শুনছি না।

'আমাদের রিলিফ কমিটি প্রস্তুত, শিগগিরই বেরিয়ে পড়বো আমরা। এখন তারই আলোচনা চলেছে আমাদের মধ্যে।'

'তোমাদের দিকটা কি ঝড়ে পড়েছে মনে হয়?'

'আমাদের দিক? ও, আমাদের গ্রামের কথা বলছেন? না, ঝড় তাকে দয়া ক'রে ছেড়ে গেছে ব'লে তো মনে হয় না,' গণেশের ঠোঁটে বাঁকা একটু হাসি ফুটে উঠলো। আমি অবাক হলাম।

আর-কিছু বললাম না তখন, কিন্তু ওর মা-বাপ ভাই-বোনের কথা ভেবে দুঃসহ উদ্বেগে সারা রাত ঘুমোতে পারলাম না আমি। শুনছি গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে—গণেশের কপালে কী ঘটেছে কে জানে।

দিন পনেরো পরে গণেশ ফিরে এলো। পাঁচটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে ওর মা কোনোরকমে বেঁচে গেছেন, বাবাকে বানে গিলেছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'তারপর?'

'তারপর আর কী। আমার মামা-বাড়ির দিকটায় খুব কিছু হয়নি—মামা সকলকে নিজের কাছে নিয়ে রেখেছেন।'

'তা তুমি মা-র কাছে থাকলে না?'

'সময় হ'লো কই। চারদিকটাই ঘুরে দেখতে হ'লো।'

'আবার যাবে না?'

'যাবো বইকি। আমাদের কাজই তো এই।'

'মা-র কাছে যাবে না?'

'তাও যাবো। তবে সেখানে ব'সে থাকলে আর চলবে না তো।'

'তোমার মামা কী করেন?'

'বাবা যা করতেন তা-ই করেন।'

'কী ক'রে চলবে?'

'খুব সম্ভব চলবে না।'

বলতে যাচ্ছিলাম, 'কিছু টাকা তুমি এক্ষুনি তোমার মা-র নামে পাঠিয়ে দাও,' বলতে-বলতেও থেমে গেলাম। গণেশের হাতে টাকা দিলে ওটা যথাস্থানে পৌছবে কি? ওর মা-র নাম ও মামার ঠিকানা লিখে নিয়ে পরের দিনই পঞ্চাশ টাকা মনি-অর্ডর ক'রে দিলুম। কয়েক দিন পরে গণেশ আবার রিলিফের কাজে বেরিয়ে গেলো। পুজোর ছুটির পরে কলেজ খুললো, কিন্তু গণেশ আর কলেজে ফিরলো না।

৫

মেদিনীপুরের বন্যার জের থামতে-না-থামতেই বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো।

আইনত যদিও গণেশ এখন আর ছাত্র নয়, তবুও সে একজন ছোটোখাটো 'ছাত্র-নেতা'। সে সভা আহ্বান করে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বক্তৃতা দেয়, তার নাম খবর-কাগজে ওঠে। 'গণ-মণ্ডল' ছদ্মনামে দিগ্বিদিকে প্রবন্ধ লেখে - তাতে ভাষাবিন্যাসের ভুল যতই থাক, ঝালে ঝাঁঝে পিত্তে অম্লরসে একেবারে ভুরভুর করছে, কেউ-কেউ বলছেন যে এই হচ্ছে ঠিক যুগোপযোগী লেখা। অন্তত তার ছদ্মনামটি যে যুগোপযোগী সে-বিষয়ে কারো মনেই সন্দেহ নেই।

আমার বাড়ির একতলাটি বলতে গেলে ছাত্র-সমিতির আপিশে পরিণত হয়েছে। সব সময়েই সেখানে ভিড়। তিনটি ঘর উপচে পড়ছে। কেউ-কেউ রাত্তিরেও সেখানে থাকে বোধহয়, বাইরে থেকে কেউ-কেউ এসে সেখানে ওঠে হয়তো -- মোট কথা, একটা উন্মুখর ব্যস্ততা সেখানে লেগেই আছে। তা থাকবে না—কত দিকে কত কাজ ওদের।

বলা বাহুল্য, আমি আমার দোতলার ঘরে আশ্রয় নিয়েছি। বাড়িতে যতক্ষণ থাকি, একা-একা পড়াশুনো ক'রেই সময় কাটে। সরমা আজকাল এত ব্যস্ত যে রাত্তিরে শোবার সময় ছাড়া ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয় না—আর তখন ও এত শ্রান্ত থাকে যে শোবামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। ছাত্র-সমিতির ও-ই প্রাণ, ওদের সমস্ত কর্মের ও-ই উদ্দীপনা। শুধু তা-ই নয়, ও নিজেও ডুবে গেছে কাজের মধ্যে। এই বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, এই চিঠি লিখছে, এই কথা বলছে টেলিফোনে; আর সব সময় ছেলেমেয়েদের দল ঘিরে রেখেছে ওকে। দেখে-দেখে আমি অবাক হ'য়ে যাই। ওর দেহেও যেন লেগেছে কাজের আঁটোসাঁটো, কাটাছাঁটা ছন্দ, ওর ভঙ্গিতে কোনো বিলম্বিত লয় আর নেই, কথায় কোনো রেশ নেই, ভাষায় কোনো রস নেই। প্রতি দিনের প্রতিটি ঘণ্টাকে ও নির্দিষ্ট কাজের ট্যাকশো দিয়ে বিদায় ক'রে দেয়—কিছুই বাহুল্য নেই ওর, কিছুই ওর অনর্থক নয়। যে-বিষয়ে যেটুকু বলবার ঠিক সেটুকুই বলে, এবং যথেষ্ট জোর দিয়েই বলে। যেমন কিনা, কয়েক মাস আগে আমি যখন বলেছিলুম যে গণেশের পক্ষে এখন চাকরিতে না-ঢোকা অত্যন্ত অন্যায়, সরমা শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে বলেছিলো, 'না, কিছুই অন্যায় নয়।'

আমি তর্ক করেছিলুম, 'কেন নয়? ওর বাবা থাকতে তবু একরকম চলছিলো—এখন ওর মা-কে, ওর ভাইবোনগুলিকে খাওয়ায় কে? কলেজও তো ছেড়ে দিলো

—চাকরি না-করবার কী-কারণ থাকতে পারে আমি তো ভেবে পাই না। আর এখন এমন সুবিধে। চাইলেই চাকরি।'

'হয় কলেজে পড়বে, নয় চাকরি করবে—এ ছাড়া তুমি কি মানুষের আর-কিছুই ভাবতে পারো না?'

'ওর পক্ষে কিছু ভাবতে পারি না।'

'যে-কাজে ও নেমেছে তার কাছে তুচ্ছ কলেজ, তুচ্ছ চাকরি।'

'কিন্তু ওর মা? ওর ভাই-বোন?'

'ওর কাজ তো তাদেরই জন্য। পৃথিবীর সমস্ত মা, সমস্ত ভাই-বোনদের জন্য।'

ভেবে দেখলুম যে কথাটা ঠিকই। সমস্ত দেশের, সমস্ত পৃথিবীর দুঃখ যাকে ডাকছে, মা কিংবা ভাই-বোনের কথা ভাববার সময় কোথায় তার? অগত্যা গণেশের মা-কে আমিই মাসে-মাসে টাকা পাঠাচ্ছি।

সরমার নামও আস্তে-আস্তে ছড়াচ্ছে। বাড়ির সভা থেকে বাইরের সভা, বাইরের সভা থেকে হৈ-চৈ সভা পর্যন্ত ওর কণ্ঠস্বর যখন পৌঁছলো, তখন একদিন সকালে খবর-কাগজ খুলে চমক লাগলো। আরে, ওর ছবি বেরিয়েছে যে।

'শোনো, শোনো—কোথায় তুমি', স্ত্রীর গৌরবে আমার মনটা বেশ খুশিই লাগছিলো, সত্যি বলতে—'দেখে যাও, তোমার ছবি বেরিয়েছে কাগজে।'

সরমা বাঁকা ঠাণ্ডা চোখে ছবিটার দিকে একটু তাকিয়ে বললে, 'কী হয়েছে তাতে?'

'কী কাণ্ড! তোমার ছবি। আর বেশ বড়ো ক'রে ছেপেছে—দেখেছো? ছবিটা তুলেছেও বেশ।'

'তোমার স্ত্রীর ছবি কাগজে উঠতে পারে তা বুঝি তুমি ভাবতেও পারো না?'

'তা কেন? তবে কিনা আমি তো জানতুম না - একেবারেই আশা করিনি—তাই ভারি ভালো লাগছে। দেখলে তো! আগে তো সভা-টভায় যেতেই চাইতে না—কত ঝগড়া করেছো আমার সঙ্গে—যেতে আরম্ভ করলে নেহাৎ মন্দ লাগে না, কী বলো?'

'আগে তো আমাকে কেউ যেতে বলেনি কোথাও।'

'বুঝেছি। অমুক বাবুর স্ত্রীকে বলেছে—এই তো? তা যে-রকম অবস্থা দেখছি, আর ক'দিন পরে অমুক দেবীর স্বামীর নিমন্ত্রণ আসতে থাকবে নানা জায়গা থেকে। তখন আমাকে আঁচলে বেঁধে নিয়ে যেতে ভুলো না কিন্তু।'

এ-রকম কথার উত্তরে স্ত্রীরা সাধারণত 'আহা!' কিংবা 'ঢং!' কিংবা ঐ রকম কোনো ক্ষুদ্র অথচ দ্যোতনাময় শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকেন, কিন্তু সরমা বললে, 'স্বামিত্বের

উচ্চ আসন কখনোই ভুলতে পারো না দেখছি।' ও-কথা থেকে এ-কথা কী ক'রে এলো বুঝতে পারলাম না ; ভাবতে-ভাবতে স্নান করতে চ'লে গেলাম।

সেদিন বারোটায় ক্লাশ ছিলো, গিয়ে দেখি কী-কারণে ঠিক বারোটাতেই ছুটি হ'য়ে গেছে। আর-কিছু করবার ছিলো না, বাড়ি চ'লে এলুম। উপরে শোবার ঘরে সরমা বেরোবার কাপড়-চোপড় প'রে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে।

'কোথায় যাচ্ছো ?'

'যাচ্ছি না, ফিরছি।'

'কোত্থেকে ?'

'রানাঘাটে একটা মিল্ক-ক্যানটীন খুলে এলাম।'

'রানাঘাটে !'

'এতে অবাক হবার কী আছে। বিকেলে যেতে হবে বেহালার ডেস্টিট্যুট হোম দেখতে। তুমি আজ এত শিগগির ফিরলে ?'

শেষের কথাটার জবাব না-দিয়ে বললাম, 'স্নান ক'রে খেয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে নাও, এতটা ঘোরাঘুরি—'

স্যাণ্ডেলের চটপট শব্দ করতে-করতে গণেশ ঘরের মধ্যে ঢুকলো। 'বৌদি, ত্রিপুরাবাবু—' আমাকে দেখেই অল্প একটু থতমত খেয়েই মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে কথা শেষ করলে, 'বৌদি, ত্রিপুরাবাবু এসেছেন।'

মনে হ'লো অনেকদিন পর বিদ্যাসাগরকে দেখলাম। তার পরনে শার্ট আর শাদা ট্রাউজর্স। সুন্দর সুগঠিত দেহ, কালো-কালো ভরা-ভরা চোখ, এত যে অনিয়ম করে, তবু মুখে-চোখে একটি সতেজ লাবণ্যের আভা। দেখে ভালো লাগলো, ওকে কিছু বলবার জন্য মনটা উন্মুখ হ'য়ে উঠলো। কিন্তু আমাকে সে-সময় না-দিয়েই ও ছপছপ ক'রে নেমে গেলো সিঁড়ি দিয়ে।

হেসে বললুম, 'যা-ই বলো, আমাদের বিদ্যাসাগর দেখতে কিন্তু বেশ সুন্দর হয়েছে।'

আয়নার দিকে তাকিয়ে চুল ঠিক করতে-করতে সরমা বললে, 'মানুষের পরিচয়পত্রে সেটাই খুব বড়ো কথা নয়।' ব'লেই যাবার জন্য পা বাড়ালো।

'সে কী ! যাচ্ছো কোথায় ?'

'যাই। ত্রিপুরাবাবু ব'সে আছেন।'

'কে এই ত্রিপুরাবাবু ?'

'উনি একজন মস্ত শ্রমিক-নেতা। নামও শোনোনি ?' সরমা অস্ফুটে হাসলো।

আজ হঠাৎ অনেকদিন পরে সরমার সঙ্গে অসময়ে আশাতীত আমার দেখা।

মনে-মনে ইচ্ছে হচ্ছিলো ও একটু বসুক, একটু কথা বলি--বিশ্বজগতের কথা নয়, ন্যায়-অন্যায়ের সমস্যা নয়—যে-কথা মুহূর্তকে রঙিন ক'রে মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়, এমন কথা।

তাই বললুম, 'নামজাদাটি একটু না-হয় ব'সেই থাকলেন। তুমি তো এইমাত্র ফিরলে। খাবে-টাবে না?'

'আসছি।' সরমা আবার পা বাড়ালো।

আমি পিছন থেকে ডাকলুম, 'শোনো, শোনো, তোমাকে কেমন-যেন অন্যরকম লাগছে আজ—'

সরমা মুখ ফিরিয়ে বললে, 'কী-রকম বলো তো?'

আমি ওর দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে বললাম, 'ও, তাই!'

'কী হয়েছে?'

সিঁথিতে অস্পষ্ট অস্ফুট একটু সিঁদুরের আভাস ছাড়া বারো বছরের অভ্যস্ত বেশভূষার কোনো চিহ্ন রাখেনি সরমা।

'এই বুঝি তোমাদের নব্য বেশ? কবে থেকে ধরলে?'

'কবে থেকেই তো।'

'বলো কী। লক্ষ্য তো করিনি।' ব'লেই মনে হ'লো লক্ষ্য করবার সময়ই বা কখন হয়েছে। ঠাট্টা ক'রে বললুম, 'দাসত্বের কোনো চিহ্ন বুঝি আর অঙ্গে ধারণ করবে না?'

'আমি যে একজনের স্ত্রী সেটা চারদিকে অমন সরবে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়াবার কী-দরকার?'

'স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিতেও বুঝি লজ্জা? তা আর যা-ই করো, মাথায় কাপড়টা দিলেই পারো। ওটা না-থাকলে মোটে সম্ভ্রান্ত দেখায় না।'

'ও কিছু না। ও-সব সংস্কার।'

বলতে যাচ্ছিলুম, 'ঐ যে সিঁদুরটুকু রেখেছো, ও-ও তো সংস্কার—' কিন্তু তক্ষুনি গণেশ আবার এসে দরজায় দাঁড়ালো—'বৌদি, বীরেশ্বরবাবু এসেছেন।'

'যাচ্ছি।'

'কী ব্যাপার, বিদ্যাসাগর, আজ তোমাদের খুব জরুরি মীটিং বুঝি?'

সরমা চঞ্চল হ'য়ে বললে, 'একটায় ওঁদের আসতে বলেছিলাম—ভাবিনি রানাঘাট থেকে ফিরতে এত দেরি হবে।'

আমি গণেশকে বললুম, 'তা তোমরা একটু কথাবার্তা চালাও, উনি খেয়ে-দেয়ে আসছেন।'

গণেশ সরমার দিকে একবার তাকাতেই সরমা বললে, 'না, না, চলো। কাজটা সেরে আসি।'

একটা অনির্দিষ্ট দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে, একটু যেন দ্বিধা ক'রে গণেশ বললে, 'বীরেশ্বরবাবু একজন সাহিত্যিক। আমরা একটা গণ-সাহিত্য-সংঘ স্থাপন করেছি—সেইজন্যে এ রা এসেছেন। মাষ্টার মশাই কি একবার—'

'মাষ্টার মশাই! তুমি আছো কোথায়! তিনি যে এখনো উপনিষদে মশগুল।' ব'লে সরমা কাঁধের একটি দ্রুত ভঙ্গি ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। নিজের মুখ নিজে দেখা যায় না, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে তখন আমার মুখটা অত্যন্ত বোকা-বোকা দেখাচ্ছিলো।

একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়লুম। খানিক পরে পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখি, সরমা তার কাপড়ের আলমারি খুলে এক তাড়া কাগজ বের ক'রে নিচ্ছে। আমার পাশ দিয়ে চ'লে যেতে-যেতে হঠাৎ একটু দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখেছো, তোমার বিদ্যাসাগর নাটক লিখেছে।'

'সত্যি?'

'খুব ভালো হয়েছে—প'ড়ে দেখো এক সময়। চমৎকার লিখছে আজকাল।'

'ওর কোন লেখাটা তোমার চমৎকার লাগলো?'

'কোনটা? কোনটা নয়? এইমাত্র বীরেশ্বরবাবু কত সুখ্যাতি করলেন ওর। বললেন, "আপনার এই দেওরটি মস্ত লেখক হবে।" উনি নতুন এসেছেন কিনা—ভেবেছেন ও বুঝি সত্যি আমার—'

'ও আজকাল তোমাকে বৌদি ডাকে, না?'

'কেন? বরাবরই তো—'

'আগে না মা ব'লে ডাকতো?'

সরমা একটু লাল হ'য়ে বললে, 'ওঃ। সে তুমি কবেকার কথা বলছো। তাও লোকের কাছে বলতো শুধু, মুখোমুখি কখনো না। অত বড়ো ছেলে আমাকে মা ডাকবে কী।'

'কেন, ওর মতো ছেলে কি তোমার থাকতে পারতো না?'

'যাঃ!'

'অনেকটা বেশি বয়েসে বিয়ে করেছিলে ব'লেই তো—তা না-হ'লে—'

'সেইজন্যই তো বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলুম' বলতে-বলতে সরমা চ'লে গেলো।

শুয়ে-শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ঘুম যখন ভাঙলো বেলা প'ড়ে এসেছে। সমস্ত

বাড়িটা এমন চুপচাপ যেন জনপ্রাণী নেই। অনভ্যস্ত দিবানিদ্রার পর মনটা বিমর্ষ লাগছিলো, কী করি কী করি ভাবতে-ভাবতে বাইরে এলুম। বারান্দায় অভি চুপচাপ গালে হাত দিয়ে একটা মোড়ায় ব'সে আছে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

'অভি! স্কুল থেকে কখন ফিরলি?'

'এই তো।'

'খেয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

'চুপচাপ ব'সে আছিস যে?'

'এই ব'সে ছিলুম।' তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হ'লো সে তার বয়সের চাইতে হঠাৎ অনেক বেশি বড়ো হ'য়ে গেছে।

'পাড়ার সিনেমায় কী হচ্ছে রে?' আমি ফুর্তির সুর আনবার চেষ্টা করলাম।

'লরেল-হার্ডি।'

'যাবি দেখতে?'

অভি লাফিয়ে উঠে বললে, 'যাবো, বাবা।'

'একা যেতে পারবি তো?'

'খুব পারবো। এই তো বাজার ছাড়িয়েই সিনেমা, আমি তো ওখানে রোজই যাই—'

'অ্যাঁ? রোজই যাস?'

'বাঃ। এটুকুও পারবো না? আমি এখন কত বড়ো হয়েছি।'

'নিজে টিকিট কিনতে পারবি, না রঘুকে সঙ্গে দেবো?'

'না বাবা, রঘুকে না, আমি একা যাবো।'

'আচ্ছা বেশ—' একটা টাকা দিলুম ওর হাতে—'যাবার সময় রঘুকে ব'লে যাস তো আমাকে যেন চা দেয়।'

অভি লাফাতে-লাফাতে চ'লে গেলো। আমি বারান্দাতেই একটা বেতের চেয়ারে ব'সে সকালের বাসি কাগজটা তুলে নিয়েই আবার রেখে দিলুম। কাগজের ভাঁজ থেকে সরমার ছবিটা আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

রঘু যখন চা নিয়ে এলো, জিগেস করলাম, 'রঘু, মা কখন বেরিয়েছেন?'

'এই খানিকক্ষণ হবে।'

'খেয়েছিলেন?'

'প্রায় তিনটের সময় খেলেন।'

'নিচে এখন কে আছে?'

'কেউ নেই। ছাত্রবাবুরা দিদিমণিরা সকলেই মা-র সঙ্গে গেছেন, শুধু একজন ব'সে আছেন।'

রঘু একটু অপেক্ষা ক'রে আবার বললে, 'আর-কিছু লাগবে, বাবু?'

'না, তুমি যাও।'

একা ব'সে-ব'সে চা খেতে লাগলাম। সারাদিনের মধ্যে এই বৈকালিক চা-পর্ব ছিলো আমাদের সবচেয়ে আনন্দের অনুষ্ঠান। শোভায় সজ্জায় গল্পে হাসিতে চায়ের পেয়ালা মাধুর্যে ভ'রে উঠেছে। খবর-কাগজে সরমার ছবিটার দিকে আর-একবার চোখ পড়লো আমার। নিজেকে হঠাৎ বড়ো ক্লান্ত, বড়ো রিক্ত মনে হ'লো।

চা শেষ ক'রে উঠে এলুম। আজ সন্ধ্যায় কি শহরের কোনোখানে এমন-কিছু হচ্ছে না, যেখানে আমি যেতে পারি? না। মনে-মনে ভেবে দেখলাম—আজ কোনোখানে কিছু নেই। ইংলিশ রিভিয়ুর জন্য একটা প্রবন্ধের খশড়া মনে-মনে তৈরি আছে—সেটা লিখে ফেলা যাক।

আলো জ্বেলে কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম, কিন্তু লেখা যেন এগোতে চায় না। মনটা ভালোই লাগছে না আসলে। এই মন-খারাপ হওয়াটা কিছু না, এটাকে জোর ক'রেই ঝেড়ে ফেলতে হবে, মনে-মনে এইরকম সংকল্প ক'রে লেখার মধ্যে নিবিষ্ট হবার চেষ্টা করলাম এবং খানিক পরে নিবিষ্ট হ'য়েও গেলাম। হঠাৎ এক সময়ে দেখি, অভি টেবিলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কী রে! কখন এলি?'

'ওঃ! কী চমৎকার! গ্র্যাণ্ড!' অভি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। 'তুমি যদি দেখতে, বাবা—হাসতে-হাসতে নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যেতো।'

অভির মাথায় হাত রেখে বললুম, 'বেশ, বেশ। এখন যাও, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো।'

'এর পরে একটা যুদ্ধের ছবি আসছে। সেটাও কিন্তু দেখবো, বাবা।'

'বেশ।'

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

অভি চ'লে গেলো। ন'টা বাজলো, সাড়ে-ন'টা বাজলো। হঠাৎ নিচের ঘরটা ভ'রে উঠলো কলরবে—বুঝলাম ওরা সব ফিরেছে। সরমা এখুনি উঠে আসবে—কথাটা মনে হ'তেই আমি লেখা বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আরো দশ মিনিট কাটলো—সরমা এলো না। রঘুকে ডেকে নিচে পাঠিয়ে দিলাম।

রঘু ফিরে এসে বললে, 'মা এখন আসতে পারবেন না—অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন—আপনাকে খেয়ে নিতে বললেন। খাবার দেবো আপনার ?'

'একটু পরে।'

সাড়ে-দশটা বাজলো। খিদে পেয়ে গেছে, রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মশা কামড়াচ্ছে, আর ভালো লাগছে না। রঘুকে আর-একবার নিচে পাঠালাম। এসে বললে, 'মা-র একটু দেরি হবে বললেন, আপনার খাবার দেবো ?'

'দাও।'

খেয়েই মশারির তলে আশ্রয় নিলাম। সে-রাতে সরমা কখন শুতে এলো জানি না।

৬

দিন কাটতে লাগলো ; আবার গ্রীষ্মের ছুটি।

'এবার যাবে নাকি কোথাও ?'

সরমা বললে, 'না, এক মুহূর্ত সময় নেই আমার।'

'বড্ড বেশি পরিশ্রম করছো তুমি। কিছুদিন পাহাড়ে গিয়ে একটু বিশ্রাম করলে—'

'না, না। দেশের লোক যখন না-খেয়ে মরছে, তখন দারজিলিং না-গেলেও আমি বাঁচবো। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি ঘুরে আসতে পারো।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'নাঃ—আমি একা-একা আর কোথায় যাবো। —হ্যাঁ, শোনো, পঞ্চাশটা টাকা দাও তো আমাকে, বইয়ের দোকানের ধারটা শোধ ক'রে আসি।'

'পঞ্চাশ টাকা তো আমার কাছে নেই।'

'তোমাকে সেদিন যে পাঁচশো দিয়েছিলুম, তাই থেকে দাও।'

'সে-পাঁচশো এখনো ব'সে আছে নাকি ! রোজ-রোজ খরচ হচ্ছে না ! যা দাম জিনিশপত্রের !'

অবাক হ'য়ে বললাম, 'এই ক'দিনে পাঁচশো টাকা খরচ হ'য়ে গেলো ?'

সরমা গম্ভীরভাবে বললে, 'তা থেকে তিনশো টাকা ফণ্ডে দিয়েছি। তাকিয়ে আছো কী। ওখানে কত যে দিই তা কি তুমি জানো ?'

জানতাম না, কিন্তু অনুমান করতে পারা উচিত ছিলো। আমি যা টাকা উপার্জন করি, এই দুর্দিনেও আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে তা যথেষ্ট। টাকার অভাব কখনো আমাদের ছিলো না। সম্প্রতি কিছুদিন ধ'রে মনে হচ্ছিলো একটা প্রচ্ছন্ন অথচ সুতীক্ষ্ণ টানাটানির চাপে দিনগুলি যেন হাঁপিয়ে উঠছে। আমার উপার্জনের যতগুলি উৎস আছে, তার সবগুলি থেকে সবটুকু রস নিংড়ে বের ক'রে নিয়ে তবুও নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। টাকা এনে ফেলামাত্র ধোঁয়া হ'য়ে উড়ে যায়। সরমা হাতে তুলে যে-টাকাটা ওদের দেয়, তা ছাড়াও দৈনন্দিন খরচই বিস্তর। চা আছে, খাবার আছে, বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ-বিশেষ আয়োজন আছে। গেলো মাসে টেলিফোনের বিল উঠেছে পঁচাশি টাকা।

এ-বিষয়ে সরমার সঙ্গে কথা বলবো ভাবছিলাম, মনে হ'লো এ-সুযোগেই বলা ভালো। তাই বললাম, 'এ-রকম করলে তো চলবে না, সরমা। এত টাকা আমি কোথায় পাবো।'

সরমা শান্তভাবে বললে, 'আমিও সে-কথাই ভাবছিলাম। একমাত্র উপায় হচ্ছে আমাদের সমিতিকে তোমার বাড়ি থেকে আলাদা ক'রে নেয়া।'

'আমার বাড়ি বুঝি?'

'এই একতলাটা আমরা তোমার কাছ থেকে ভাড়াই নেবো—খরচপত্র সবই আলাদা ক'রে ফেলবো। কিন্তু তোমার আয়ের অর্ধেক তুমি আমাকে দেবে—নয়তো আমরা চালাতে পারবো না। এ-ব্যবস্থায় সুবিধে হবে তোমার?'

সরমার 'তোমার' আর 'আমরা'গুলি আমার বুকে ছোটো-ছোটো তীরের মতো এসে বিঁধলো। কিছু না-ব'লে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, সরমা পিছন থেকে বললে, 'এই নাও পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু আর দিতে পারবো না। গণেশ একটা স্কোঅড নিয়ে চাটগাঁ যাচ্ছে—তাদের অন্তত পাঁচশো টাকা চাই।'

'এটা ওদেরই দিয়ো', ব'লে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম।

দু' তিন দিন পরে গণেশের মামার একটা চিঠি পেলাম। বানানহারা আঁকাবাঁকা হাতের লেখা থেকে যে-তথ্যটুকু উদ্ধার করতে পারলাম সেটুকু এই যে গণেশের মা-কে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে—বাঁচবার আশা নেই—গণেশকে এক্ষুনি যেন পাঠিয়ে দিই।

আর কিছু ভাবলাম না—চিঠিটা হাতে নিয়ে সোজা নিচে নেমে গেলাম। তখন সন্ধ্যা, ঘর ভরা লোক। সিগারেটের ধোঁয়া আর কথাবার্তার গুঞ্জন ভেদ ক'রে গণেশকে দেখলাম বড়ো টেবিলটার ধারে ব'সে আছে। তার মুখোমুখি সরমা।

কাছে গিয়ে ডাকলাম, 'গণেশ।'

গণেশ ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালো।

'তোমার মা মৃত্যুশয্যায়, তুমি আজ রাত্রের গাড়িতেই দেশে যাবে', ব'লে চিঠিটা তার হাতে দিলাম।

চিঠিটা প'ড়ে গণেশ চুপ ক'রে রইলো। টেবিলের ও-প্রান্ত থেকে সরমা বললে, 'দেখি কী ব্যাপার।'

আমি বললাম, 'গণেশ, তুমি যাও—প্রস্তুত হও গে। পুরী এক্সপ্রেসটা ধরা চাই।'

চিঠি থেকে আমার দিকে চোখ তুলে সরমা বললে, 'মৃত্যুশয্যায় তো লেখেনি—লিখেছে বাঁচবার আশা নেই। একটু অসুখ-বিসুখ করলেই গ্রামের লোকেরা ও-রকম ভাবে। ও কিছু না। কিছু কুইনিন পাঠিয়ে দাও, গণেশ—তোমাকে যেতে হবে না।'

আমি সঙ্গে-সঙ্গেই ব'লে উঠলাম, 'যেতে হবে না মানে? যেতেই হবে।'

'দু' চার দিনের মধ্যেই ওকে চাটগাঁ যেতে হচ্ছে। সেখানে বোমা পড়ছে, আমরা খুব একটা লম্বা প্রোগ্রাম ঠিক ক'রে রেখেছি। তার নড়চড় হ'তে পারে না।'

'কী বলছো তুমি পাগলের মতো! গণেশ, তুমি তৈরি হ'য়ে নাও—আমি গিয়ে তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি।'

সরমা বললে, 'না, ও যাবে না। ওকে এখন যেতে বলা মানে দেশের শত্রুতা করা।'

হঠাৎ আমার আত্মসংযম যেন একটা পুরোনো পচা ডালের মত মচ ক'রে ভেঙে গেলো। আমার বয়স, আমার সম্ভ্রম, গণেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, সব ভুলে গিয়ে গণেশকে কয়েকটা দুর্বাক্য ব'লে ফেললাম। কী বলেছিলাম এখন আর মনে নেই, কিন্তু বলবার পরেকার অনুশোচনা এখনো মনের মধ্যে তেতো হ'য়ে লেগে আছে। সরমার কথা, এবং গণেশের তাতে নীরব সম্মতি—দুটোই আমার কাছে এত অমানুষিক, এত অসম্ভব, এত অবিশ্বাস্য লাগছিলো যে তখনকার মতো আত্মবিস্মৃত হয়েছিলুম ব'লে বিধাতার কাছে নিজেকে আমি অপরাধী মনে করি না। যদি কোনো দোষ ক'রে থাকি সে মানুষের কাছে। তার প্রায়শ্চিত্ত করছি।

কথা বলতে-বলতে লক্ষ্য করলাম আমাকে ঘিরে কয়েকটি ছেলেমেয়ে গোল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের মুখে উত্তেজনা, চোখে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা। একটু আলাদা হ'য়ে একটি ছেলে দাঁড়িয়েছিলো—রোগা, লম্বা, মুখে বসন্তের দাগ, পান খাওয়া ঠোঁটে কুৎসিত ব্যঙ্গ—তার চোখের দৃষ্টিটা আমার মোটে ভালো লাগছিলো না। আমার কথা শেষ হবার আগেই সে হঠাৎ দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো।

কথা শেষ ক'রে গণেশের পরিত্যক্ত চেয়ারটায় ব'সে প'ড়ে হাঁপাতে লাগলাম। গণেশ মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে অন্য ঘরে চ'লে গেলো।

তখন সরমা বললে, 'তুমি তো অনেক কথা বললে—এবার কয়েকটা কথা শোনো।'

তার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, প্রত্যেকটি কথার উচ্চারণ স্পষ্ট, শ্রেণীবদ্ধ শুদ্ধ ছেলেমেয়েদের অতিক্রম ক'রে ঘরের প্রত্যেকটি দেয়ালে কথাগুলো গিয়ে লাগলো। 'তুমি মানুষকে দয়া করতে জানো, ভালোবাসতে জানো না। যতদিন গণেশকে দয়া করতে পেরেছো, ততদিন ওর প্রতি প্রসন্ন ছিলে তুমি; যেদিন ও তোমার দয়ার গণ্ডি অতিক্রম করেছে, সেদিন থেকেই বিরূপ হয়েছো। তুমি যখন দেখলে যে ও নিজের যোগ্যতায় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, এমনকি তোমার সমকক্ষ হ'য়ে উঠছে, তখন ওকে একটা চাকরির তিমিরে কবর দেবার জন্য তুমি উঠে-প'ড়ে লেগেছিলে। এখন দেখছো যে কিছুতেই ওকে আর চেপে রাখা যাচ্ছে না—যে-কোনো ছুতোয় চেষ্টা করছো ওকে দেশে পাঠিয়ে দিতে, সেখানে গিয়ে ও আবার চাষা হোক, মূর্খ হোক, এই তোমার ইচ্ছা। ওকে নিয়ে বরাবর তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ হয়েছে তুমি চেয়েছো ওকে আজীবন কৃপাপ্রার্থী ক'রে রাখতে—আমি চেয়েছি ওকে আমাদের স্তরে টেনে তুলতে। আসলে তুমি সমকক্ষদের সইতে পারো না, সেইজন্য আমাকেও -'

আমি চাৎকার ক'রে উঠলাম, 'সরমা চুপ করো।'

'না, তোমাকে শুনতেই হবে। আমি স্বাধীন হই, তোমাকে বাদ দিয়েও আমার একটা সত্তা হয়, এও তুমি কোনদিন চাওনি। তুমি আমাকে নিতান্ত স্ত্রী ব'লেই চেয়েছিলে—শাঁখায়, সিঁদুরে, সেবায়, সম্ভোগে। আমি তোমার অধীনে থাকবো, আর তুমি অত্যন্ত ভালো স্বামী হবে—এই ছিলো তোমার আদর্শ। আজ আমি যে তোমার সমকক্ষ হয়েছি, নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছি এটাও তুমি খুব ভালো চোখে দেখছো না। এতে তুমি সুখী নও আমার কৃতিত্ব তোমার ভালো লাগে না, আমার খ্যাতি তোমাকে আনন্দ দেয় না। কিন্তু তাই ব'লে যে-বৃহৎ জীবনের সন্ধান আমি পেয়েছি তাকে তো ছাড়তে পারি না আমি। এটা তুমি জেনে নাও যে তোমার ইচ্ছামতোই সব হবে না, সকলেই তোমার কাছে ছোটো হ'য়ে থাকবে না চিরকাল, ভিন্ন-ভিন্ন জীবন ভিন্ন-ভিন্ন সার্থকতার পথে এগিয়েই চলবে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সুখে হোক, দুঃখে, হোক, এ-কথাটা মেনে নিতেই হবে তোমাকে। আশা করি ভবিষ্যতে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আর আমাকে কথা বলতে হবে না।'

কী ক'রে অতগুলি তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, উদ্ধত চোখের তলা দিয়ে উপরে নিজের ঘরটিতে এসে পৌঁছলাম জানি না। কী ক'রে সে-রাত কেটেছিলো, ঘুমে না স্বপ্নে, মূর্ছায় না অনিদ্রায়, তাও জানি না। যখন উঠে বসলাম, তখন ভোর হয়েছে মাত্র। রঘু

আমাকে দেখে চা আর খবর-কাগজ নিয়ে এসে বললে, 'এক ভদ্রলোকে নি আছেন।'

'আমার কাছে এসেছেন ?'

'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

এত ভোরে কে আবার এলো। তাড়াতাড়ি চা-টা খেয়ে নিয়ে নেমে ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাকে দেখে সসম্মানে নমস্কার ক'রে 'আসুন।'

ভদ্রলোকটিকে কোনোদিন কোথাও দেখেছি ব'লে মনে করতে পারলাম না

'কী চাই আপনার ?'

'আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে এসেছি। আপনার সঙ্গে একটু দরকা আমার।'

স্পেশাল ব্রাঞ্চ! তক্ষুনি চারদিকে তাকিয়ে নিলাম একবার। ওরা কেউ আসেনি—গণেশ তার ঘরে ঘুমুচ্ছে। আমার নিশ্চিত মনে হ'লো ভদ্রলোবে গণেশ—চারদিকে কী-সব ক'রে বেড়ায়, এখন একটা বিপদে না পড়ে। ব্যা বললাম, 'আমার এখানে ছেলেমেয়েরা যে-ছাত্রসমিতি করেছে, তার বিষয়ে কি এসেছেন আপনি ? ওটা তো কিছু নয়, ওরা তো ভালো কাজই করছে— রিলিফের কাজ, দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা তোলা— এর কোনোটাতেই তো কিছু দোষ

ভদ্রলোক মৃদুস্বরে বললেন, 'আমি আপনার জন্যেই এসেছি।'

'আমার জন্য ?' নিজের বুকের কাছে বুড়ো আঙুলটা কয়েকবার আন্দোলি আবার বললাম, 'আমার জন্য ?'

'হ্যাঁ, আপনারই জন্য। আপনাকে একবার দয়া ক'রে আমার সঙ্গে আসতে

'এখন ?'

'হ্যাঁ, এখনই।'

'তাহ'লে—' আমি উঠে দাঁড়ালাম।

ভদ্রলোকও উঠে দাঁড়ালেন।—'বাড়ির ভিতরে একবার দেখা ক'রে আসুন

'হ্যাঁ, যাচ্ছি, যাচ্ছি।'

উপরে গিয়ে দেখি সরমা ঘুমুচ্ছে। তার মাথায় ঠেলা দিয়ে বললাম, 'ওগো শোনো—'

গভীরভাবে ঘুমুচ্ছিলো সরমা, বোধহয় অনেক রাতে শুয়েছিলো কাল আবার ডাকলাম—'সরমা, শোনো—'

'উ ?' ব'লে সরমা ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরলো।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে লোক এসেছে · আমাকে নিতে এসেছে —আমি যাচ্ছি -- শুনছো ?'

সরমা শুনলো কিনা জানি না—বোধ হয় শুনলো না—কিন্তু আমি আর দেরি করলাম না। ঘরের বাইরে এসেই অভি-র সঙ্গে দেখা। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। চোখ দুটি ফোলা-ফোলা।

'কোথায় যাচ্ছো, বাবা ?'

'একটু কাজে যাচ্ছি।'

'এত সকালে তোমার কাজ ?'

'হ্যাঁ বাবা, আজ খুব সকালেই কাজ পড়েছে।' চুলের মুঠি ধ'রে ওকে একবার ঝাঁকানি দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। অভি পিছন থেকে বললে, 'বেশি দেরি কোরো না, বাবা—শিগগির চ'লে এসো '

বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই ছিলো। উঠে বসলাম। ভদ্রলোকটি পাশে এসে বসলেন।

কেন এই শাস্তি জানি না, কী আমার অপরাধ জানি না, কিন্তু আজ পনেরো দিন হাজতে আছি। এর মধ্যে সরমার বা অভির বা গণেশের কারুরই দেখা পাইনি- ওরা কেমন আছে না জানি। শুনছি আরো কিছুদিন পর্যন্ত কাউকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হবে না। বাড়িতে লোক পাঠিয়ে এঁরা জামাকাপড়, বিছানা বালিশ, আয়না চিরুনি ক্ষুর ইত্যাদি সবই আনিয়ে দিয়েছেন। দাড়িও কামাচ্ছি, স্নানও করছি, খাচ্ছিও, অথচ কিছুই যেন করছি না। বেঁচে আছি, তবু যেন বেঁচে নেই। সমস্তটাই একটা স্বপ্নের মতো লাগছে। রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে মনে হয় এটা মিথ্যে, সকালে উঠেই দেখবো আমি আমার ঘরে আমার অভ্যস্ত পরিবেশে শুয়ে আছি। কিন্তু রাতের পর রাত ভোর হয়, সেই মিথ্যাটাই সত্য হ'য়ে দেখা দেয়। ক্রমে এটাকেই সত্য ব'লে মেনে নিতে হবে; আমার বাড়ি-ঘর, বইপত্র, আমার কাজকর্ম, আমার চিরপরিচিত জীবন—সেগুলোই মিথ্যা হ'য়ে, ধূসর হ'য়ে আসবে। মন তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু ইতিমধ্যে হাজতে ব'সে-ব'সে সময় কাটে না, তাই এই ইতিবৃত্তটা লিখে ফেললাম। যতটা জানি এবং যেমন ক'রে জানি তা-ই লিখলাম -এর পরে কী হবে জানি না।

১৯৪৫ অপ্রকাশিত

শুদ্ধি-পত্র

[বইটিতে কিছু মুদ্রাকরপ্রমাদ প্রবেশ করেছে। এখানে শুধু সেই ভু করা হ'লো যা নিতান্তই দৃষ্টিকটু কিংবা সহজেই অপমুদ্রণ ব'লে বোঝা যায় যাতে অর্থের বিকৃতি ঘটেছে।]

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯	২০	লক্ষ্যদ্যুতি	লক্ষদ্যুতি
৪০	৫	শীর্ষতুল্য	শীর্ষতুল্য
,,	১৮	'না, তা হয় না	'না, তা তো নয়ই।
৫৭	২১	কিন্তু কথাটা সত্য	কিন্তু সত্য কথাটা
৬৪	২২	অন্য কারুর গেটে	অন্য কারুর পেটে
৮১	২২	অচচনীয়	অচর্চনীয়
৮৯	৬	বাজে জিনিশ বলতে, পারো।	বাজে জিনিশ, বলতে
৯০	১৮	ভবকুমারের	ভবকুমার
১৬০	৪	একটু হলুস্থুল	একটা হলুস্থুল
১৮৩	২	লাল অনেক,	লাল — অনেক,
১৯১	১০	আসে	আছে
২০৯	১	ড়ো ছেলে	বড়ো ছেলে
২১৫	১৩	ঠাণ্ডা গালায়	ঠাণ্ডা গলায়
২২১	৯	এট ভাড়া	এটা ভাড়া
২২৭	১	একবার এলেন না !	—একবার এলেন না
২৩০	৯	বলতে-লতে	বলতে-বলতে
২৩৮	৩০	মেথ-ছেড়া	মেঘ-ছেঁড়া
২৫৪	১২	তোমায়	তোমার
২৫৭	১৯	লটে !	বটে !'
২৫৮	৫	যাচ্ছে ?'	যাচ্ছো ?'
২৬৩	৯	শৈলেনের	শৈলেশের
২৮৮	১৬	হয়নিতা -- রপর	হয়নি — তারপর
২৯১	২৪	'ও জীবন	'ওর জীবন

বুদ্ধদেব বসু-র গল্প-গ্রন্থের তালিকা

[* চিহ্নিত বইগুলি বর্তমানে ছাপা নেই]

* ১. **অভিনয়, অভিনয় নয়** ও অন্যান্য গল্প। প্রথম প্রকাশ ১৯৩০ : চতুরঙ্গ প্রকাশালয়।

১. প্রথম ও শেষ ২. যাহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন ৩. তথৈব ৪. অভিনয় ৫. অভিনয় নয় ৬. ছেলেমানুষি ৭. বোন ৮ পুরাণের পুনর্জন্ম

* ২. **রেখাচিত্র** ও অন্যান্য গল্প। প্রথম প্রকাশ ১৯৩১ : গুপ্ত ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং।

১. রেখাচিত্র ২. ছায়াচিত্র ৩. জ্বর. ৪. আত্মহত্যা ৫ গৃহ ৬. মেজাজ ৭. রাত বারোটার পরে ৮ দুঃখ

৩ **এরা আর ওরা** এবং আরো অনেকে। প্রথম প্রকাশ ১৯৩২ : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। নূতন সংস্করণ, ডি এম. লাইব্রেরি, ১৯৪৫।

১. বজ্রধর আর শর্বরী রায় ২ অতনু মিত্র আর সাবিত্রী বোস—আর বুলু ৩. সুনীল আর লুসি-ললিতা ৪ নিরঞ্জন রায় আর উমা ৫. অমিতা চন্দ (নূতন সংস্করণে বর্জিত)

৪ **অদৃশ্য শত্রু**। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩ : কাত্যায়নী বুক স্টল।

১. অদৃশ্য শত্রু ২. প্রশ্ন ৩. মধ্যস্থ ৪ একটা বর্ষার সুর ৫. অতীতের ছায়া ৬. চিঠি ৭. ঈশ্বর

* ৫. **মিসেস গুপ্ত**। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৪ : শ্রীগুরু লাইব্রেরি।

১. মিসেস গুপ্ত ২ তুলসী-গন্ধ ৩. হত্যা ৪. ওথেলো ৫. সাহিত্যিক সুমিতা ৬. র‍্যামন নোভারো ৭ নিষ্ফল সম্ভাবনা

* ৬. **প্রেমের বিচিত্র গতি**। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৪ : বরেন্দ্র লাইব্রেরি।

১ একটা আশ্চর্য ঘটনা ২. প্রেমের বিচিত্র গতি ৩. নবকিশোরের পরিচয় ৪. কল্পনা ৫. মণিকা

* ৭. **শ্বেত পত্র**। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৪ : বরেন্দ্র লাইব্রেরি।

১. সীতেশ চাটুয্যের কাণ্ড ২. বইয়ের দোকানে এক ঘণ্টা ৩. বিরূপাক্ষ দেবের কাহিনী ৪. কুমার দেবকীকিশোর ৫. মৃত্যুঞ্জয় ও সুদর্শন ৬. তৃতীয় শ্রেণীর কবি ৭. অ্যালকহল